# মাতৃভাষা পত্রিকা

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN: 2618-0103 । । ISSN-L: 2618-0103

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট**

ইউনেস্কো ক্যাটাগরি-২ ইনস্টিটিউট

**মাতৃভাষা পত্রিকা**
ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা
বর্ষ ১১, সংখ্যা ২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

**প্রকাশকাল:** ডিসেম্বর ২০২৫
*(Pablished in December 2025)*

**সম্পাদক**
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

**নির্বাহী সম্পাদক**
আবুল কালাম

**সহযোগী সম্পাদক**
ড. নাজনিন নাহার

**সম্পাদনা পরিষদ**
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক ও সম্পাদক, মাতৃভাষা পত্রিকা, আমাই
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি
ড. হানা রুথ থমসন, প্রাক্তন প্রভাষক, SOAS, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালী, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ড. তপন কুমার বাগচী, পরিচালক (ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ), বাংলা একাডেমি
ড. মনিরা বেগম, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শারমিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই
আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই
ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই

**প্রচ্ছদ:** অনুপম হুদা

**মূল্য:** ২৫০/- US $ 4

**ডিজাইন ও মুদ্রণ:** ইনোভা কমিউনিকেশনস, আরামবাগ, ঢাকা

ষাণ্মাসিক মাতৃভাষা পত্রিকার প্রকাশক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন
মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ (www.imli.gov.bd)

@ স্বত্ব: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
ISSN: 2618-0103, ISSN-L: 2618-0103

এই গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহে প্রতিফলিত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখকবৃন্দের একান্তই নিজস্ব। এর জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়।

# মাতৃভাষা পত্রিকা

## ভাষা বিষয়ক ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা

## সূচিপত্র


**ব্যক্তিভাষায় সামাজিকতার প্রভাব অন্বেষণ** ৫
মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, খন্দকার খায়রুন্নাহার

**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প: ভাষাবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ** ২১
মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম

**ভাষায় নারী-পুরুষ: পুরুষতন্ত্র, আধিপত্য ও ক্ষমতা** ৪৫
মোহাম্মদ মাসুদ রানা

**জেন-জি'র (Gen-Z) বাচনিক সত্তা: ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা** ৮১
নাহিদা বেগম

**ময়মনসিংহ গীতিকা: ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের সূত্র-সন্ধান** ১০০
সাবিনা ইয়াসমিন

**মাতৃভাষার গুরুত্ব ও ভাষা আন্দোলন: ইসলামি পর্যালোচনা** ১২০
মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

**সম্রাট আকবরের শাসনামলে মুদ্রার ভাষা** ১৩৮
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল

**লিঙ্গভেদে বিদেশি ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতির তারতম্য: তুলনামূলক আলোচনা** ১৭৩
আমিনুল ইসলাম, বিপুল চন্দ্র দেবনাথ

**"খোয়াবনামা" উপন্যাসে কালের দহন: ভাষা বিশ্লেষণ** ১৯৪
মুনিয়া সরকার

**বাংলাদেশের লুসেই ও পাংখুয়া ভাষা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ** ২১৫
মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন

**বিবাহ নাটক: ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সখীনার উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর** ২৪৫
তানজিনা জাহান

**গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের ব্যাকরণচর্চা** ২৬১
তিথি বালা

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায়
(বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম** ২৭৬

# ব্যক্তিভাষায় সামাজিকতার প্রভাব অন্বেষণ

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*, খন্দকার খায়রুন্নাহার**

**Abstract:** There are multifarious classes in society. Among these classes, individuals are differentiated by their distinctive, discrete traits. This disparity gives rise to individualistic expression. The use of language is evidently associated with sociability. As an individual is considered a member of a community or a society, their cohesion is imperative. Language is the medium of a person's communication. Albeit the use of sociolect varies across communities, the use of idiolect is not deliberated negligible. Hence, this circumstance embodies idiolect. As a person is a member of a community, their language cannot be exempted in any way from the impact of society. Thus, sociability's influence in idiolect is unequivocal. The fundamental aim of the discussed research is to interpret the relevant matters engaged in the effect. The discussed analysis is composed in descriptive method.

**মূলশব্দ (Keyword):** ব্যক্তিভাষা (Idiolect), ভাষা-সামাজিকীকরণ (Langguage Socialization), ভাষা-সম্প্রদায় (Language Community), ভাষাবৈচিত্র্য (Language Variation), বাকসম্প্রদায় (Speech Community)

## ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সমাজে যোগাযোগের মাধ্যম হলো ভাষা। সমাজের সবাই একই ভাষা ব্যবহার করলেও তাদের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষণীয়।

---

* ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, Corresponding Author: Email: ashadzaman01@gmail.com

** ড. খন্দকার খায়রুন্নাহার, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যক্তিভেদে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতাকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষাবৈচিত্র্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তির এই ভাষাবৈচিত্র্যের নানা কারণ বিদ্যমান। শারীরিক গঠন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভাষাবৈচিত্র্যের এই ধরনকে ব্যাখ্যা করার জন্য। এই প্রত্যয়গুলি ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিভাষা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

ব্যক্তিভেদে ভাষার স্বাতন্ত্র্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিভাষা ব্যবহার করে থাকে সমাজে। সমাজকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য থেকেই ব্যক্তিভাষা ধারণার উদ্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস বিদ্যমান।

**গবেষণার যৌক্তিকতা**

ব্যক্তিভাষা নিয়ে বিভিন্ন শৃঙ্খলায় আলোচনা লক্ষ করা যায়। যেমনঃ ভাষাবিজ্ঞান, নৃভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা সাংস্কৃতিক অধ্যয়নে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রত্যয়ের ব্যাখা-বিশ্লেষণ সুলভ। তবে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিভাষার ওপর সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা কমই পাওয়া যায়। অথচ ব্যক্তিভাষার ওপর সমাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কাজেই এ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

**গবেষণা-পদ্ধতি**

আলোচ্য গবেষণায় দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে এ  গবেষণায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি আশ্রিত হয়েছে।

**গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ**

এ গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, সাময়িকী, পত্রিকা থেকে উপাত্ত গৃহীত হয়েছে।

**ব্যক্তিভাষার সংজ্ঞার্থ নিরূপণ ও এর আলোচ্য প্রত্যয়সমূহ**

ব্যক্তিভাষার মাধ্যমে ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। Idiolect শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত;  দুটি রূপমূল Idio এবং Lect দ্বারা শব্দটি গঠিত। Idio শব্দের অর্থ হলো স্বীয়, ব্যক্তিবাচক, একান্ত, আলাদা, অনন্য;  Lect শব্দের অর্থ হলো ভাষার সামাজিক বৈচিত্র্য। অতএব আভিধানিকভাবে Idiolect শব্দের অর্থ হলো

ব্যক্তি ভাষার সামাজিক বৈচিত্র্য। কিন্তু বর্তমানে সমাজভাষাবিজ্ঞানে এ শব্দের অর্থ হলো ব্যক্তিভাষার স্বাতন্ত্র্য (Hajen, 2006)। এর নির্দিষ্ট অর্থ প্রধান দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত:

১. সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির ভাষার সমগ্রতা ও
২. একজন ব্যক্তির ভাষা প্রয়োগ-দক্ষতা।

ব্যক্তিভাষায় নানা ধরনের সামাজিক বৈচিত্র্য প্রভাব ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> A person's idiolect is in all-encompassing in that it includes linguistics features related to dialect and sociolect, for example while also being influenced by a wide range of other sources of variation, such as their life experiences; language encounters; what they have read and listened to; where they have been schooled; jobs, they have had; their favorite hobbies and pastime; and their parents, friends, and teachers' (Wright, 2018:63).

ব্যক্তিভাষা কোনো একটি ক্ষেত্রে স্থির নয়; এটি কোনো ব্যক্তির সারাজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ভাষায় নানা প্রপঞ্চ যুক্ত হয়ে থাকে। যদিও ভাষাবিজ্ঞানে প্রত্যয়টি সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, তবুও এটি নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে গবেষণার আকর। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভাষা ব্যবহারে ব্যক্তির ভূমিকা হিসেবে শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাষা পরিবর্তনে ব্যক্তিভাষার ভূমিকা আছে বলে মনে করেন অনেকে। ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তিভাষা বিষয়ক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ব্যক্তিভাষার রূপবৈচিত্র্য সহজ নির্ণীত বিষয় নয়।

## ব্যক্তি ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তিভাষা চর্চার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে অনেক পূর্বেই। ১৮৮৮ সালে পল হেরম্যান (Paul, 1888) ভাষায় একবোধের ধারণা প্রদান করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিভাষা আলোচিত হতে থাকে। ১৯৮৩ সালে ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিন দ্য সোস্যুর (Sassure, 1983) লং ও প্যারোলের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্দেশে ব্যক্তিভাষার ধারণা তুলে ধরেছেন। এডওয়ার্ড স্যাপির ১৯২৭ সালে ব্যক্তি ভাষাবিজ্ঞানিক বৈচিত্র্য বোঝাতে বলেছেন, 'a window through which to analyze personality traits of speakers' (Sapir, 1927: 893)। ব্লুমফিল্ড (Bloomfield, 1933) ১৯৩৩ সালে বাকসম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে সামগ্রিক ও ব্যক্তিক দুই ভাবে ভাষাকে ভাগ করেছেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্নার্ড ব্লক (Bloch, 1948) প্রথম বিস্তৃতভাবে শব্দটি ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-'the totality of the possible utterances

of one speaker at one time in using language to interact with one speaker' (Bloch, 1948: 39)। এ সংজ্ঞায় সিএফ হকেটের (Hockett, 1958) ব্যক্তিভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মার্টিনেট ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তি ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন, The language as spoken by a single individual (Martinet, 1961: 105)।

উইনরিখ ব্যক্তিভাষার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা পরিবর্তন ঘটে বাকসম্প্রদায়ের মধ্যে, ব্যক্তিভাষার ক্ষেত্রে নয় (Weinreich, 1954: 390)। উইয়িলাম লেবভ idiolect বোঝাতে 'Idiosyncrasy' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তিনি মনে করেন, এটি ভাষার অংশ নয় (Labov, 1963)। অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিভাষায় Idiolect-কে আবদ্ধ রাখতে চান না, তিনি সমাজে ভাষার বৈচিত্র্য হিসেবে এটিকে দেখতে চান। মিলরয় (Milry, 2003) বলেছেন, ভাষাপরিবর্তন সূচিত হয় ব্যক্তিভাষার মাধ্যমে এবং এ ধরনের পরিবর্তন ভাষীর সংজ্ঞাপন সৃজনক্ষমতা প্রকাশ পায় একজনের সাথে আরেকজনের কথোপকথনের মাধ্যমে। সংজ্ঞাপনে সময়ের সাথে সাথে ভাষার সংগঠনে পরিবর্তন দেখা যায় (Auer and Hinskens, 2005)। কুল (Kuhl, 2003) ভাষা পরিবর্তন বলতে ভাষীর মধ্যে ব্যক্তিভাষার সংযোগকে বুঝিয়েছেন। ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিভাষা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে মুফওয়েন মনে করেন (Mufwene, 2001)। ভাষিক ব্যক্তিকতা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছেন জনস্টোন (Johnstone, 2024)। তার আলোচনা থেকেই প্রয়োগবিদ্যা, সমাজভাষাবিজ্ঞান ও ডিসকোর্স বিশ্লেষণে ব্যক্তিভাষার চর্চা শুরু হয়।

**ব্যক্তিভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞানশাখা**

*ব্যক্তিভাষা ও ব্যাকরণ*

ব্যাকরণ ও ব্যক্তিভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণে তেমন কাজ পরিলক্ষিত হয় না। নোয়াম চমস্কির সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে আই-ল্যাঙ্গুয়েজ ও ই-ল্যাঙ্গুয়েজে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। ১৯৮৬ সালে তিনি এ দুটি অভিধা প্রয়োগ করেন। ব্যক্তিভাষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন- 'The internalized language faculty in the mind of the individual speaker. E language- externalized language, which exists outside of the mind and each shared suicidal' (Chomsky, 1986:35)। এই ধারার আলোকে লুডল (Ludlow, 2011) ২০১১ সালে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ের পার্থক্য দেখিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার বিদ্যমান। ভাষাশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভাষা নিয়ে ১৯৬৪ সালে কাজ করেছেন হ্যালিডে। তিনি এর ব্যাকরণিক ও শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিকভাবে এখানে ব্যাকরণের চেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অর্থতত্ত্বকে (Halliday and others,1964)। হাসান (Hasan, 2002) এখানে ব্যক্তির নিজস্ব কোডের ব্যবহারকে নির্দেশ করেছেন

এবং ব্যক্তির বুলির নিজস্ব অর্থকে বুঝিছেন। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তিভাষায় তিনটি বিষয়, উচ্চারণ (Pronunciation), শব্দভান্ডার (Vocabulary) ও ব্যাকরণ (Grammar) বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। হ্যারিস ব্যক্তিভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার সমালোচনা করে বলেন, এসব মিথকেন্দ্রিক আলোচনা এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রসঙ্গে তার নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

> idiolect is the unique pronunciation, language style, choice of grammar by the individual speaker and it is different for বধপয other, so if the one who have interaction with you with their language that may be with the additional letters or works in each sentence, you will guess or immediately know who is talking just by listening to the person without seeing who is speaking (Harris, 1998).

**ব্যক্তিভাষা ও ভাষাদর্শন**

ভাষাদর্শনে ব্যক্তিভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাষা ও সাধারণ ভাষা আলোচনায় ভাষাদার্শনিকগণ ব্যক্তিগত ভাষার বিচার (Private language argument) তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এ তত্ত্বে নির্দেশ করা হয় যে, ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, সেটির অর্থ ও ব্যবহার কখনও বিলুপ্ত হয় না বরং এগুলির নিজস্ব অর্থ যতদিন জগতে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তা ব্যবহৃত হবে। যেমন, আমরা যখন সক্রেটিস, এরিস্টটল বা প্লেটোর নাম বলি তখন সঙ্গে সঙ্গে সে নামের তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হই। এমনকি আমরা যখন উপহাস করে কোনো ব্যক্তির নাম স্মরণ করি তখনও এর ব্যতিক্রম হয় না। এক্ষেত্রে শব্দের বা নামের ব্যবহারই হলো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ভিটগেনস্টাইনের (Wittgenstein, 1922) ভাষায়, সর্বক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যখন কোনো শব্দে অর্থ আরোপ করি, তখন সেটি প্রকাশ করি, এভাবে ভাষার শব্দের অর্থ হলো তার ব্যবহার। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করায় সেটির অর্থ বোঝা সম্ভব হয়। ভাষায় যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তা হয় মূলত শব্দনির্ভর। এক্ষেত্রে বস্তু নয় বরং  শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটিই বেশি গুরত্বপূর্ণ; ফলে কোনো বক্তব্যের উপস্থাপনা বা সেটির ছায়া নয়, বরং সেটির ব্যবহারই হলো তাৎপর্যপূর্ণ। মানসিক ঘটনা একান্তই ব্যক্তিগত (Private) কিন্তু শব্দের ব্যবহার ও এর অর্থ হলো সাধারণ (Public)। ভিটগেনস্টাইন এ ধরনের ব্যক্তিগত ভাষার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি মনে করেন যে, ভাষা যদি ব্যক্তি উপলব্ধি সংবেদকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে না পারত তবে মানব সমাজে সমগ্রের সম্পদ হয়ে ভাষা অবস্থান করত না। মানুষের সমাজে যেহেতু ভাষা ও অর্থের প্রসঙ্গ সব সময় বর্তমান, সেহেতু ব্যক্তির ভাষা সমগ্রের ভাষা হিসেবেই গ্রাহ্য। তিনি আরও

বলেন, ভাষার বাস্তবতাই মানুষের কাছে প্রকৃত বাস্তবতা, ভাষার বাইরে যদি কোনো রকম বাস্তবতা থেকেই থাকে তবে তা ভাষা প্রয়োগের আগে উপস্থিত নয়। ব্যক্তিগত ভাষার সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী বলে দার্শনিকদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে (আসাদুজ্জামান, ২০১৩)। ভাষা ও চিন্তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং একজনের সাথে আরেকজনের পার্থক্য আছে। অনুশাসনিক নিয়মের বাইরে এ ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান।

## অবয়ব ভাষাবিজ্ঞান ও কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তিভাষা

ব্যক্তিভাষা বিশ্লেষণের জন্য অবয়ব ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। এখানে একসেট উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ উপাত্তের সাহায্যে ব্যক্তিভাষাকে অন্য ভাষা থেকে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। সাধারণ অবয়বের সাথে ব্যক্তিভাষার অবয়বের স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে তা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ক্রিডেন্স শব্দের ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে দুজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞের কাছ থেকে তিনহাজার করে শব্দ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে গবেষকগণ বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করে তা থেকে রূপমূলের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন।

কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞানে প্রথমে প্রয়োজন হয় করপাস। এ করপাস বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে তারপর তা থেকে ব্যক্তিভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানীয় শৈলীতত্ত্ব এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় বিশেষ করে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় পরিসংখ্যানের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। শৈলীবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান এ দ্বিবিধ শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে বর্তমানে শৈলীমিতি বা পরিসংখ্যানীয় শৈলীতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, শৈলী আলোচনায় পরিসংখ্যান পদ্ধতি অবলম্বন করে যে শাখাটি গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় সংখ্যা-শৈলীতত্ত্ব বা (Stylostatistics) বা শৈলীমিতি (Stylometry)। বার্শনি এ জাতীয় অনুসন্ধানের তিনটি উপযোগিতার উল্লেখ করেন (Varshney, 1992)। এক. সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে কোনো অনামাঙ্কিত রচনার লেখককে শনাক্ত করা সম্ভব। দুই. কোনো রচনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই পদ্ধতিতে সামগ্রিক ঐক্য নির্ধারণ করা সম্ভব। তিন. এই পদ্ধতি অবলম্বন করে একই লেখকের বিভিন্ন রচনার কালক্রম নির্দেশ করা যায়। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের বাংলা গদ্যরীতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমালোচক শিশিরকুমার দাশ পরিসংখ্যান তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, রামরাম বসুর রচনায় ফারসি শব্দের প্রয়োগ আদৌ অতিরিক্ত নয় বরং তা প্রসঙ্গ নির্ভর।

## ব্যক্তিভাষা ও ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞান

অপরাধী শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। ফরেনসিকের সঙ্গে ব্যক্তিভাষাও বর্তমানে আলোচিত হয়। এ বিষয়ে গিবনস এবং টুরেল গবেষণা করেন

(Gibbons and Turell, 2010)। ব্যক্তিভাষার নতুন শৈলী নিয়ে তারা আলোচনা করেন। গ্র্যান্ট ২০১০ সালে এর বিপরীত পক্ষে অবস্থান নেন এবং বলেন যে এখানে ব্যক্তিভাষা তেমন কার্যকর নয় বরং ব্যক্তির শৈলীগত দিকই বিবেচনা করা প্রয়োজন (Grant, 2010)। ২০১৮ সালে গ্র্যান্ট ও ম্যাকলিয়ড এ প্রসঙ্গে Resource constraint model of language and identity সেমিনারে সংজ্ঞাপন-ইভেন্টের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন (Grant and Macleod, 2018)। ২০০২ সালে ম্যাকনেমেন ফরেনসিক শৈলীবিজ্ঞানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন (McMenamin, 2002)। ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে এসব গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

**ব্যক্তিভাষা: ঔপভাষিক দৃষ্টিকোণ**

প্রমিত ভাষার (Standard language) পাশাপাশি প্রচলিত অঞ্চলবিশেষের জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রমিত ভাষার পাশাপাশি এক বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা (Dialect) ব্যবহৃত হয়ে থাকে (মোরশেদ, ২০১২)। অঞ্চলভেদে একই ভাষায় এই রূপবৈচিত্র্য প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল (Chatterji, 1960)। আঞ্চলিক রূপবৈচিত্র্যের মতো ব্যক্তি ভাষার ক্ষেত্রেও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের স্বাতন্ত্র্য সাধারণত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা কিংবা পেশাগত কারণে হয়ে থাকে (মোরশেদ, ২০১২)।

ভাষাকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো ভৌগোলিক এলাকায় প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ঐ এলাকার উপভাষাকে যেমন প্রভাবিত করে, একই সাথে ব্যক্তিভাষাতেও তা প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি ভাষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজের অংশীদার হয়েও তার স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতাকে প্রকাশ করে থাকে, যা মূলত প্রতিফলিত হয় তার উচ্চারণ, শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠন এবং শৈলীগত প্রকাশের মাধ্যমে (আরিফ, ২০২৪)। এই ব্যক্তিভাষাকে ক্রিস্টাল একজনের ব্যক্তিগত উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (Crystal, 2008)। আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা ব্যক্তিভাষা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়।

**ব্যক্তিভাষা: নৃভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ**

নৃভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের আন্তঃশৃঙ্খলা হিসেবে মানব ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন, বৈচিত্র্য, ভাষার ব্যবহার নৃভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। এ আলোচনায় ভাষার সাথে সমাজের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়। নৃভাষাবিজ্ঞান বিশ্লেষণে ফ্রানজ বোয়াসের সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতত্ত্ব (Cultural relativity) ও ভাষা আপেক্ষিকতাবাদ (linguistic relativity) তত্ত্ব প্রয়োগ করা

হয় (Beeman, 2012)। প্রতিটি সমাজে নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন রয়েছে যা তার ভাষার মাধ্যমে জানা সম্ভব। ভাষা শিক্ষা (Language education), ভাষা পরিকল্পনা (Language planning), যোগাযোগ ও আন্তঃসাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার (Communication and intercultural interaction) ক্ষেত্রে নৃভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। ভাষা ও চিন্তার মিথস্ক্রিয়া নৃভাষাবিজ্ঞানে পরিলক্ষিত হয়। ভাষা পরিবর্তন, ভাষাবোধ, ভাষা আয়ত্তকরণ, আত্মীয়তাসূচক শব্দ, ট্যাবু ইত্যাদি নৃভাষাবিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে ব্যক্তি ভাষাতেও প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ব্যক্তি ভাষার ক্ষেত্রে মূল উপজীব্য।

**বাকসম্প্রদায় ও ব্যক্তিভাষা**

অভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের একটি বাক-সম্প্রদায় বলা হয়। একই সামাজিক গোষ্ঠীতে বাসকারী মানুষ নিজেদের মধ্যে সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অভেদ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। একরূপ আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে অভিন্ন ভাষার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এভাবে ভাষা সম্প্রদায় একই কোড ব্যবহার করে বলে তাদের ডিসকোর্স সম্প্রদায় (Discourse community) বলা হয় (আসাদুজ্জামান, ২০২৪)। একই বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণিক অভিন্নতা নয়, তাদের কথা বলার বিষয়বস্তু, তথ্য উপস্থাপনা এমনকি নিজস্ব শৈলীতেও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। নিজস্ব সংস্কৃতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও তারা অনবদ্য থাকে। একই বাক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যক্তিভাষা ভিন্নতা লাভ করে। ভাষা সামাজিকীকরণের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান, যথা: পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র ব্যক্তির ভাষিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি ভাষাতেও বাক-সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

**ভাষা-সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিভাষা**

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ। ভাষার সামাজিকীকরণ বলতে সাধারণত বোঝায় সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম, ভাষিক নিয়ম, মূল্যবোধ, ভাষা উপলদ্ধির সক্ষমতা অর্জন, যা তাকে সমাজে সবার সাথে যোগাযোগে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন, সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির ভাষার সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে ভাষা ব্যবহার করতে শেখে। ব্যক্তিভাষা, ভাষা-সামাজিকীকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠলেও ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান, মূল্যবোধের মাধ্যমে পৃথক হয়। এক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, ধর্মীয় ও

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০ সালে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ভাষা-সামাজিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন ওকস এবং সেফলিন (Ochs and Sehieffelin, 1986)। শিশুর ভাষিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র নিয়ে তারা কাজ করেছিলেন। সমাজের অংশ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সর্বাধিক। ভাষা আত্তীকরণ এবং প্রয়োগ ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়ে থাকে।

### বাককৃতি ও ব্যক্তিভাষা

ভাষা দার্শনিক জন অস্টিন ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বাককৃতি (Speech act) উপস্থাপন করেন। মানুষের মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাক্যই ক্রিয়াশীলতা নির্দেশ করে। উক্তির ক্রিয়াশীলতা নির্দেশে তিনি সার্বজনীন বাককৃতি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন (Austin, 1962)। পরবর্তীতে আরো গ্রহণযোগ্য এবং বিস্তৃতভাবে বাককৃতি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন সার্ল (Searle, 1969)। কথা বলার সময় বক্তা শুধু কিছু উক্তি উচ্চারণ করে না, এগুলির মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রভাবিত করে। তাই সার্লের মতে ভাষা বলার অর্থই বাককৃতি (Searle, 1969)। ভাষা ব্যবহারে আমাদের প্রতিটি উক্তির পেছনে অভিপ্রায় (Intention) কাজ করে। বক্তার অভিপ্রায়মূলক যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনো যোগাযোগকে প্রকৃত যোগাযোগ বলা যায় না, কারণ উদ্দেশ্যহীন যোগাযোগ শ্রোতার ওপর কোনো ধরনের প্রভাব ফেলে না। বাককৃতি গড়ে ওঠে ৩টি সহকৃতির সমন্বয়ে, যথা: প্রস্তাব কৃতি (Propositional act), নিবেদন কৃতি (Illocutionary act) এবং প্রতিক্রিয়া কৃতি (Perlucationary act)। যে উক্তি বা বাক্য দিয়ে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংজ্ঞাপন শুরু হয় তাই প্রস্তাব কৃতি। উক্তির মাধ্যমে যেসব কাজের ধারণা প্রকাশিত হয়, যথা: আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদির পেছনে আমাদের অভিপ্রায় (Intention) কাজ করে। উক্তির অন্তরালের এই অভিপ্রায় নিবেদন কৃতি। শ্রোতা প্রতিক্রিয়া কৃতি ব্যবহার করে বক্তার অভিপ্রায় পূরণের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শ্রোতা যদি বক্তার নিবেদন কৃতি অনুধাবন করে সঠিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে তাহলে প্রতিক্রিয়া কৃতি সম্পন্ন হয়। ব্যক্তিভাষা, ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত থাকে। বাককৃতির তত্ত্ব অনুসারে প্রস্তাব কৃতি, নিবেদন কৃতি এবং প্রতিক্রিয়া কৃতিও ব্যক্তিভাষার অংশ। ব্যক্তিভাষায় এই কৃতিসমূহের সঠিক ব্যবহার সমাজ জীবনে সামাজিক যোগাযোগ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

### ব্যক্তিভাষা: সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ

ভাষার ওপর সমাজের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয় ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় তাকে বলা হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান। সমাজভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের একটি প্রায়োগিক জ্ঞানশাখা। ভাষা-বৈচিত্র্য আলোচনায় ব্যক্তিভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানে স্থান পেয়েছে।

ভাষা-পরিবর্তনের অংশ হিসেবে পল হারম্যান The principles of the History

of Language তত্ত্ব (Paul, 1880) প্রদান করেন। পল মনে করেন, ব্যক্তিভাষা একান্ত ব্যক্তিগত কারণে উদ্ভব হয় এবং এক ব্যক্তিভাষা দ্বারা অপর ব্যক্তিভাষা প্রভাবিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে উইনডিক (Weinreich), লেবভ (Labov) এবং হার্জগ (Herzog) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এ তত্ত্ব পুনরায় আলোচনা করেন এবং ভাষা-পরবর্তনে তা প্রয়োগ করেন। পলের ব্যক্তিভাষার ধারণা সমালোচনা করে তাঁরা বলেন, সমাজভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তি ভাষার অবস্থান এমন নয়। ভাষা-পরিবর্তন ও ভাষাবৈচিত্র্যের কারণেই ব্যক্তিভাষার উদ্ভব ঘটে (Backus, 2015 )।

### ভাষাবৈচিত্র্য ও ব্যক্তিভাষা

সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় ভাষা বৈচিত্র্য (Linguistic diversity)। ব্রাইট সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রথম সম্মেলনে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে ভাষাবৈচিত্র্যকে (Linguistic diversity) নির্দেশ করেছিলেন (Bright, 1964)। বিভিন্ন অভাষিক কারণ ভাষাবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবক (Social factor) হিসেবে কাজ করে। এসব সামাজিক প্রভাবকের সাথে ভাষা সম্পর্কিত বলে তা প্রতিফলিত হয় ভাষাবৈচিত্র্যে। সাধারণত সামাজিক শ্রেণি (Social class), ধর্ম (Religion), লিঙ্গ (Gender), পেশা (Occupation), বয়স (Age), শিক্ষা (Education), জাতিগত (Ethnicity) প্রভৃতি কারণে ভাষায় বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে। ব্যক্তিভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। উল্লিখিত প্রভাবকসমূহ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের ভাষা বৈচিত্র্যের জন্যও দায়ী। সাধারণত শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ প্রভৃতি কারণে ব্যক্তিভাষাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উইলিয়াম লেবোভ মনে করেন, প্রতিটি মানুষ ভাষা ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে যেখানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক প্রভাব একত্রিত হয়ে নির্ধারিত হয় ভাষার ধরন (Labov, 1972)।

### ভাষা-পরিবর্তনে সামাজিক প্রেষণা

ভাষা মনোভঙ্গি ও সামাজিক প্রেষণা ভাষা সম্পর্কে ভাষা-ভাষীদের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে বসবাসরত মানুষ ভাষা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাই ভাষা মনোভঙ্গি (Language attitude)। দ্বি-ভাষিক (Bilingual) বা বহুভাষিক (Multilingual) দেশে ভাষা মনোভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। একটি ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরা কীভাবে অন্য ভাষার ভাষীদের সামাজিক অবস্থা চিহ্নিত করে এবং কীভাবে তারা ঐ ভাষার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তা শনাক্ত করতে ভাষা মনোভঙ্গি বা মনোভাবগত অধ্যায়ন সহায়তা করে। এ বিষয়ে অসংখ্য সমাজমনস্তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। কানাডাতে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষা সম্পর্কে ভাষীদের অভিমত জানার জন্য লাম্বার্ট এবং তার সহযোগীরা ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কাজ করেছিলেন (Lambert, 1967)। ভাষা সম্পর্কিত

মূল্যবোধ মূল্যায়নের জন্য সাধারণত ভাষীদের ঐ ভাষায় কারো বক্তব্য শুনিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। এতে করে ঐ বক্তা এবং তার ভাষা সম্পর্কে অন্যদের মনোভাব জানতে পারা যায়। কানাডাতে ফরাসি ভাষীরা নিজেদের ভাষা থেকে ইংরেজিকে বেশি গুরুত্ব দেয় আবার মার্কিন মুলুকে নিগ্রোরা নিজেদের ব্যবহৃত ভাষা অপেক্ষা শ্বেতকায়দের ভাষাকে বেশি মূল্যায়ন করে থাকে। সামাজিক অবস্থানগত কারণে এ ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়।

সামাজিক প্রেষণার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রেষণা রয়েছে যা ভাষা পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উইলিয়াম লেবোভের নিউইয়র্কে স্বরপরবর্তী /r/ ধ্বনির গবেষণা বা মার্থাজ ভিনিয়ার্ড দ্বীপের দুটি দ্বি-স্বরধ্বনির পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক প্রেষণা কাজ করেছে। নিউইয়র্কে স্বরপরবর্তী /r/ ধ্বনির উচ্চারণ মর্যাদাসূচক হওয়াতে সমাজে নিম্নস্তরের লোকেরা বিশেষ করে অল্প বয়স্করা সচেতনভাবে তা ব্যবহার করে। মার্থাজ ভিনিয়ার্ড দ্বীপে মার্কিন মুলুক থেকে অনেকে এসে বসবাস শুরু করলে দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী প্রমাণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি দ্বি-স্বরধ্বনি ব্যবহার করত। উল্লেখ্য এই দুই পরিস্থিতিতেই ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেষণা কাজ করেছে এবং এক্ষেত্রে তুলনামূলক অল্পবয়স্করা ভাষা ব্যবহারে সচেতনভাবে ধ্বনি পরিবর্তন করেছে। ভাষা মনোভঙ্গি বা সামাজিক প্রেষণা ব্যক্তিভাষার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় (Labov, 1963)।

**ব্যক্তিভাষা: শৈলীগত বিবেচনা**

শৈলীর সঙ্গে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক লক্ষণীয়। এই স্বকীয়তাই একজন লেখক থেকে অন্য লেখককে পৃথক করে। প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্বতা রয়েছে, যা তার মুখের ভাষা বা লেখনীতে সুস্পষ্ট হয়। হাতের লেখায় যেমন প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য খোদাই হয়ে যায়, সাহিত্যকৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়লে বাঙালি বোদ্ধা পাঠক মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারেন লেখাটি কার। ক্রিস্টাল ও ডেভি লেখকের এই বৈশিষ্ট্যকেই স্বকীয়তা (Individuality) নামে চিহ্নিত করেছেন (মজুমদার, ২০০৭)। শৈলীর আলোচনায় রচনার ভাষা বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও শুধুমাত্র ব্যাকরণগত বিচারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে না। লেখকের জটিল চিন্তা এবং অনুভূতি ভাষার বুনোটে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তা এখানে বিবেচ্য (মজুমদার, ২০০৭)। মুখের ভাষারও শৈলী রয়েছে। বক্তার বাচনিক শৈলী শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। ব্যবহারকারী তার স্বভাবগতভাবে ভাষা ব্যবহার করলেও ব্যক্তিভাষা, সামাজিক ভাষা ও পরিবেশের কারণে ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয় পার্থক্যের কারণে যেমন শৈলীর ভিন্নতা দেখা যায়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভাষা শৈলীতেও ভিন্নতা দেখা যায়। ব্যক্তিভাষার ভিন্নতাই শৈলীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

**গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল**

সমাজে বসবাসরত সকল মানুষ কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষা বা প্রমিত ভাষা ব্যবহার করলেও তাদের প্রত্যেকের ভাষা ব্যবহারের নিজস্ব ধরন বিদ্যমান। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ব্যক্তিভাষা ছাড়াও তার কণ্ঠস্বরের যে স্বাতন্ত্র্য তা কম্পিউটার সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ভয়েস বায়োমেট্রিক (Voice biometrics) নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ডাটাবেস বা করপাস তৈরি করা হয় যা বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য অনুসন্ধানে ব্যবহৃত হয়।

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সব ধরনের পরিবেশেই ব্যক্তিভাষা ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, শিশু বুলি (Baby talk) বা শৈশবে বাচ্চার ভাষায় নিজস্বতা অনেকক্ষেত্রে বাবা-মা বা দেখাশোনাকারীর ভাষাকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিভাষা ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির ভাষা সম্পর্কে যত বেশি জানা যায় তত সহজে যোগাযোগ সম্পন্ন করা যায়।

১৯৮৮ সালে পল হেরম্যান সর্বপ্রথম ব্যক্তিভাষা সম্পর্কিত ধারণা দিলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ব্যক্তিভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। চমস্কি ব্যক্তিভাষায় ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। ব্যক্তিভাষার উচ্চারণ, শব্দভান্ডার, ব্যাকরণ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ব্যক্তিভাষা সামগ্রিক ভাষার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়, বরং সমগ্র ভাষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে বিভিন্ন জ্ঞানশাখায় ব্যক্তিভাষা চর্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষাবৈচিত্র্য, ভাষা-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিভাষার গুরুত্ব অসীম। লিঙ্গ, নৃগোষ্ঠী, সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রভৃতি সামাজিক উপাদান ভাষা বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এই সকল গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ঐ সমাজের ভাষিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এই কারণে আমরা নিত্যদিনের ভাষা ব্যবহারে চারপাশের পরিবেশকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি এবং সেভাবেই ভাষাতে প্রয়োগ করি। করপাস তৈরি থেকে ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞান, সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিভাষার প্রায়োগিকতা বিদ্যমান। ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান, ব্যক্তিভাষার প্রায়োগিক ক্ষেত্র। ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তিভাষা বিশ্লেষণ করে আদালতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এতে করে আইনগত ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সহজতর হয়।

শৈলীবিজ্ঞানে লেখকের নিজস্ব ভঙ্গি বা স্টাইল প্রকাশিত হয়। ব্যক্তির মৌখিক ভাষাতে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, লিখিত ভাষাতেও অনুরূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন লেখকের ভাষা পার্থক্যের মূলে রয়েছে ব্যক্তিভাষা। একজন লেখক তার পারিপার্শ্বিকতা,

শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। শৈলীর এই স্বকীয়তার জন্য সাহিত্য আজ এতো সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময়।

ব্যক্তিভাষার সূত্রপাত ভাষা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শুরু হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধের আত্তীকরণ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে পরিবার, ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা তার ভাষাকে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের বীজ গ্রোথিত হয়, যা পরবর্তীকালে ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে পরিণত হয়। ব্যক্তিমানুষের ভাষা ব্যবহারে বাককৃতি কাজ করে। এক্ষেত্রে তিনটি সহকৃতির সম্পর্কিত ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষিক যোগাযোগ সুসম্পন্ন হয়। ব্যক্তিভাষা, সামাজিক ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা প্রমিত ভাষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং এটি সমাজভাষাবিজ্ঞানের বৈচিত্র্য বিশেষ। প্রতিটি মানুষের ভাষা ব্যবহারের নিজস্ব ধরণ থাকলেও সেটা এতোটা ভিন্ন নয় যে সমাজের অন্যরা তা বুঝতে অক্ষম হবে। এক্ষেত্রে মূলত উচ্চারণ, শব্দভান্ডার, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তিভাষায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। উচ্চারণগত বা প্রকাশ ধরনের পার্থক্যে অনেক সময় ব্যক্তিভাষা অনুধাবনে সমস্যা হয়, এতে করে ভাষিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ভাষা শিখনের ক্ষেত্রেও এটি অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

## সুপারিশমালা

সমাজকেন্দ্রিক ভাষা ব্যবহার থেকে ব্যক্তিভাষার সূত্রপাত হলেও বিভিন্ন জ্ঞান শাখায় পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিভাষার আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। ঔপভাষিক প্রেক্ষাপট, সমাজভাষাবিজ্ঞান, ভাষা-সামাজিকীকরণ, ভাষা-দর্শন, নৃভাষাবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিভাষার চর্চা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত এবং তা সাংঘর্ষিক নয়। ব্যক্তিভাষার প্রায়োগিক ক্ষেত্র, যেমনঃ শৈলীবিজ্ঞান, ফরেনসিক ভাষাবিজ্ঞানে ব্যক্তিভাষা সংক্রান্ত আলোচনার আরও সুযোগ রয়েছে। বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে কোনো গবেষণাই চূড়ান্ত নয়, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কাজের উন্মুক্ত পরিসর রয়েছে।

## উপসংহার

ভাষার প্রধান কাজ মনের ভাব অন্যের কাছে ব্যক্ত করা, তাকে বোধগম্য করানো। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার ভাব বিনিময় যোগ্যতা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিভাষাকে ভাষীদের মধ্যে নিজস্ব ভাষাগত প্যাটার্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাষা মূলত শব্দায়ন, বাক্যগঠন এবং শৈলীগত প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাষা তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত

হয়। শিশুর ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ায় সামাজিক নিয়মরীতি বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হয়। ভাষা ও সমাজ তথা সংস্কৃতি পারস্পরিক সম্পর্কিত হওয়াতে ব্যক্তিভাষাতেও বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয় ব্যাপকভাবে। ব্যক্তিভাষা, সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলেও অন্যান্য জ্ঞানশাখাতেও এর দৃঢ় পদচারণা বিদ্যমান। ব্যক্তি সমাজের সদস্য বলে সমাজের প্রভাব থেকে ভাষা কোনোভাবেই মুক্ত না। ব্যক্তিভাষায় এই সামাজিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। সামাজিক আদর্শ, প্রথা, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি সামাজিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হলেও তা সামগ্রিক ভাষার সাথে ব্যক্তিভাষাকেও প্রভাবান্বিত করে। আন্তঃব্যক্তিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিভাষার গুরুত্ব অসীম। ব্যক্তিভাষা সমাজে শুধু ভাষাবৈচিত্র্যই তৈরি করে না, ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## তথ্য-নির্দেশ

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ। (২০১৩)। ভাষাদর্শনের ইতিবৃত্ত। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা ।

———। (২০১৪)। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্যবিচার। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা ।

———। (২০২৪)। আরিফ. হা., আসাদুজুজ্জামান, ভট্টাচার্য শি. এবং সিকদার, সৌ (সম্পা.), মাতৃভাষাপিডিয়া। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা ।

আরিফ, হাকিম। (২০২৪)। সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকা ।

মজুমদার, অভিজিৎ। (২০০৭)। শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা ।

মোরশেদ, মনজুর। (সম্পা.) ইসলাম, সি., মিয়া, সা., খানম. মা এবং আহমেদ, সা। (২০১২)। বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্বকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি: ঢাকা ।

Austin, J.L. (1962). How to do things with words. Oxford University Press: Oxford.

Auer, P, Hinskens, P and Kerswill, P. (eds.). (2005). Dialect Change: Convergence and divergence in European language. Cambridge University Press: NewYork.

Backus, Ad. (2015). Rethinking Weinreich, Labov and Herzog from a usage-based pvwerspective. Amsterdm University Press. V. 67, Issue-2, 275-306.

Beeman, W.O. (2012). Linguistics and Anthropology. Tim Fernando and Nicholass Asher (eds.), Philosophy of Linguistics, Amsterdam: Holland.

Bloomfield, L. (1933). Language. Routledge Revivals: NewYork.

Bloch, B. (1948). A Set of Postulates for Phonemic Analysis Language. V. 24, Issue-1, 3-46.

Bright, W. (1971). Sociolinguistics Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Cinference 1964. Mouton and Co.

Chatterji, S. (1960). Indo-Aryan and Hindi. Calcutta University Press: Calcutta.

Chomsky, A. N. (1986). Knowledge of Language: its nature, origin and use. Praeger: New York.

Crystal, D. (2008). A dictionary of Linguistics and Phonetics. (6th eds.). MA: Blackwell Publishing.

Gibbons, J. and Turell. M.T. (2010). Dimensions of Forensic Linguistics. John Benjamins: Amsterdam.

Grant, D. (2010). Scientists view tomorrow's world and what it means to us. Linus: Birmingham.

Grant, D and Macleod, N. (2018). Resources and Constraints in Linguistic identity performance: A theory of authorship. Aston University: UK.

Harris, R. (1998). Introduction to integrational linguistics. Pergamon: Oxford.

Hasan, R. (2002). Ways of meaning: Code as an explanatory Concept. British Journal of Sociology of education, V. 23, P. 537-548.

Hajen, K. (2006). Idiolect. In Keith Brown (eds.). Encyclopedia of Language and Linguistics. Second edition, V. 5, P. 512-513, Elsvier: Oxford.

Halliday, M. A.K and others. (1964). The linguistics sciences and language teaching. Longman: London.

Hockett, C.F. (1958). A Course in modern Linguistics. Mocmillan: NewYork.

Johnstone, B. (2024). Discourse Analysis. Wiley-Blackwell: NewYork.

Kuhl, J.W. (2003). The Idolect, Chaos and Language Custom Far From Equilibrum: Conversations in Morocco. Unpublished PhD Thesis. University of Georgia.

Lambert, W.E. (1967). A Social Psychology of Bilingualism. Journal of Social Issues 23, 91-109.

Labov, W. (1963). The Social motivation of language change. Word, V. 19, 273-309.

Labov, W. (1963). Social motivation of sound change. Word, V. 19, 273-309.

Labov, W. (1972). Sociolinguistics patterns. University of Pennsylvania Press.

Ludlow, P. (2011). The philosophy of generative linguistics. Oxford University Press.

Martinet, A. (1961). A Functional view of Language. Oxford University Press.

McMenamin, G.R. (2002). Forensic Linguistics: Advances in forensic stylistics. CRC Press.

Milroy, L. (2003). Social Networks. In J. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling Estes (Eds.) The handbook of language variation and change (pp. 549-572). Blackwell.

Mufwene, S.S. (2001). Language ecology, language evolution and actuation question. Cambridge: Cambridge University Press.

Ochs, E and Schieffelin, B. (1986). Language Socialization across cultures. Cambridge University Press: NewYork.

Paul, H. (1880). Principles of history of language. New York: Longman.

Sapir, A. (1927). Speech as a Personality trait. In American Journal of Sociology, 892-905.

Sassure, F. D. (1983). Course in General Linguistics. Charles Bally and Albert Sechehaye (eds). London: Duckwoth.

Searle, R. (1969). Speech acts: An Essay in the philosophy of language. Cambridge University Press: Cambridge.

Varshney, R.L. (1992). An Introductory Text book of Linguistics and Phonetics. Student Store: Bareilly.

Wittgensteig, L. (1922). Tractatus Lagico-Philosophicus. Routledge & Kegan paul.

Wrienreich, U. (1954). Is Structural Dialectology Possible? Word. V. 10, Issue: 2-3, 388-405.

Wright, D. (2018). idiolect. Aronff, M. (eds). Oxford bibliographies in Linguistics.p. Oxford University Press: New York.

# বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প: ভাষাবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ

মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম*

**Abstract:** Bibhutibhushan Bandyopadhyay (1894-1950), a representative short story writer of Bengali fiction. This narrator builds his story on the trinity of man, nature, and spiritual consciousness, seeking the totality of human life. In dissecting his short stories, it appears that the balanced use of idioms, characterisation techniques and rhetorical structure has elevated short stories to the highest standards of art. The main object of the present study is to find out the nature of the idiom and the technique of applying it in short stories. A qualitative approach was used in the study. In addition, text-analytic methods and, where applicable, comparative discussion methods have also been used. His short stories are characterised by simple, vivid language that promotes a close connection between readers and the characters and surroundings. His unusual language style merges poetic descriptions of nature with rustic vernacular in dialogue, conveying a feeling of humanity and regional reality. This research intends to offer a novel perspective on the linguistic aspects of Bengali short stories and urges a re-evaluation of Bandyopadhyay's works within language-based literary criticism.

**মূলশব্দ (Keyword)**: ভাষাবৈশিষ্ট্য (Language Features), প্রয়োগ (Apply), আঞ্চলিকতা (Regionalism)

## ভূমিকা

ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের নবীনতম শাখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব্যসাচী হাতে এর জন্ম হলেও পরবর্তী ছোটোগল্পকারদের সৃজনশীল পরিচর্যায় এর কলাকৃতির বিস্তার ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

* ড. মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা, ইমেইল: biddut.cou@gmail.com

সমালোচক ও তাত্ত্বিকরা ছোটোগল্পের রূপ ও রীতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। ক্ষুদ্রায়তনিক অবয়বের অধিকারী হলেও জীবনের পূর্ণতর অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা ছোটোগল্পের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। ছোটোগল্পের শুরু থেকেই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে; ঘটনা, চরিত্র ও ভাব সেই লক্ষ্যের অভিমুখী হয়। এই একমুখিতাই ছোটোগল্পের অনিবার্য গতিকে নির্দেশ করে। ছোটোগল্প সমস্ত প্রকার বাহুল্য থেকে মুক্ত, এটি ক্ষুদ্র অবয়বসম্পন্ন ও জীবনের খণ্ডাংশ হওয়ার ফলে ঘটনা, কাহিনি, সংলাপ, ভাব ও ভাষায় সকল প্রকার বাহুল্য অবশ্য বর্জনীয়। ছোটোগল্পে থাকে 'ধারণার সমগ্রতা' প্লটের মতো ধারণার বিন্যাসও সেখানে গাঢ়বদ্ধ হওয়া জরুরি। প্রতিভাধর গল্পকার ছোটোগল্পে জীবনের একটি চকিত মুহূর্তকে তুলে আনলেও তা তাঁর একমুখিতা, বাহুল্যমুক্ত ভাব ও ভাষা, ধারণার বিন্যাসের গাঢ়বদ্ধতা তথা শিল্পিত প্রকাশের কারুকার্যে অখণ্ড জীবনের সামগ্রিক ব্যঞ্জনাকেই প্রতিরূপিত করে। ছোটোগল্পের ইঙ্গিতমূলক পরিণতিও এর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। এই ইঙ্গিতমূলক পরিণতি দুই ধরনের হয়ে থাকে। পরিণতির ব্যঞ্জনাধর্মিতা ও বক্রোক্তিময়তা। পরিণতির ব্যঞ্জনাধর্মিতায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে জীবনের গভীরতলের মূলসূত্র আবিষ্কৃত হয়। আর বক্রোক্তিময়তায় গল্পের পরিণতিতে মানব জীবনের অসংগতিগুলোকে বক্রোক্তি ও তীব্র আয়রনির চাবুকের কষাঘাতে জর্জরিত করা হয়। বক্রোক্তিতে সেরা ছিলেন মোপাসাঁ আর ব্যঞ্জনাগর্ভ গল্প লেখায় অন্যতম ছিলেন আন্তন চেকভ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে বক্রোক্তির চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশি। তাঁর ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহারের ছোটোগল্পে রসপ্রবাহটি গল্পের শেষাংশে প্রয়োগ ঘটে পাঠককে চকিতে ভাবিত করে তোলে। গোটা গল্পটি হয়তো খুব সাধারণ কিন্তু এর উপসংহারের ব্যঞ্জনা গল্পটিতে নতুন প্রাণরসের সঞ্চার করে। এ জাতীয় ছোটোগল্পকে শেক্সপিয়রের সনেটের সর্বশেষ দ্বিপদীর সঙ্গে তুলনা করে ইংরেজ সমালোচক এ. এস. কলিন্স বলেন– So...short story resembles a Shakespearian sonnet in which similarly, a slow exposition culminates in a flash which throws back its illumination on the whole. (Collins 1965: 247).

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ব্যঞ্জনাপূর্ণ উপসংহার ছাড়াও নানাবিধ বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে শিল্পরূপের সচেতন প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথার্থ শিল্পী হিসেবে কাহিনিকে শানিত করতে এবং শব্দ, বাক্যের মাধুর্য সৃষ্টিতে শিল্পের সকল উপাদানের মিশ্রণে তিনি তাঁর ছোটোগল্পের শারীরবৃত্তীয় নির্মাণ করেছেন। গল্পের কাঠামো বিন্যাসের সমান্তরালে বিভিন্ন আলংকারিক উপাদানের সুষম প্রয়োগ তাঁর ছোটোগল্পকে শিল্পসফল করে তুলেছে। গল্পের কাহিনিগ্রন্থনা, ভাব, ভাষাবৈশিষ্ট্য, নানামাত্রিক শব্দপ্রয়োগ, সংলাপ, দৃষ্টিকোণ, চরিত্রায়ণ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ঘ্রাণকল্প, চিত্রকল্প, পৌরাণিক অনুষঙ্গ ও রং এর বিবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই শিল্পরূপের অন্তর্গত। তিনি ছোটোগল্পের বিষয়কে প্রস্ফূটিত করতে ও উপযোগী প্রতিবেশ রচনার্থে শিল্পরূপের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষাশৈলীর স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা। তাঁর গল্পে শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, আঞ্চলিকতার ব্যবহার ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষাবৈশিষ্ট্যের মৌলিক দিকগুলো চিহ্নিত করা। বিশেষভাবে লক্ষ করা হবে, ভাষার প্রয়োগ কীভাবে আখ্যান নির্মাণকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এবং সেই ভাষার মাধ্যমে লেখক কীভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনের অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ ও শব্দ ব্যবহার এবং অপশব্দ কীভাবে দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ করে সংলাপকে শক্তিমান করে তুলেছে তা অনুসন্ধান করা, মোটকথা বাংলা ছোটোগল্পে ভাষাপ্রয়োগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান নিরূপণই বর্তমান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প নিয়ে গবেষণামূলক কাজ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। তাঁর ছোটোগল্পের আঙ্গিক বা শারীরবৃত্তীয় গঠন প্রকৌশল ও ভাষাবৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণামূলক কাজ নেই বললেই চলে। অথচ ভাষা সাহিত্যকর্মের প্রাণ এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলীর নান্দনিকতা তাঁর ছোটোগল্পগুলোকে পাঠকের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আঞ্চলিক শব্দ, লোকজ উপাদান, মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া ও মানবিক বোধের প্রতিফলনের মাধ্যমে তিনি গল্পকে বাস্তবানুগ ও কাব্যধর্মী এক অনন্য মাত্রা দিয়েছেন। তাই ভাষার এই বিশেষ প্রয়োগ কৌশল বিশ্লেষণ করলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদানকে যথার্থভাবে মূল্যায়নের জন্যও এই গবেষণাকর্ম গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও যৌক্তিক।

**গবেষণা পদ্ধতি**

বর্তমান গবেষণাকর্মটি গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট ছোটোগল্পসমূহকে মূল উপাদান (Primary Text) হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ বিশ্লেষণ (Textual Analysis) করা হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনা ও ভাষাভিত্তিক ব্যাখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে তাঁর ভাষাশৈলী, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, সংলাপ ও বর্ণনার ভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচ্য গল্পগুলোতে লেখকের ভাষার স্বাতন্ত্র্য, আঞ্চলিক শব্দ ও দেশীয় বাকরীতির ব্যবহারের করণকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষণার সহায়ক উপাদান হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিয়ে রচিত প্রবন্ধ, সমালোচনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থাদিকে গৌণ উপাদান (Secondary Sources) হিসেবে পর্যালোচনা করে পাঠ বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে। ছোটোগল্পের পাঠ বিশ্লেষণে ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামো পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় প্রধানত বর্ণনামূলক (Descriptive) ও বিশ্লেষণাত্মক কৌশল (Analytical) ব্যবহার করে তাঁর গল্পভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

**ভাষাবৈশিষ্ট্য**

ছোটোগল্পে পাঠক ও লেখকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ভাষা। ছোটোগল্পের বিষয় ও মেজাজ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ভাষাপ্রয়োগ এর শিল্পমান অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে ভাষাপ্রয়োগে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটোগল্প রচনায় সাধু ও চলিতরীতি যুগপৎভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় সাধুরীতির পরিচর্যা থাকলেও জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি চলিতরীতির ব্যবহার করেছেন। নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন- "বিভূতিভূষণের গদ্য 'স্নিগ্ধ, সরল ও স্বচ্ছ', কিন্তু এই সরলতার আড়ালে অসাধারণ ভাষাশৈলীর বুনন লুকিয়ে আছে" (চক্রবর্তী, ২০১০: ১১২)। শহরের পটভূমিতে রচিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে তিনি প্রমিত ভাষাকেই বেছে নিয়েছেন। এছাড়া কলকাতা শহরের কথ্যভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রমিত ভাষার সংলাপের উদাহরণ–

> মামিমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, –যাবে সেখানে কেমন করে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটি পাতা চিবিয়ে তো মানুষে [...] তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই (ভণ্ডুলমামার বাড়ি, ১৪১৯: ৯২)।

এছাড়া তাঁর ছোটোগল্পের ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে নানামাত্রিক স্বরসঙ্গতি, স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ, সমীভবন, মহাপ্রাণহীনতা, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রভৃতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ভাষা ও সংলাপকে বিশ্লেষণ করলে প্রচুর আনুনাসিক স্বরধ্বনি, উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দদ্বৈত, পদাশ্রিত নির্দেশক, আঞ্চলিক শব্দ, ধন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় নিম্নে উদাহরণসহ এগুলোর বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো।

*স্বরসঙ্গতি*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ব্যবহৃত গ্রামীণ জনপদের ভাষায় স্বরধ্বনির পরিবর্তন রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত তিনটি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। জানা কথা, সাধারণত একস্বরের প্রভাবে শব্দস্থিত অন্যস্বরের যদি পরিবর্তন ঘটে এবং তা যদি একই ধরনের হয়ে ওঠে তবে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পের ভাষার শব্দ বিশ্লেষণে স্বরসঙ্গতির নয় ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন:

**১.** (অ-ও): রূপমূলের আদিতে অবস্থিত /অ/ ধ্বনি কখনো/ও/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ:

'দৈবাৎ' গল্পে বলো > বোলো; 'ফকির' গল্পে করো > কোরো; 'বৈদ্যনাথ' গল্পে অফিস > আফিস; 'পাঁচু মামার বিয়ে' গল্পে দুইশত > দুশো, অফিসে > আপিসে; 'ঠাকুরদার

গল্প' গল্পে গরু > গোরু; 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পে হল > হোলো; 'বিরজা হোম ও তার বাধা' গল্পে হত > হোত, পোরেনি; 'কাশি কবিরাজের গল্প' গল্পে হল > হোলো; 'টান' গল্পে করে > কোরে; 'ছায়াছবি' গল্পে হত > হোতো; 'হারুন অল রসিদের গল্প' গল্পে বসলো > বোসলো; 'মুখোশ ও মুখশ্রী' গল্পে হলেন > হোলেন ইত্যাদি।

২. (আ-এ্যা): রূপমূলের প্রথমে অবস্থিত /আ/ ধ্বনির কখনো /এ্যা/ ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। উদাহরণস্বরূপ:

'আহ্বান' গল্পে নাও > ন্যাও; 'ডাকগাড়ি' গল্পে দাও > দ্যাও; 'পৈতৃক ভিটা' গল্পে হারিকেন > হ্যারিকেন; 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে টাকা > ট্যাকা ইত্যাদি।

৩. (আ-এ): শব্দের মধ্যে অবস্থিত/আ/ধ্বনি কখনো/এ/ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ:

'বিপদ' গল্পে সিঙ্গাড়া > সিঙ্গেড়া; 'পাঁচু মামার বিয়ে' গল্পে জিজ্ঞাসা > জিগ্যেস, 'ঠাকুরদার গল্প' গল্পে বিশ্বাস > বিশ্বেস; 'বাক্স বদল' গল্পে জ্ঞান > গেয়ান; 'হারুন অল রসিদের গল্প' গল্পে হিসাব > হিসেব; 'কলহান্তরিতা' গল্পে জিজ্ঞাসা > জিজ্ঞেস; 'পথিকের বন্ধু' গল্পে সন্ধ্যাবেলা > সন্দেবেলা; 'ননীবালা' গল্পে ক্ষুধা > খিদে; 'আর্টিস্ট' গল্পে ভিক্ষা > ভিক্ষে; 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' গল্পে মিথ্যা > মিথ্যে; 'মশলাভূত' গল্পে নিলাম > নিলেম; 'তেঁতুলতলার ঘাট' গল্পে অমাবস্যা > অমাবস্যে; 'কমপিটিশন' গল্পে তিনটা > তিনটে, জানিনা > জানিনে, অভ্যাস > অভ্যেস, হিসাবে > হিসেবে ইত্যাদি।

৪. (আ-ই/এ/ও): শব্দের শেষে অবস্থিত /আ/ ধ্বনি কখনো /ই/ /এ/ /ও/ হিসেবে উচ্চারিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ: 'বিপদ' গল্পে হুক্কা > হুঁকো; 'উইলের খেয়াল' গল্পে সুবিধা > সুবিধে; 'বাক্স বদল' গল্পে ভিখারি > ভিখিরি; 'ঠাকুরদার গল্প' গল্পে সন্ধ্যা > সন্ধ্যে; 'বিরজা হোম ও তার বাধা' গল্পে নৌকা > নৌকো; 'মুখোশ ও মুখশ্রী' গল্পে ঘুমায় > ঘুমোয়; বিকাল > বিকেল; 'ঝড়ের রাতে' গল্পে শুকনা > শুকনো; 'আর্টিস্ট' গল্পে সুতা > সুতো, জুতা > জুতো; 'আমার ডাক্তারী' গল্পে ধুলা > ধুলো; 'অনুসন্ধান' গল্পে কুলায় > কুলোয়; 'ভূত' গল্পে দুটা > দুটো; 'বিপদ' গল্পে বুড়া > বুড়ো; 'সতীশ' গল্পে পূজা > পূজো; 'ডালুর বিপদ' গল্পে নৌকা > নৌকো, বিলাতি > বিলিতি; 'মশলাভূত' গল্পে গুদাম > গুদোম; 'বেসাতি' গল্পে দেখাশুনা > দেখাশুনো; 'গিরিবালা' গল্পে সন্ন্যাসিনি > সন্নিসিনি; 'পড়ে যাওয়া' গল্পে বন্যা > বন্যে ইত্যাদি।

৫. (ই-এ): রূপমূলের আদিতে অবস্থিত /ই/ ধ্বনি /এ/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

'কমপিটিশন' গল্পে সিদ্ধ > সেদ্দ; 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে দিলাম > দেলাম,

'বেসাতি' গল্পে ছিল > ছেল, কিনব > কেনবো; 'বোতাম' গল্পে পিতলের > পেতলের; 'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব' গল্পে দিবা > দেবা, 'বরো বাগদিনী' গল্পে নিলাম > নেলাম; 'গিরিবালা' গল্পে চিনে > চেনে; 'খুকির কাণ্ড' গল্পে নিন > নেন; 'ডানপিটে' গল্পে নিবেন > নেবেন, দিবেন > দেবেন ইত্যাদি।

**৬.** (এ-আ/এ্যা/ই): শব্দের আদি ও অন্তে অবস্থিত /এ/ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে /আ/ / এ্যা/ ও /ই/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন: 'নসুমামা ও আমি' গল্পে দেখো > দ্যাখো; 'আহ্বান' গল্পে এলাম > অ্যালাম, খেতে > খেতি, দেখ > দ্যাখো; 'ফকির' গল্পে দিচ্ছে > দেচ্ছে; 'ঠাকুরদার গল্প' গল্পে নেই > নিই; 'বাক্স বদল' গল্পে দেশি > দিশি; 'কাশি কবিরাজের গল্প' গল্পে যেতে > যাতি, যেতাম > যাতাম; 'বিপদ' গল্পে দেখলাম > দ্যাখলাম; 'আমোদ' গল্পে কেমন > ক্যামন; 'বায়ুরোগ' গল্পে মিছেমিছি > মিছিমিছি; 'কিন্নর দল' গল্পে এতদিন > অ্যাদ্দিন; 'ভিড়' গল্পে বেটা > ব্যাটা; 'তেঁতুলতলার ঘাট' গল্পে এদিকে > ইদিকে; 'রাসু হাড়ি' গল্পে খেতে > খাতি; 'দৈব ঔষধ' গল্পে রাখতি; 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে এলাম > আলাম, দাও > দ্যাও, দিতে > দিতি, 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' গল্পে বেগুন > বাগুন; 'নদীর ধারে বাড়ি' গল্পে জন্যে > জন্যি, নিজের > নিজির ইত্যাদি।

**৭.** (এ-ও): রূপমূলের মধ্যে অবস্থিত /এ/ ধ্বনির /ও/ ধবনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন:

'শাবলতলার মাঠ' গল্পে নারকেল > নারকোল; 'রহস্য' গল্পে মুখ > মুখো; 'মেডেল' গল্পে দেব > দোব; 'অন্তর্জলি' গল্পে দেব > দোবো ইত্যাদি।

**৮.** (ওই-ও): শব্দস্থিত /ওই/ ধ্বনির /ও/ ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন:

'উইলের খেয়াল' গল্পে বৈশাখ > বোশেখ; 'আমোদ' গল্পে চৌদ্দ > চোদ্দ ইত্যাদি।

**৯.** (এ-ই): শব্দের অন্তে অবস্থিত /এ/ ধ্বনি /ই/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন:

'আহ্বান' গল্পে জন্যে > জন্যি; 'কাশি কবিরাজের গল্প' গল্পে সারাতে > সারাতি; 'দুর্মতি' গল্পে দেখি > দিকি; 'বর্শেলের বিড়ম্বনা' গল্পে অবশ্য > অবিশ্যি; 'ডাকগাড়ি' গল্পে ভাগ্য > ভাগ্যি; 'ডাইনী' গল্পে দেখি > দিখি; 'দৈব ঔষধ' গল্পে বলতে > বলতি, এলে > এলি; 'রূপো বাঙাল' গল্পে যেতে > যেতি, ঘুমালে > ঘুমুলি; 'সিঁদুরচরণ' গল্পে পরলে > পরলি, ভাবতে > ভাবতি, তাহলে > তাহলি, গেলে > গেলি, এদিকে > ইদিকি; 'কাঠবিক্রি বুড়ো' গল্পে থাকলে > থাকলি, কাটতে > কাটতি, হতে > হতি, দিতে > দিতি; 'বুড়ো হাজরা কথা কয়' গল্পে খেতে > খেতি ইত্যাদি। 'যশোরের আঞ্চলিক উচ্চারণে রূপমূলের শেষে /এ/ ধ্বনি সাধারণত /ই/ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। যশোরের গ্রামাঞ্চলের মানুষ /ই/ উচ্চারণেই বেশি অভ্যস্ত।' (মাসুদ, ১৯৯৪: ৪৮)।

**আনুনাসিক স্বরধ্বনি**

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় দুইভাবে উচ্চারিত হয়। আনুনাসিক ও মৌখিক। এক্ষেত্রে প্রধানতম পার্থক্য হলো মানুষ যখন আনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে তখন বায়ু মুখ ও নাক উভয়দিক থেকেই বের হয়। আর মৌখিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শুধু মুখ দিয়েই শ্বাসবায়ু নির্গত হয়। আঞ্চলিক উচ্চারণে ভিন্নতার কারণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে অসংখ্য আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নে এর উদাহরণ দেওয়া হলো:

'বিপদ' গল্পে দাঁড়াইয়া, বেঁচে, পোঁটলা, হ্যাঁ, খুঁজিতেছে, কাঁটাল, হাঁড়ি, বনগাঁয়ে, কোঁচড়, আঁচল, পাড়াগেঁয়ে, হুঁ; 'গল্প নয়' গল্পে গুঁজলাম, ওঁর, তাঁর, বাঁধ, বাঁশের, দাঁড়ালো, পৌঁছেচি; 'চাউল' গল্পে টাঁড়, নাঁকটিটাড়, উঁচু, পুঁটলি, কাঁচা, ছেঁড়া, কাঁথা, গাঁয়ের, খুঁজে, কুঁজো, কাঁধে, হাঁড়ি, বাঁধা; 'নসুমামা ও আমি' গল্পে বাঁশবন, বেঁচে, হাঁপিয়ে, আঁচে ইত্যাদি।

**স্বরাগম**

সাধারণত গ্রামের মানুষের কথোপকথনে শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকার পর উচ্চারণের বিকৃতি বা সুবিধার্থে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের আগে অতিরিক্ত একটি স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। মূলত বিদেশি রূপমূলের ক্ষেত্রেই স্বরধ্বনির আগম ঘটে। (কুমার দাস, ২০০৬: ১২০)। উচ্চারণের সময় শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে বলে একে স্বরাগম বলে। শব্দে তিন ধরনের স্বরাগম দেখা যায়। আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম ও অন্ত্যস্বরাগম।

১. উচ্চারণের সময় রূপমূলের আদিতে যদি স্বরের আগম ঘটে তবে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন: 'গল্প নয়' গল্পে স্টেশন > ইস্টিশান; 'শাবলতলার মাঠ' গল্পে স্কুল > ইস্কুল; 'থনটন কাকা' গল্পে গ্লাস > গেলাস; 'ঠেলাগাড়ি' গল্পে স্টিমার > ইস্টিমার; 'বিক্রমখোল' গল্পে স্টার > ইস্টার, 'কমপিটিশন' গল্পে ইঞ্জিনিয়ার > এনজিনিয়ার, 'বেসাতি' গল্পে স্কুলের > ইস্কুলের ইত্যাদি।

২. উচ্চারণের সময় রূপমূলের মধ্যে যদি স্বরের আগম ঘটে তবে তাকে মধ্য স্বরাগম বলে। যেমন:

   'ডালুর বিপদ' গল্পে স্বপ্ন > স্বপন; 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' গল্পে চারপাশে > চারিপাশে; 'পৈতৃক ভিটা' গল্পে খুব > খু-উ-ব; বারই > বারোই; 'দৈব ঔষধ' গল্পে চারধারে > চারিধারে; 'সংসার' গল্পে গিয়েছিল > গিইছিল; 'দুইদিন' গল্পে সতেরই > সতেরোই ইত্যাদি।

৩. উচ্চারণের সময় রূপমূলের শেষে যদি স্বরের আগম ঘটে তবে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন:

‘অন্তর্জলি’ গল্পে কদম > কদম্ব; বরো বাগদিনী’ গল্পে স্পর্ধা > আস্পদ্দা ইত্যাদি।

**বিপ্রকর্ষ**

সাধারণত উচ্চারণের সময় রূপমূলের মধ্যে নতুন স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এক স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বিপ্রকর্ষ বলে। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে বিপ্রকর্ষের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন: ‘নুটি মন্তর’ গল্পে মন্ত্র > মন্তর; ‘চ্যালারাম’ গল্পে শীঘ্র > শীগগির; ‘বিপদ’ গল্পে প্রসাদ > পেসাদ; ‘কিন্নর দল’ গল্পে খ্রিস্টানি > খিরিস্টানি, কখনো > ককখনো; ‘পার্থক্য’ গল্পে চাল > চাউল; ‘তেঁতুলতলার ঘাট’ গল্পে রাত্রে > রাত্তিরে; ‘কমপিটিশন’ গল্পে বায়নাপত্র > বায়নাপত্তর; ‘রাসু হাড়ি’ গল্পে জিনিসপত্র > জিনিসপত্তর; ‘দৈব ঔষধ’ গল্পে পিত্ত > পিত্তির; ‘অন্তর্জাল’ গল্পে কৃপা > কিরপা, দুপুর > দু’পহর; ‘খোলস’ গল্পে মোকদ্দমা > মোকর্দমা; ‘নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব’ গল্পে মাত্র > মাত্তর, ধর্ম > ধরম; ‘বরো বাগদিনী’ গল্পে প্রাণ > পেরান; ‘গিরিবালা’ গল্পে প্রতিষ্ঠা > পিতিষ্ঠে, প্রসাদ > পেসাদ, কৃপা > কিরপা, মূর্খ > মুরুক্ষু, শ্রীমুখ > ছিরিমুখ; ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পে প্রজাপত্র > প্রজাপত্তর ইত্যাদি।

**মহাপ্রাণহীনতা**

মহাপ্রাণহীনতা চলিত শিষ্ট বাংলা ও অন্যান্য গ্রামীণ জনপদের ভাষার একটা সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। রূপমূলের মধ্যে অনেক সময় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। রূপমূলাস্থিত মহাপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণতা লাভ করে। সমস্ত প্রক্রিয়ার পেছনে একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ বিদ্যমান। মহাপ্রাণধ্বনি গঠনের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস বের হওয়ার সময় বাতাসের প্রবাহ হয় আকস্মিক, কিন্তু যদি বহির্গামী বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ধীরে প্রবাহিত হয় তাহলে ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারিয়ে ফেলে (মনজুর মোরশেদ, ১৯৯৫: ৩৭০)। যশোর ও রাজশাহীর উপভাষায় শব্দের মধ্যে ও শেষে মহাপ্রাণধ্বনি লোপ পায়। কুষ্টিয়ার উপভাষায় রূপমূলের শেষে মহাপ্রাণধ্বনি লোপ পেয়ে অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ব্যবহৃত ভাষা ও সংলাপের রূপমূলের শেষে এবং মধ্যে মহাপ্রাণহীনতা লক্ষণীয়। যেমন: ‘বিপদ’ গল্পে দিয়েচে, বলেচে, মেরেচে, গিয়েচে, করেচ, শুনিচি, লিখিয়েচে, দেখচি, শুনচি, কিনিচি, শিখিচি; ‘গল্প নয়’ গল্পে করেচি হয়েচে, যাচ্চি, বলচে, শুনেচি; ‘চাউল’ গল্পে এসেচি, করেচে, চলেচে, খাটচে; ‘নসুমামা ও আমি’ গল্পে দিচ্চি, নিয়েচে, রাঁধচে, পুঁতেচেন, ঘষচে, হারিয়েচি, মাজচো ইত্যাদি।

**সমীভবন**

দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সমীভবনের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন: ‘বিপদ’ গল্পে অশ্রদ্ধা > অছেদ্দা; ‘দৈবাৎ’ গল্পে স্বর্গে > স্বগ্‌গে; ‘ননীবালা’ গল্পে রৌদ্রের > রদ্দুরের; ‘কাদা’ গল্পে কর্ম > কম্মো, সর্ব > সব্বো; ‘আমোদ’ গল্পে ভদ্র > ভদ্দর; ‘অভিনন্দন সভা’ গল্পে আশীর্বাদে > আশীব্বাদে, দুর্গাপুর > দুগ্‌গাপুর; ‘অরন্ধনের নিমন্ত্রণ’ গল্পে রাত্রি > রাত্তির; ‘পুরোনো কথা’ গল্পে প্রায়শ্চিত্ত > প্রাচিত্তির; ‘বাটিচচ্চড়ি’ গল্পে রুগ্ন > রুগণ্; ‘বিধু মাস্টার’ গল্পে কতদূর > কদ্দূর; ‘কিন্নর দল’ গল্পে ভদ্র > ভদ্দর; ‘থিয়েটারের টিকিট’ গল্পে বললে > বল্লে; ‘তালনবমী’ গল্পে নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন; ‘তেঁতুলতলার ঘাট’ গল্পে কতদিন > কদ্দিন, কৃপণ > কেপ্পন; ‘বারিক অপেরা পার্টি’ গল্পে সর্বনাশ > সব্বনাশ; ‘বরো বাগদিনী’ গল্পে গর্দান > গদ্দান; ‘সংসার’ গল্পে ভদ্রলোকের > ভদ্দরনোকের ইত্যাদি।

**সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি**

সাধারণত নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন: ‘বিরজা হোম ও তার বাধা’ গল্পে বৃষ্টি > বিষ্টি; ‘অরন্ধনের নিমন্ত্রণ’ গল্পে অনাসৃষ্টি > অনাছিষ্টি; ‘নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব’ গল্পে বৃত্তি > বিত্তি; ‘ভণ্ডুলমামার বাড়ি’ গল্পে সৃষ্টির > ছিষ্টির; ‘বুধোর মায়ের মৃত্যু’ গল্পে অদৃষ্ট > অদেষ্ট; ‘জলসত্র’ গল্পে তৃষ্ণা > তেষ্টা ইত্যাদি।

**‘ন’ এর স্থানে ‘ল’; ‘ল’ এর স্থানে ‘ন’**

যশোর অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের ভাষায় /ন/ স্থানে /ল/ এবং /ল/ স্থানে /ন/ এর উচ্চারণ প্রবণতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (মাসুদ, ১৯৯৪: ৪৮)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ভাষাপ্রয়োগে এই বৈশিষ্ট্যের প্রক্ষেপণ লক্ষণীয়। যেমন: ‘আহ্বান’ গল্পে লোক > নোক; ‘অরন্ধনের নিমন্ত্রণ’ গল্পে লেবু > নেবু; ‘তেঁতুলতলার ঘাট’ গল্পে লুচি > নুচি; ‘কমপিটিশন’ গল্পে নম্বর > লম্বর; ‘রাসু হাড়ি’ গল্পে লা-পাত্তা > না-পাত্তা; ‘বরো বাগদিনী’ গল্পে লোকের > নোকের; ‘সংসার’ গল্পে লেবুর রস > নেবুর রস, ভদ্রলোকের > ভদ্দরনোকের; ‘বাসা’ গল্পে লেকচার > নেকচার; ‘বড় দিদিমা’ গল্পে নাড়ু > লাড়ু; ‘ঠেলাগাড়ি’ গল্পে বাতাবীলেবু > বাতাবীনেবু; ‘সুলেখা’ গল্পে লেবুফুল > নেবুফুল; ‘অসমাপ্ত’ গল্পে লেখাপড়া > নেকাপড়া; ‘সিঁদুরচরণ’ গল্পে লাগবে > নাগবে, কৃষ্ণনগর > কেষ্টলগর; ‘কাঠবিক্রি বুড়ো’ গল্পে নায়েব > লায়েব; ‘বুড়ো হাজরা কথা কয়’ গল্পে বড়োলোক > বড়োনোক; ‘দ্রব্যময়ীর কাশীবাস’ গল্পে লক্ষ্মী > নক্ষী, লেপ > নেপ ইত্যাদি।

### আদ্য ‘র’ এর স্থানে ‘ন’/ ‘ল’

যশোরের কোনো কোনো অঞ্চলের উচ্চারণে আদ্য /র/ ধ্বনিকে /ন/ ধ্বনি রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণত গ্রাম্য অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা এধরনের উচ্চারণে অভ্যস্ত (মাসুদ, ১৯৯৪: ৫০)। যেমন : ‘বায়ুরোগ’ গল্পে বগুড়া > বগুলা; ‘বরো বাগদিনী’ গল্পে রক্ত > নক্ত, রাঙা > নাঙা, রস > নস ইত্যাদি।

### ‘র’ ধ্বনি লোপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের ভাষায় /র/ ধ্বনির লোপে শব্দ উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন: ‘আহ্বান’ গল্পে অর্ধেক > অদ্ধেক; ‘উইলের খেয়াল’ গল্পে করতে > কত্তে; ‘মায়া’ গল্পে রাত্রি > রাত্তি; ‘ননীবালা’ গল্পে সার্থক > সাত্তোক; ‘ননীবালা’ গল্পে অর্ধেক > আদ্ধেক; ‘ভূত’ গল্পে করছিস > কচ্ছিস; ‘বিপদ’ গল্পে ক্রোশ > ক্লোশ; ‘আমোদ’ গল্পে ছ-ক্যোশ > ছ-কোশ; ‘তেঁতুলতলার ঘাট’ গল্পে পূর্ব > পুব; ‘রাসু হাড়ি’ গল্পে মূর্খ > মুখ্য; ‘বেসাতি’ গল্পে করতে > কত্তি; ‘বড় দিদিমা’ গল্পে মরলেই > ম’লেই; ‘উপেক্ষিতা’ গল্পে মরল > ম’ল; ‘ঠেলাগাড়ি’ গল্পে করছিলাম > কচ্ছিলাম; ‘খুকির কাণ্ড’ গল্পে করে > কচ্ছে; ‘সার্থকতা’ গল্পে করলে > কল্লে; ‘জন্ম ও মৃত্যু’ গল্পে মরল > মোলো; ‘বুধোর মায়ের মৃত্যু’ গল্পে মৃত্যু > মিত্যু; ‘বুড়ো হাজরা কথা কয়’ গল্পে মরদলোক > মদ্দলোক; ‘মডি মটের মেলা’ গল্পে কর্তাল > কত্তাল ইত্যাদি।

### উপসর্গ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে আদি প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ তথা উপসর্গের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উপসর্গের যথার্থ প্রয়োগ তাঁর ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাষাকেও শক্তিশালী করেছে। যেমন: ‘বিপদ’ গল্পে সু-সংবাদ; ‘গল্প নয়’ গল্পে অসাধারণ, অবিশ্বাস; ‘বিড়ম্বনা’ গল্পে অসুবিধা, অসম্ভব; ‘শাবলতলার মাঠ’ গল্পে অদ্বিতীয়, অস্পষ্ট; ‘দুর্মতি’ গল্পে বিপক্ষ, অপ্রতিভ, অসম্ভব, অসচ্ছল, অপ্রত্যাশিত; ‘ফকির’ গল্পে অনেষ্য, অঘোরে, অচৈতন্য, অখুশি; ‘বৈদ্যনাথ’ গল্পে নিখোঁজ, সুবাদ, অপ্রসন্ন, অভাব, অপরিবর্তনীয়, অপরিণত, অবাধ্য; ‘জনসভা’ গল্পে সুগন্ধি, সগর্বে, অসংলগ্ন, অদেখা, অভাবে; ‘পাঁচু মামার বিয়ে’ গল্পে অধীনতা, অস্বীকার, অকথা, অসুখ, অজমূর্খ, দুরবস্থা, অসহায়, অশান্তি; ‘ঠাকুরদার গল্প’ গল্পে নির্বুদ্ধিতা, অভদ্র, অস্পষ্ট, অনাহার; অগত্যা; ‘একটি ভ্রমণকাহিনী’ গল্পে অমীমাংসিত, অপরাধ, সমাগত, সপরিবারে, প্রতিবাদ, অবিচার; ‘কাশি কবিরাজের গল্প’ গল্পে অপয়া, প্রফুল্ল, অস্বাভাবিক; ‘মায়া’ গল্পে অজ্ঞান, অসুবিধা, সুনিদ্রা, অবসাদ ইত্যাদি।

## অনুসর্গ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে অন্ত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ তথা অনুসর্গের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 'বিপদ' গল্পে দোকানদার; 'দুর্মতি' গল্পে শেষবেলা; 'ফকির' গল্পে নামজাদা; 'কাদা' গল্পে অথচ, চেয়ে, কাছে; 'বিপদ' গল্পে ধরিয়া; 'আমোদ' গল্পে থেকে, নিয়ে; 'অভিনন্দন সভা' গল্পে দ্বারা; 'মরফোলজি' গল্পে ছাড়া, হন্য, কর্তৃক; 'বায়ুরোগ' গল্পে কাছে; 'বড়বাবুর বাহাদুরি' গল্পে ধরিয়া; 'অন্নপ্রাসন' গল্পে হইতে, দিয়া, ছাড়া; 'খোশগল্প' গল্পে পক্ষে, হইতে, ধরিয়া, সহিত; 'একটি দিনের কথা' গল্পে থেকে, সংগে; 'তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প' গল্পে অথচ, পক্ষে; 'ছেলে ধরা' গল্পে দিকে; 'বিধু মাস্টার' গল্পে ধাতুরূপ; 'কিন্নর দল' গল্পে রাজকুমারীর মতো; মেয়েদের মধ্যে; 'ভিড়' গল্পে কতবার; 'কবিকুণ্ড মশায়' গল্পে আগন্তুক বিনা আলোয় এসেছে; 'পুঁইমাচা' গল্পে মনোযোগের সহিত, ডালা হইতে; 'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পে অভয়ের সহিত; 'মাকাল লতার কাহিনী' গল্পে আকাশের পানে, ফলের মতো; 'শিকারী' গল্পে সন্দেবেলা, সকালবেলা; 'মানতালাও' গল্পে চৌকিদার ইত্যাদি।

## পদাশ্রিত নির্দেশক

বাংলা ভাষায় কিছু কিছু প্রত্যয় বা শব্দাংশ শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে পদের নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহারের তারতম্য ঘটে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে টি, টা, খানা, টুকু, রা, গুলো ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার শব্দে ডা-এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন: 'বিপদ' গল্পে ছবিটি, পাঁচটা; 'গল্প নয়' গল্পে লোকটি, লোকটা; 'চাউল' গল্পে আধটা; 'দৈবাৎ' গল্পে চারিটি; 'বিড়ম্বনা' গল্পে চেহারা খানি; 'আহ্বান' গল্পে মেয়েডা, নোনাডা; 'শাবলতলার মাঠ' গল্পে বছর খানেক; 'দুর্মতি' গল্পে দোলাই খানা, বেতখানা; 'ফকির' গল্পে ধানটা, গোটা কতক, শরীর ডে ইত্যাদি।

## শব্দদ্বৈত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সাধু ও চলিত ভাষার সমান্তরালে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে অসংখ্য দ্বৈত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এই দ্বৈত শব্দ উচ্চারণের সময় শব্দের উপরে এক ধরনের স্ট্রেস বা ঝোঁক আরোপ করা হয় ফলে শব্দের অর্থের তারতম্য না ঘটলেও শব্দের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তবে এগুলোর উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ চোখে পড়ে না। যেমন: 'বিপদ' গল্পে বেশ বেশ, খাই খাই, পথে পথে, দোরে দোরে, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঘিন্ ঘিন্, বড়ো বড়ো, মাঝে মাঝে; 'গল্প নয়' গল্পে তীর্থে তীর্থে, মারে মারে, মোটা মোটা, পিছু পিছু, মনে মনে; 'চাউল' গল্পে চেয়ে চেয়ে,

চেটে চেটে, ছোটো ছোটো; 'নসুমামা ও আমি' গল্পে বছর বছর, হাসি-হাসি, রোজ রোজ, কাঁদো কাঁদো, খেলতে খেলতে, বসে বসে, আগে আগে, গাছে গাছে, ধীরে ধীরে, ফাঁকা ফাঁকা, লুকিয়ে লুকিয়ে, কিছু কিছু, কেমন কেমন, আমতা আমতা; 'নুটি মন্তর' গল্পে লাফাতে লাফাতে, বিড় বিড়, পদে পদে, যেতে যেতে, ছুটতে ছুটতে; 'ফড় খেলা' গল্পে গুনে গুনে, দেখে দেখে, দুরু দুরু, আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু, টানতে টানতে ইত্যাদি।

**ধন্যাত্মক শব্দ**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অভিধানে যুক্ত না হওয়ায় তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন–

> 'বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।' (ঠাকুর, ১৩৯১: ৭৯)।

পরবর্তী সময়ে ধন্যাত্মক শব্দগুলোকে বাংলা অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এপ্রসঙ্গে চিত্রা ভট্টাচার্য বলেন-

> 'বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পে একদিকে রয়েছে প্রকৃতি, গ্রাম, নদী, ক্ষেতের গন্ধমাখা শব্দভান্ডার; অন্যদিকে রয়েছে চরিত্রভাষার স্বাভাবিকতা, আঞ্চলিক টান ও সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ততা। তাঁর ভাষার বুননে ধরা পড়ে বাঙালি জীবনের ঘ্রাণ, ব্যথা, স্মৃতি ও দারিদ্র্যের বাস্তব অনুভব।' (চিত্রা ভট্টাচার্য, ২০০৬: ১২৯)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রচুর ধন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ পাঠকের চিত্রকল্পকে শাণিত করেছে। যেমন : 'নসুমামা ও আমি' গল্পে টিপ্ টিপ্; 'দৈবাৎ' গল্পে ঢিপ ঢিপ; 'বিড়ম্বনা' গল্পে ফিস ফিস; 'আহ্বান' গল্পে ঠুক্ ঠুক্; 'শাবলতলার মাঠ' গল্পে মচ মচ, কিচির কিচির; 'দুর্মতি' গল্পে খিল খিল; 'ফকির' গল্পে ঢিপ ঢিপ; 'নুটি মন্তর' গল্পে দুম দুম, ঝর ঝর, গড় গড়; 'বিরজা হোম ও তার বাধা' গল্পে ঝম ঝম, ছড় ছড়; 'কাশি কবিরাজের গল্প' গল্পে হন হন; 'মায়া' গল্পে খল খল; 'ভৌতিক পালঙ্ক' গল্পে গমগম, খটখট, টনটন; ফিক ফিক; 'ছায়াছবি' গল্পে বকবক; ঢং ঢং; 'রহস্য' গল্পে ছম ছম; 'হারুন অল রসিদের গল্প' গল্পে গট গট; 'এয়ার গান' গল্পে ফট ফট, শন শন, ঝন ঝন; 'ঝড়ের রাতে' গল্পে গপ গপ; 'অনুসন্ধান' গল্পে চটাচট; 'ভূত' গল্পে ঠকঠক, ঝমঝম, খসখস; 'বিপদ' গল্পে কুট কুট; 'আমোদ' গল্পে ঝন ঝনানি; 'সতীশ' গল্পে দম দম; 'অভিনন্দন সভা' গল্পে ঝর ঝর; 'চ্যালারাম' গল্পে পট পট; 'বায়ুরোগ' গল্পে গট গট; 'অন্নপ্রাশন' গল্পে ঝমঝম; 'মণি ডাক্তার'

গল্পে টন টন, ঝুপঝুপ, ছড়ছড়; 'পুরোনো কথা' গল্পে ভুস ভুস; 'বাটিচচ্চড়ি' গল্পে ফস ফস ইত্যাদি।

**আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার**

সাহিত্যের বিবেচনায় আঞ্চলিকতার সঠিক প্রয়োগ সচেতন পাঠকের নিকট নির্দিষ্ট সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। আঞ্চলিক ভাষা, সংলাপ ও শব্দ কৃত্রিমতাবর্জিত। এই অকৃত্রিমতাই আঞ্চলিকতার প্রধান অলংকার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে আঞ্চলিক ভাষা, সংলাপ ও  শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তাঁর ছোটোগল্পে তৎসম শব্দের চেয়ে তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি। তাঁর ছোটোগল্পে তৎসম শব্দের আধিক্য নেই। কারণ তাঁর সিংহভাগ ছোটোগল্পের সংলাপ নির্মাণে তিনি গ্রামীণ স্বল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষাকেই তুলে এনেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতাবর্জিত যা তৎসম শব্দের বৈশিষ্ট্য। এস. রায় বলেন- 'গ্রামীণ উপভাষা বাংলা কথাসাহিত্যে চরিত্রের বাস্তবতা নির্মাণে অপরিহার্য' (এস. রায়, ২০০৫: ১৪৪)। প্রমিত ভাষার প্রভাবের কালে আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপের ব্যবহার বিভূতিভূষ ছোটোগল্পকে অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। তাঁর ছোটোগল্পে তিনি এমন অনেক আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন যা নগরায়ন, বিদেশি ভাষার আগ্রাসী প্রভাব ও চর্চার অভাবে বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। তাঁর ছোটোগল্পে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন: 'বিপদ' গল্পে বয়েস, পৈঠায়, অপোগণ্ড, লঙ্কা, কোচড়, রোয়াক, ছাওয়া, জলচৌকি, তামাকের মালসব, গরজ; 'চাউল' গল্পে ঘুনসি, মাঙি, আরদালি, বিটি ছানা (মেয়ে সন্তান), হপ্তায় (সপ্তায়); 'নসুমামা ও আমি' গল্পে দোজপক্ষ, কঞ্চি, তেলনুন, উনুন, নেমন্তন্ন, ভিয়েন (মিঠাই তৈরি), এস্তেক (খানিক), তাড়ু ঘোঁটে, আখেরে, মুখরা, নিরম্বু, গয়লা, মুখ্যু; 'দৈবাৎ' গল্পে গেঁজে, দোজবর; 'বিড়ম্বনা' গল্পে বিকচোন্মুখ, নিকষ কুলীন, ঘোষাল বামুন, খিড়কি, কৈফিয়ৎ, নটবর, দোর; 'আহ্বান' গল্পে চকোত্তি, বাঁড়ুজ্যে, তেনার, নুন, অদ্ধেক, স্তোক বাক্য, পুটুলি, পাঁচচালা, তেলচিটে, খেঁকি, কোদাল; 'শাবলতলার মাঠ' গল্পে খড়ম, পিরানটি, খটকা, বোঁচকা, কলুচটকা, তিত্তিরাজ; 'দুর্মতি' গল্পে পুঁটুলি, দোলাইখানা, শদাবধি, প্রৌঢ়, ছোবড়া, গরাদ, চৌকি, ছেঁদা, মকড়ি, ভেল্কি; 'ফকির' গল্পে নমাজ, মালসা, মাচা, খোরাকি, দেড়া বাড়ি, বেলঝুপি, নুন, থেতি, পুকুরি, চ্যাংমাছ, পেরকাশ, খাকাঁর, লেহ্য; 'পাঁচু মামার বিয়ে' গল্পে জষ্টি মাস, হিল্লে; 'ঠাকুরদার গল্প' গল্পে দাদন, নেয়ে, সড়কি, ফলার; 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পে চান (স্নান); 'ফড় খেলা' গল্পে অমুক, ট্যাঁকে (পকেটে); 'কাশি কবিরাজের গল্প' গল্পে ভায়া (ভাই), মাছের মুড়ো; 'মায়া' গল্পে নাইতে (গোসল করতে); 'ছায়াছবি' গল্পে হামারা, দড়ি (রশি); 'কবিরাজের বিপদ' গল্পে পুবদিক, দ্যান, চললুম, ঘুমুতে, নেমন্তন্ন; 'রহস্য' গল্পে মুছলাম; 'বাঘের মন্তর' গল্পে সক্কালে, মন্তর,

ঠ্যাঙাও, হাঁড়ি; 'হারুন অল রসিদের গল্প' গল্পে কুঁড়তে, ইস্কুল, বনগাঁও, ঠ্যালা, পান্তা; 'কলহান্তরিতা' গল্পে মাগী, আতিসুয়ো; পিত্তি জলে; 'পথিকের বন্ধু' গল্পে সন্দের, শুয়োর, গাই গোরু, বাথান; 'এয়ার গান' গল্পে জন্তু, ধড়মড়, সিক্কার, বাঁদর; 'ননীবালা' গল্পে সুপুরি, চিঠিপত্তর, আদ্ধেক; 'আমার ডাক্তারী' গল্পে সায় (মত), চাট্টি (৪টি); 'বর্শেলের বিড়ম্বনা' গল্পে তুষ; 'কাদা' গল্পে হাবড়; 'অনুসন্ধান' গল্পে বৈকাল; 'বিপদ' গল্পে পেসাদ (প্রসাদ), খ্যামতা; 'আমোদ' গল্পে রাত্তির, বাপ-পো, ম্যালা, ছেরাবন (শ্রাবণ), ট্যাকা; 'সতীশ' গল্পে হপ্তাহ; 'ডালুর বিপদ' গল্পে মোদের, সন্দেবেলা, উনুন; 'চ্যালারাম' গল্পে পুরুত; 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্পে জষ্টি মাস, বৈকাল; 'বড়বাবুর বাহাদুরি' গল্পে মরশুম; 'অন্নপ্রাসন' গল্পে পসার, বৈকাল, পেরসাদ (প্রসাদ), কুটুম্ব; 'পুরোনো কথা' গল্পে ধামি; 'রাজপথ' গল্পে খদ্দের; 'বিধু মাস্টার' গল্পে কামাই, লাটাই; 'উন্নতি' গল্পে বচসা ইত্যাদি।

### দেশীয় শব্দ ও আঞ্চলিক বাকরীতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পের ভাষা পরিচর্যায় কাহিনির আবহ তৈরিতে দেশীয় শব্দ ও যশোর-খুলনার গ্রামীণ আঞ্চলিক বাকরীতির প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি যে নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সচেতন ও মনযোগী ছিলেন তাঁর ছোটোগল্পে অসংখ্য দেশীয় শব্দ ও আঞ্চলিক বাকরীতির ব্যবহারে প্রতীয়মান হয়। যেমন:

অনাছিষ্টি কাণ্ড (বুড়ো হাজরা কথা কয়, পৃ. ৫৬৭)।
গোয়ালার ছেলে, আশি বৎসরে সাবালক হয়না (ঠাকুরদার গল্প, পৃ. ৪৯১)।
দশ হাত মাটির তলে সেঁধিয়ে যাওয়া (বাক্স বদল, পৃ. ৫১০)।
কত সাধ যায় যে চিতে, মলের আগায় ঘুণ্টি দিতে (রূপো বাঙাল, পৃ. ৭৫)।
ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে (কমপিটিশন, পৃ. ৭৯)।
হাড় এক জায়গায় আর মাংস এক জায়গায় করবো (বেসাতি, পৃ. ১১০)।
ছাইতে না জানি পোড় চিনি (অন্তর্জলি, পৃ. ১২৫)।
গদগদ গোদাবরী! বলিহারি! (বোতাম, পৃ. ১৪৮)
হাড় ভাজা ভাজা (বোতাম, পৃ. ১৪৬)।
ধুকরির ভেতর খাসা মাল (আমার ছাত্র, পৃ. ১৭৪)।
ন দেবায় ন ধর্মায় (আমার ছাত্র, পৃ. ১৭৬)।
কোলে পিঠে করে মানুষ করা (আমার ছাত্র, পৃ. ১৮১)।
হাড় মাংস কালি হয়ে গেল (দাদু, পৃ. ২১৯)।
পুরুষ পুরুষের শত্রু/ নারী নারীর শত্রু (ডাইনী, পৃ. ২১৯)।
লঙ্কাপোড়া ব্যাপক ক্ষুরে নমস্কার (কিন্নর দল, পৃ. ২২৩)।
অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি (নসুমামা ও আমি, পৃ. ২৭৪)।
আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে (উপেক্ষিতা, পৃ. ০৯)।

চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি? (উমারাণী, পৃ. ৩২)
আমার বাঁ চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা (উমারাণী, পৃ. ৩৮৮)।
সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে [...] (উমারাণী, পৃ. ৪১)।
খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত উঠিয়ে মারে (রাক্ষস-গণ, পৃ. ৬৯)।
চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে লাভ নাই (একটি ভ্রমণ কাহিনী, পৃ. ৪৯৬)।
ভূতের মতো খাটুনি (অনুসন্ধান, পৃ. ৩৩৯)।
কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো (প্রত্যাবর্তন, পৃ. ৫৭১)।
গরিবের কথা বাসী হলে ফলে (প্রত্যাবর্তন, পৃ. ৫৭৩)।

**প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা**

প্রবাদ হলো সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাস। প্রবাদের অবয়ব সংক্ষিপ্ত হলেও এর অর্থ গভীর ও তাৎপর্যময়। প্রবাদের সহজ-সরল অভিব্যক্তির ফলে সাহিত্যে এর প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ। প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা লোকমুখে প্রচলিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের কাছেই বোধগম্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার ব্যবহার তাঁর গভীর সংস্কৃতি-মনস্কতারই পরিচায়ক। ছোটোগল্পে এর ব্যবহার ঘটনা ও চরিত্রকে নির্দিষ্টতা ও তির্যকগতি দান করার পাশাপাশি অল্পকথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে ছোটোগল্পের কাহিনিকে অভীষ্ট পরিণতি দানে সহায়তা করে। তাঁর ছোটোগল্পের ভাষা বিশ্লেষণে প্রাপ্ত প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো:

'অভয়ের অনিদ্রা' গল্পে কলের পুতুল, বালাই ষাট, মাথায় হাত দিয়ে বসা, জলের মতো খরচ, তাসের ঘর, হাঁড়ি ফাটানো, স্বর্গ হাতে পাওয়া, আকাশ পাতাল, হাতটান, ভাগ্যবানের বউ মরে অভাগার ঘোড়া মরে। 'পুঁইমাচা' গল্পে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা, চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, পাথুরে বোকা, পায়ের ধুলো পড়া, আকাশ থেকে পড়া, পরের জিনিসে হাত। 'একটি কোঠাবাড়ির ইতিহাস' গল্পে দুধের সোয়াদ কি ঘোলে মেটে, সব মুঠোর মধ্যে পুরে বসে থাকা, আন্দাজে মারা। 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' গল্পে আকাশ কুসুম, এক ঢিলে দুই পাখি মারা, মনকে চোখ ঠারা। 'ঠাকুরদার গল্প' গল্পে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, কাঠের পুতুল। 'অরণ্যকাব্য' গল্পে বানরের গলায় মুক্তোর মালা, কোমর বাঁধুন, মাথা কুটে মরা, পায়ের ধুলো দিন। 'কমপিটিশন' গল্পে ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে, টাকা হলে মাটি করো। 'অন্তর্জলি' গল্পে নাভিশ্বাস উঠেছে, বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, মেঘ না চাইতে জল, ধর্মে মতি হোক। 'বোতাম' গল্পে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, একেবারে বয়ে যাওয়া, মাথায় হাত বোলানো। 'অনুসন্ধান' গল্পে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, ভূতের ব্যাগার, চক্ষুশূল। 'মরফোলজি' গল্পে বামন

হয়ে চাঁদে হাত, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, ডুবে ডুবে জল খাওয়া। 'মণি ডাক্তার' গল্পে চুলে টিকি দেখা যায় না, নিজের মান নিজের কাছে। 'পুরোনো কথা' গল্পে মুখের লাগাম আলগা করে দিয়েছ, এক কড়ার মুরোদ নেই । 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা, ভিটেয় ঘুঘু চরানো, দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা, হাতে স্বর্গ পাওয়া, কুলোপনা চক্কর। 'পাঁচু মামার বিয়ে' গল্পে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা, নষ্টের গোড়া, টাকা ডোবানো। 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' গল্পে ঠক বাছতে গাঁ উজোড়, সাবধানের মার নেই, রাখে আল্লাহ মারে কে? ইত্যাদি।

**অপভাষার প্রয়োগ**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিংহভাগ ছোটোগল্প গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। গ্রামীণ প্রতিবেশের অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট গ্রামীণ তথা আঞ্চলিক ভাষারীতির ব্যবহার তাঁর ছোটোগল্পের বাস্তবানুগ প্রকৃতিকে মূর্ত করে তুলেছে। গ্রামীণ পটভূমিতে যশোর-খুলনা অঞ্চলের ভাষা উঠে এসেছে তাঁর শব্দ চয়ন ও সংলাপ নির্মাণে। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে দ্রব ঠাকরুনের ভাষায় যশোর অঞ্চলের ভাষার প্রক্ষেপণ লক্ষণীয়–'হ্যাঁ যা–তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে–তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে?' (দ্রবময়ীর কাশীবাস, ১৪১৯: ৫৭৮)। তাঁর ছোটোগল্পে অপভাষার প্রয়োগ কম থাকলেও তা মূলত ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রের দ্রোহের প্রতিশব্দ হিসেবে। 'বায়ুরোগ' গল্পে পাজি, রাস্কেল; 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' গল্পে জানোয়ার, বাঁদর; 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে সুমুন্দি, ফেরেববাজ, জুয়াচোর; 'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব' গল্পে হারামজাদা, বদমায়েশ; 'গিরিবালা' গল্পে বেশ্যা; 'সংসার' গল্পে হারামজাদী, বদমাইশ ইত্যাদি। তাঁর গল্পে অপভাষার সংলাপও পাওয়া যায়:

> যাবি হারামজাদী তো একলা মর গে যা– খোকা তোর না আমার? (সংসার, ১৯৬ পৃ.)
> ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল? (বেণীগীর ফুলবাড়ি, ৬৩১ পৃ.)
> মাগী একটা ফ্যাচাং দিয়েছে দেখো না! (প্রত্যাবর্তন, ৬৭১ পৃ.)
> তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি? (দ্রবময়ীর কাশীবাস, ৫৭৯ পৃ.)
> মাগীটা পাগল নাকি? (ঐ, ৫৮৩ পৃ.)

তাঁর ছোটোগল্পের পাত্র-পাত্রী শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত হলেও ঔপনিবেশিক শাসনবৃত্তে ইংরেজি ভাষাপ্রীতির আধিক্য ছিল। 'পোশাকে বাঙালি মননে ইংরেজ' জনসাধারণ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা প্রয়োগ করেছে। এর পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে কিছু সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়।

### ইংরেজি শব্দ

প্রমিস্, ইনস্পিরেশন, নভেল, বুকপোস্ট, হ্যান্ডবিল, ইন্‌স্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি, মিটিং, ইনচার্জ, ডিপার্টমেন্ট, ওভারটাইম, ডিসপেনসারি, স্টোভ, পিন, প্ল্যান, টাইমটেবল, ক্যালেন্ডার, ট্রাভেল, লাইট, ট্যাক্স, কোয়ার্টার। টিউশনি, কমিশন, কম্পাইল্ড, ওভারব্রিজ, ডিসট্যান্ট, সিগন্যাল, ট্রান্সলেশন, টেলিগ্রাম, স্টার্ট, লেক প্লেস, সেলুন, সিটি কলেজ, কমিউনিস্ট, রেজিস্ট্রি, এটর্নি, সার্চ, স্ট্রোক, কনট্রাকটার, ট্রাঙ্ককল, মর্টগেজ, স্ট্রীট, ইনস্টলেশন, বাথরুম, কমিশন, টিফিন, টেনিস কোর্ট, কোয়ার্টারস, টেলিফোন ইত্যাদি।

### সংস্কৃত শব্দ

ছোটোগল্পে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ হলো– দম্ভোলি, বৃত্তাসুর, ধৃষ্টতা, শিরচ্ছিন্ন, কাকস্য পরিবেদনা, হরি সংকীর্তন, অমৃতের পুত্র, উপবিষ্ট, শবানুগমন, দাহকার্য, জ্বরদীপ্ত ইত্যাদি। মিশ্র শব্দ হলো–মাল খরিদ, ব্লটিং কাগজ, গর-পছন্দ, ক্লাবঘর প্রভৃতি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা প্রমাণে হিন্দি ভাষার সংলাপ ব্যবহার করেছেন। ফলে কাহিনি বাস্তবানুগ রূপ লাভ করেছে।

> বাবু কৌন জামানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা? (শান্তিরাম, ৬৬৮ পৃ.)
> ক্যা করে বাবুজি, হাম লোক তো মুসলমীন হ্যায়, বাঙালী হিন্দুকে লাশ কৌন্ লে যায়েগা (অরণ্যকাব্য, ৫২ পৃ.)।
> থোড়া জল পিনে মাংতা (জাল, ২৬৫ পৃ.)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভাষার ব্যবহার হয়েছে কাহিনি ও সংলাপের প্রয়োজনে, সেখানে ভাষাকে কখনোই আরোপিত মনে হয় না। সাবলীল ভাষাপ্রয়োগ ও শব্দচয়ন তাঁর ভাষাবৈশিষ্ট্যে নবতর মাত্রা যোগ করেছে।

### পর্যালোচনা

সাহিত্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গেলে কেবল শব্দ বা বাক্যগঠন বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়; বরং ভাষার অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য, শৈলীর প্রক্ষেপণ এবং সাহিত্যিক রসদর্শনকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। একটি ভাষার নান্দনিক শক্তি, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলে এর ভেতরে নিহিত নানা উপাদান যেমন: প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, উপসর্গ-অনুসর্গ, অপশব্দ, আঞ্চলিক বাকরীতি, শব্দদ্বৈত, ধন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদি। সাহিত্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে ধ্বনিতত্ত্বের নানা দিকও গুরুত্ব পায়। যেমন: স্বরসঙ্গতি, আনুনাসিক ধ্বনি, স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ, মহাপ্রাণহীনতা, সমীভবন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ইত্যাদি। এগুলো ভাষার উচ্চারণ, ছন্দ, সুর, রূপ ও আঞ্চলিক স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে, ফলে আলোচনা

হয় অধিকতর বৈজ্ঞানিক, প্রমাণভিত্তিক এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত। নিচে প্রতিটি উপাদান কীভাবে বর্তমান প্রবন্ধের ভাষাবৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

প্রবাদ-প্রবচন হলো সাধারণ মানুষের জীবনানুভব থেকে গড়ে ওঠা সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবাহী বাণী। কোনো চরিত্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানসিকতা বিশ্লেষণে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে ভাষা হয় জীবন্ত ও প্রমাণভিত্তিক। এগুলো জনগণের লোকজ অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাকে প্রতিফলিত করে, যা সাহিত্যের বক্তব্যকে শক্তিশালী করে। উদাহরণ: 'তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা' বা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' ইত্যাদি ব্যক্তির অভ্যাস বা চরিত্র বিশ্লেষণে এ ধরনের প্রবচন একটি বিশেষ মানসিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে।

বাগধারা হলো রূপকধর্মী ভাষা-প্রকাশ, যা সরল অর্থ ছাড়িয়ে অন্তর্নিহিত অর্থ বহন করে। সাহিত্যে বাগধারা ব্যবহার করলে ভাষা হয় চিত্রময় ও রসসিক্ত। কোনো চরিত্র বা পরিস্থিতির বর্ণনায় বাস্তবতা ও ব্যঞ্জনা একসাথে ফুটে ওঠে। উদাহরণ: 'হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়' বাগধারাটি সমাজের বৈষম্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

উপসর্গ-অনুসর্গ একটি ভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করার অন্যতম উপায়। এগুলো নতুন শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে ভাষার বৈচিত্র্য বাড়ায়। উপসর্গ ও অনুসর্গ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোন অঞ্চলের ভাষা কতটা রূপান্তরমুখী ও শব্দসৃষ্টিশীল। সাহিত্যের শব্দতত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ: উপসর্গ: অতি+উৎসাহী, মহা+আনন্দ, অনুসর্গ: গান+ওলা, কাজ+ওয়ালা ইত্যাদি।

অপশব্দ সাধারণত অশ্রাব্য বা অশালীন হিসেবে গণ্য হলেও এগুলো বাস্তব জীবনের কণ্ঠস্বর বহন করে। অপশব্দ ব্যবহারে সাহিত্যের বাস্তবতা, সমাজ-সংঘাত ও চরিত্রের মানসিক অবস্থা স্পষ্ট হয়। ভাষাবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অপশব্দ মানুষের অন্তর্জগৎ ও নিম্নবর্গের কথনরীতির প্রকাশ ঘটায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে শ্রমজীবী বা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মুখে অপশব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন। তাই সংলাপে তা বাস্তবানুগ ও প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে।

ভিন্ন অঞ্চলের ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত বা বাক্যগত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় আঞ্চলিক বাকরীতি। সাহিত্যে আঞ্চলিক বাকরীতি দেখায় কীভাবে ভাষা ভৌগোলিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে পরিবর্তিত হয়। এতে সাহিত্যে একটি লোকজ বৈচিত্র্য ও আঞ্চলিক বাস্তবতার স্বর আসে। আঞ্চলিক শব্দ হলো নির্দিষ্ট এলাকার লোকজ চিহ্নিত শব্দভান্ডার। এগুলো ব্যবহার করলে সাহিত্য বা বক্তব্যে ভৌগোলিক স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। চরিত্র বা পরিবেশ বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে ভাষা কেবল লিখিত রূপে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি লোকায়ত বহুমাত্রিকতা ধারণ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্ররা আঞ্চলিকভাবে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। তাই যশোরের আঞ্চলিক ভাষার শব্দের প্রয়োগ

লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপঃ ছেরাবন, চান, আদ্ধেক, পুকুরি, নাইতে, ট্যাঁকে ইত্যাদি মানক বা প্রমিত বাংলায় যথাক্রমে শ্রাবণ, স্নান, অর্ধেক, পুকুরে, গোসল করতে, পকেটে বোঝায়।

শব্দদ্বৈত হলো দুটি সমার্থক বা কাছাকাছি অর্থবাহী শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করে জোর দেওয়া। শব্দদ্বৈত ব্যবহারে বক্তব্য হয় শক্তিশালী, ছন্দময় ও প্রভাবসঞ্চারী; সাহিত্যে যুক্তি বা আবেগের তীব্রতা প্রকাশে কার্যকর। উদাহরণঃ ধন-সম্পদ, জল-দুধ, ভয়-ডর, দেখে দেখে, বিড় বিড়, ধীরে ধীরে ইত্যাদি।

ধন্যাত্মক শব্দ মূলত শব্দের অনুকারধর্মী ধ্বনি বা Sound symbolism। এগুলো কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য বা অনুভূতির চিত্র তৈরি করে। ভাষাকে করে আবেগময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এপ্রসঙ্গে পি. সিনহা বলেন- 'তাঁর গদ্য Musical prose যেখানে শব্দের সুর অর্থকে গভীর করে' (সিনহা, ১৯৯৭: ২৪৪)। কোনো ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতির ধ্বনিগত প্রতিফলন তুলে ধরে। উদাহরণঃ ঝম ঝম, খচ খচ, টপ টপ, খসখস, দুম দুম ইত্যাদি।

একাধিক স্বর একত্র হলে তাদের উচ্চারণে সুরেলা ধ্বনি তৈরি হয়, যাকে স্বরসঙ্গতি বলে। সাহিত্যকর্মে ছন্দময়তা ও মাধুর্য আনে। শব্দের ভঙ্গি মোলায়েম করে পাঠককে শ্রুতিমধুর অনুভূতি দেয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের গদ্যকে সংগীতধর্মী বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। যেমনঃ ভাষার শব্দে 'আ-এ' ধ্বনির সঙ্গতি। জিজ্ঞাসা শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে হচ্ছে জিগ্যেস, জ্ঞান শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে হচ্ছে গেয়ান ইত্যাদি।

উচ্চারণকালে যখন বাতাস নাক ও মুখ দিয়ে একসাথে প্রবাহিত হয়, তখন যে ধ্বনি তৈরি হয় তাকে আনুনাসিক ধ্বনি বলে (ঙ, ঞ, ন, ম)। শব্দকে করে প্রাণবন্ত ও গাম্ভীর্যময়। আঞ্চলিকতা ও লোকভাষার ছাপ প্রকাশ করে। উদাহরণঃ মঙ্গল, আনন্দ, গঙ্গা, জীবন এখানে আনুনাসিক ধ্বনি শব্দের ধ্বনিগত সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। আনুনাসিক ধ্বনির ব্যবহার আঞ্চলিক উচ্চারণভিত্তিক পার্থক্য নিরূপণে সহায়ক হয়।

নতুন কোনো স্বর ধ্বনি সংযোজন হয়ে শব্দ তৈরি হলে তাকে স্বরাগম বলে। শব্দকে উচ্চারণে সহজ করে। আঞ্চলিক ভাষায় স্বরাগম অনেক সময় বিশেষ বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। উদাহরণঃ স্কুল → ইস্কুল, স্পর্ধা → আস্পদ্দা, স্টিমার → ইস্টিমার, কদম → কদম্ব ইত্যাদি। এটি দেখায় কীভাবে সাধারণ মানুষের কথ্য রূপ শব্দের পরিবর্তন ঘটায়।

বিপ্রকর্ষ কথ্যভাষায় সংক্ষিপ্ততা আনে। লোকজ স্বরভঙ্গি ও সহজীকরণের প্রবণতা প্রকাশ করে। বিপ্রকর্ষের মাধ্যমে বোঝা যায় কীভাবে ভাষা সময়ের সাথে সাথে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণঃ কৃপা → কিরপা, মাত্র → মাত্তর, প্রাণ → পেরান ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি (যেমন খ, ঘ, ছ, ঠ, ধ, থ, ফ, ঝ) কথ্যভাষায় অমহাপ্রাণ রূপে ব্যবহৃত হওয়া। ভাষাকে সহজ ও গতিময় করে। আঞ্চলিক উচ্চারণের বিশেষ পরিচায়ক।

মহাপ্রাণহীনতা আঞ্চলিকতার গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহুরে উচ্চারণের পার্থক্য নির্দেশে বিশেষ কার্যকর। যেমন: হারিয়েছে ⟶ হারিয়েচে, এসেছে ⟶ এসেচে, খাটছে ⟶ খাটচে, রাধছে ⟶ রাঁধচে ইত্যাদি।

দুটি ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করলে একে অপরকে প্রভাবিত করে উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটানোকে সমীভবন বলে। শব্দ উচ্চারণে সহজতা ও স্বাভাবিকতা আনে। আঞ্চলিক বা লোকভাষায় এটি বহুল প্রচলিত। সমীভবন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তর ও প্রবহমানতা বোঝায়। যেমন: রৌদ্র ⟶ রোদ্দুর, প্রায়শ্চিত্ত ⟶ প্রাচিত্তির, ভদ্র ⟶ ভদ্দর, নিমন্ত্রণ ⟶ নেমতন্ন, অশ্রদ্ধা ⟶ অছেদ্দা ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে তাকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। শব্দকে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা প্রদান করে। বাংলা ভাষার শব্দবিন্যাস ও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি ভাষার শব্দগঠন প্রক্রিয়া ও ধ্বনিগত পরিশীলন বুঝতে সাহায্য করে। যেমন: অনাবৃষ্টি ⟶ অনাবিষ্টি, বৃত্তি ⟶ বিত্তি, তৃষ্ণা ⟶ তেষ্টা, অদৃষ্ট ⟶ অদেষ্ট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় কোনো বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে স্থান, কাল, ব্যক্তি বা বস্তুর সম্পর্ক নির্দেশ করে যেসব রূপ প্রকাশিত হয়, তাকে পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়। যেমন: বাড়ি-তে, ঘর-টা, বই-টি, আমার-ই, এখন-ও ইত্যাদি। এগুলো বিশেষ কোনো পদে নির্ভর করে অর্থ গঠন করে বলে এদের বলা হয় পদাশ্রিত নির্দেশক।

সংক্ষেপে পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রকারভেদ

কারক-নির্দেশক ⟶ যেমন: -কে, -কে দিয়ে, -তে, -র।

নির্দিষ্টকরণ নির্দেশক ⟶ যেমন: -টা, -টি, -গুলো, -খানি।

অধিকারবাচক নির্দেশক ⟶ যেমন: আমার-ই, তোমার-ই।

কালের নির্দেশক ⟶ যেমন: তখন-ই, এখন-ও।

স্থানের নির্দেশক ⟶ যেমন: এখানে-ই, ওখানে-ও।

সাহিত্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পদাশ্রিত নির্দেশক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা শব্দের অর্থের স্পষ্টতা আনে। কোনো বাক্যে কোন বিশেষ্য বা ক্রিয়া কার সাথে সম্পর্কিত, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যেমন: ছাত্ররা বই-টা পড়ল ⟶ এখানে 'বই-টা' নির্দেশ করছে নির্দিষ্ট একটিমাত্র বইকে।

*নির্দিষ্টকরণ ঘটায়:* সাহিত্যে যুক্তি প্রদর্শনের সময় অস্পষ্টতা কমিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়কে চিহ্নিত করে। যেমন: গ্রামীণ সমাজের সমস্যাগুলো ⟶ 'গুলো' নির্দেশকটি বহুবচন নির্দিষ্টকরণ করেছে।

*ভাষার স্বকীয়তা প্রকাশ করে:* বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই নির্দেশক সমূহের বহুল ব্যবহার, যা অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলাকে আলাদা পরিচিতি দেয়। গবেষণায় এগুলো তুলে ধরলে ভাষার আঞ্চলিকতা ও স্বরূপ ফুটে ওঠে।

*ছন্দ ও গতি সৃষ্টি করে:* পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হলে বাক্যে প্রাকৃতিক ছন্দ তৈরি হয়, যা গদ্যকে প্রাঞ্জল ও পাঠযোগ্য করে তোলে। যেমন: নদী-টা, বই-খানি, মানুষ-গুলো (জাল, ২৬৫ পৃ.) এসবের উচ্চারণে স্বতঃসিদ্ধ ছন্দ আছে।

*আঞ্চলিক বৈচিত্র্য প্রকাশ করে:* বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পদাশ্রিত নির্দেশকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহার হয়। যেমন: বই-ডা (পূর্ববঙ্গ), বই-টা (পশ্চিমবঙ্গ)। সাহিত্য গবেষণায় এটি আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

*সংহতি ও যুক্তি প্রকাশ করে:* একটি প্রবন্ধে ভাবের সংহতি আনতে নির্দেশকের ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। যেমন: এই সমস্যাটিই প্রধান, ওখানেই সংকট, এখনো সমাধান হয়নি। এখানে পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্তির ধারা বজায় রাখছে।

*লোকভাষার রূপ ফুটিয়ে তোলে:* সাহিত্যে চরিত্রের সংলাপ বিশ্লেষণে পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহারের ধরণ থেকে লোকজ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলোতে আঞ্চলিক নির্দেশক ব্যবহারে ঘটনা ও চরিত্রের স্বরূপ উজ্জ্বল হয়েছে। যেমন: চারিটি, চেহারা খানি, মেয়েডা, নোনাডা (দ্রবময়ীর কাশীবাস, ৫৭৯ পৃ.), গোটা কতক, শরীর ডে (ঠাকুরদার গল্প, পৃ. ৪৯১) ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ: 'ছাত্র-রা ক্লাস-এ গেল। শিক্ষক-ই পড়ালেন। বই-গুলো তারা পড়ল না।'

এখানে: 'রা' ⟶ বহুবচন নির্দেশক

'এ' ⟶ স্থানের নির্দেশক

'ই' ⟶ বিশেষ জোর দেওয়া

'গুলো' ⟶ বহুবচন নির্দিষ্টকরণ

ফলে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পভাষার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রকৃতি নির্ভরতা। প্রকৃতি তাঁর কাছে শুধুমাত্র বর্ণনার অবলম্বন নয়, বরং চরিত্রের মতোই জীবন্ত উপস্থিতি। নদী, মাঠ, আকাশ, বন, পাখি, হাওড় এসব উপাদান যে ভাষার মাধ্যমে ছবির মতো ফুটে ওঠে, তা পাঠককে এক বিশেষ অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়, তাঁর ভাষাকে কাব্যময় করে তোলে। প্রকৃতি-সংলগ্ন শব্দের সূক্ষ্ম নির্বাচন তাঁর ভাষায় একটি ভিজ্যুয়াল এবং অ্যাকুস্টিক ইমেজারি তৈরি করে যা বাংলা ছোটোগল্পের বিবৃতিগত ধারায় একটি

অভাবনীয় সংযোজন। ফলে তাঁর গল্প পড়তে গেলে পাঠক কেবল ঘটনা দেখেন না, বরং গন্ধ, শব্দ, বাতাস, আলো সবকিছু মিলিয়ে এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা অনুভব করেন।

দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক উপভাষার স্বকীয় ব্যবহার বিভূতিভূষণের ভাষাবৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্র্য করে তুলেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, গ্রামীণ গল্পে শহুরে প্রমিত ভাষার সংলাপ ব্যবহার করলে তা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তাই তিনি চরিত্রের শ্রেণি, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত অবস্থান অনুযায়ী ভাষার স্বরভঙ্গি নির্মাণ করেছেন। কৃষক, মজুর, জেলেসহ সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন কথা বলে, বউ-ঝির ভাষায় যে টান থাকে সবই তাঁর সংলাপগুলোতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এপ্রসঙ্গে রণজিৎ মজুমদার বলেন– 'চরিত্রের ভাষাই গল্পের প্রাণ। বিভূতিভূষণ চরিত্রের বয়স, শ্রেণি, শিক্ষা, পেশা ও আবেগ অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তন ঘটান। ভাষার এই সমাজতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য বিভূতিভূষণের গল্পে জীবনের স্পন্দন এনে দেয়' (মজুমদার, ২০০৭: ২৩৩)। তাঁর ভাষাশৈলীতে আঞ্চলিকতা কখনোই আঁধার বা অপরিচ্ছন্নতার প্রতীক নয়; বরং গ্রামীণ জীবনের রূপ-রস-গন্ধ ও নির্যাস নিয়ে আবির্ভূত হয়।

তৃতীয়ত, বিভূতিভূষণের চরিত্রভাষার স্বাভাবিকতা ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। চরিত্রদের ভাষা কখনোই একঘেয়ে একমুখী হতে পারে না। জন্ম, পরিবার, শিক্ষা, পেশা, স্থান, মানসিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বোধ এসব প্রতিটি উপাদান তাঁর চরিত্রভাষার নকশা নির্মাণে ভূমিকা রাখে। শিশু চরিত্রের ভাষা সরল ও নিষ্পাপ, দরিদ্র মানুষের ভাষায় থাকে বাস্তবতা ও কষ্টের সুর, আর প্রাজ্ঞ চরিত্রের ভাষায় দেখা যায় সংযম ও অভিজ্ঞতার ছাপ। এভাবে চরিত্রভাষার বহুমাত্রিকতা গল্পকে করে তোলে প্রাণবন্ত, স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

চতুর্থত, তাঁর গল্পে সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ততা এমন যে পাঠক অনুভব করেন তিনি যেন চরিত্রের কথোপকথন সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন। সংলাপ তাঁর গল্প বলার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। ভাষার সাধারণতা, কথ্যরীতি, ব্যাকরণগত চলতি রূপ এসব ব্যবহার করে তিনি সংলাপকে স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছেন। সংলাপ তাঁর গল্পে কেবল তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়; বরং চরিত্রের মানসিক অবস্থার সাক্ষ্য, সম্পর্কের প্রকৃতি, প্রতিবেশের পারিপার্শ্ব এবং আবেগের টানাপোড়েন বহন করে।

পঞ্চমত, বিভূতিভূষণের গল্পভাষার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ন্যারেটিভ টোন ও গতি। তাঁর গদ্য ধীর, শান্ত, স্থির যেন প্রকৃতির মতোই মৃদুভাবে প্রবাহিত। এ প্রসঙ্গে এস. মুখার্জী বিভূতিভূষণের ন্যারেটিভকে 'Slow-paced contemplative narrative' বলেন (মুখার্জী, ২০১২: ১৭২)। তিনি ঘটনা নয়, মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎ, স্মৃতি, অনুভূতি ও উপলব্ধিকে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে বেশি আগ্রহী ও পটু। এ কারণে তাঁর বর্ণনা কখনোই কোলাহলপূর্ণ নয়; বরং নিঃশব্দ স্নিগ্ধতা, গভীর মানবিকতা

ও বিবিধ জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটায়। এই ন্যারেটিভ পদ্ধতি পাঠকের মনে গল্পের সাথে একাত্ম হতে সহযোগিতাই করে না, ব্যঞ্জনা অনুভব করতেও বাধ্য করে।

ষষ্ঠত, বিভূতিভূষণের ভাষা গদ্যের মধ্যে ধ্বনিচিত্র বা সাউন্ড-ইমেজারি তৈরি করে যা তাঁর সাহিত্যকে কাব্যিক করে তোলে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, নদীর জলের টলমল শব্দ, পাখির ডাকে শীতের রাতের কুয়াশামাখা ভোর, বাতাসের শো শো এসব ধ্বনির শব্দচিত্র পাঠককে শব্দ-শ্রবণের অনুভূতি দেয়। কবিত্বমণ্ডিত কিন্তু গদ্যনিষ্ঠ এই ভাষাশৈলী বাংলা ছোটোগল্পে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।

সপ্তমত, তাঁর গল্পভাষায় মানবিকতা ও দার্শনিকতার বোধ সূক্ষ্মভাবে মিশে থাকে। তিনি ভাষাকে কখনোই জটিল বা দুর্বোধ্য করেন না; বরং সাধারণ শব্দেই মানুষের যাপিত জীবনের গভীরতম অনুভব প্রকাশ করেন। সরলতা তাঁর ভাষার সৌন্দর্য, কিন্তু এই সরলতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সূক্ষ্ম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবেদের গভীরতা।

পরিশেষে একথা অনস্বীকার্য যে, বিভূতিভূষণের গল্পভাষা বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র নান্দনিক উত্তরাধিকার। এটি শুধু নিখাদ সাহিত্যকর্মই নয়; বরং এটি সমাজজীবনের ভাষিক দলিল, প্রকৃতি, মানুষ ও পরিবেশের সহাবস্থানের স্মারক, এবং ভাষার সৃজনশীল বহুমাত্রিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই ভাষা পাঠকের অন্তর্গত চেতনাকে ছুঁয়ে যায়, কারণ এতে রয়েছে বাঙালি জীবনের সুগভীর সত্য, গ্রামীণ মাটির গন্ধ, প্রকৃতির বিস্ময়, মানুষের যন্ত্রণার ভার ও ভাবসৌন্দর্যের অগাধ বিস্তার। তাঁর গল্পভাষা বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাই বিভূতিভূষণের গল্প শুধু গল্প নয়; এক ভাষানির্ভর জীবন্ত অভিজ্ঞতার বয়ানশিল্প।

## উপসংহার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প বাংলা সাহিত্যের ভাষা-বৈচিত্র্য, প্রকৃতি-সংলগ্নতা, মানবিক সত্য ও সমাজবাস্তবতার এক অনন্য দলিল। তাঁর গল্পভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ, গ্রামীণ জীবনের আঞ্চলিক টান, লোকজ শব্দভাণ্ডারের সৌরভ, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা এবং মানবিক আবেগের সূক্ষ্ম ছায়াপাতের সমন্বয়ে তিনি এমন এক ভাষা নির্মাণ করেছেন যা বাংলা ছোটোগল্পের নন্দনতত্ত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এই গবেষণামূলক আলোচনায় ভাষাবৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা-অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছভাবে প্রতীয়মান হয় যে বিভূতিভূষণের গল্প কেবল বিষয়বস্তুর জন্য অনন্য নয়; ভাষার স্বকীয়তা ও শৈল্পিক সিদ্ধির জন্যও এক অনুপম দৃষ্টান্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে শিল্পরীতির পরিচর্যায় সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা নেই কিন্তু বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিচিত্রণে তাঁর অভিনিবেশ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর মুন্সীয়ানা মূলত চরিত্রচিত্রণ ও বিষয়ের বৈচিত্র্য নির্মাণে। ভাষা, সংলাপ, শব্দ ও

নানাবিধ অলঙ্কারের সুষম সমন্বয় তাঁর ছোটোগল্পের বিষয়কেই বিশেষায়িত করেছে। তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের ভাবালুতা ও আবেগের আতিশয্যে দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা কখনো কখনো পাঠকের মনে একঘেয়েমির সৃষ্টি করেছে, যা তাঁর লেখকসত্তার সীমাবদ্ধতা। তাঁর ছোটোগল্পের ভাষার বিশ্লেষণে নানা উপাদানের সুষম সংমিশ্রণ গল্পভাষাকে জীবন্ত, সমৃদ্ধ ও প্রাঞ্জল করে তুলেছে। ভাষার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে জনগণের সংস্কৃতি, লোকজ অভিজ্ঞতা, সামাজিক বাস্তবতার প্রামাণ্যতা ও নান্দনিক স্বকীয়তা। তাঁর শিল্পনির্মাণের পরিমিতিবোধ, সৃষ্ট চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন বিকাশ, বিষয়ের গভীরতর ব্যঞ্জনাধর্মীতার সঙ্গে স্বীয় ব্যক্তিত্ব, জীবনের দার্শনিক বোধ, সমকালীন সমাজবাস্তবতার অভিজ্ঞানের সমসত্ত্ব মিশ্রণ তাঁকে আধুনিক জীবনবাদী ও মহৎ শিল্পীতে পরিণত করেছে।

## তথ্য-নির্দেশ


কুমার দাস, গৌতম। (২০০৬)। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাসঃ গ্রামীণ জীবন ও জনপদের ভাষা। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

চক্রবর্তী, নারায়ণ। (২০১০)। বিভূতিভূষণের ভাষা ও বর্ণনারীতি। সাহিত্য প্রকাশঃ কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৯১)। বাংলা শব্দতত্ত্ব। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগঃ কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। (১৪১৮)। বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (২য় খণ্ড)। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলিকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। (১৪১৯)। বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (১ম খণ্ড)। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্পা.)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, চিত্রা। (২০০৬)। বিভূতিভূষণের সাহিত্য মূল্যায়ন। সাহিত্যলোকঃ কলকাতা।

মজুমদার, রণজিৎ। (২০০৭)। বাংলা ছোটগল্পে চরিত্রভাষা। সাহিত্য সংসদঃ কলকাতা।

মনজুর মোরশেদ, আবুল কালাম। (১৯৯৫)। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

মাসুদ, মুস্তফা। (১৯৯৪)। যশোরের লোকসাহিত্য। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

Collins, A. S. (1965). English Literature of the Twentieth Century. University tutorial press: London.

Mukherjee, S. (2012). Narrative discourse in Bengali fiction. Routledge: London.

Ray, S. (2005). Lexical patterns in Bengali rural narratives. Eastern Book House: New Delhi.

Sinha, P. (1997). Style in Bengali fiction. Sahitya Akademi: Kolkata.

# ভাষায় নারী-পুরুষঃ পুরুষতন্ত্র, আধিপত্য ও ক্ষমতা

মোহাম্মদ মাসুদ রানা*

**Abstract:** This article presents a critical analysis of the patriarchal structures, power relations, and cultural representations of women embedded in language. Rather than viewing language as a neutral medium of communication, it is conceptualized here as a mechanism through which the dominant social groups project their values, ideologies, and systems of power. Drawing upon Michel Foucault's theory of discourse, Judith Butler's notion of performative gender identity, and Pierre Bourdieu's theory of symbolic power, the paper explores how representations of women are constructed and institutionalized through language. In the Bengali linguistic context, through vocabulary, proverbs, literary metaphors, and media portrayals, a persistent pattern emerges wherein women are positioned as the 'other,' the 'inferior,' or objects of habitual consumption. Furthermore, the paper critically examines how educational texts, everyday speech, and mainstream literature reproduce women's identities as domesticated and self-sacrificial. It argues for the incorporation of gender-sensitive perspectives in education, media, and literary practice, proposing structural reforms that may contribute to the development of a more equitable sociocultural reality.

**মূলশব্দ (Keyword):** ভাষা ও লিঙ্গ (Language and Gender), পুরুষতন্ত্র (Patriarchy), প্রতীকি ক্ষমতা (Szmbolic Power), নারী প্রতিনিধিত্ব (Female Representation), ভাষাগত বৈষম্য (Linguistic Inequality), নারীবাদী ভাষাতত্ত্ব (Feminist Linguistics), গণমাধ্যম ও ভাষা (Media and Language), বাংলা সাহিত্য (Bengali Literature), ডিসকোর্স বিশ্লেষণ (Discourse Analysis), লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা (Gender Sensitivity).

* মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইলঃ masud@juniv.edu

## ভূমিকা

ভাষা মানব সভ্যতার অন্যতম মৌলিক বাহন। মানুষ ভাষার মাধ্যমে চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করে। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং সমাজের মানসিক গঠন, সংস্কৃতি ও ক্ষমতার গতিশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করে। ভাষা নিরপেক্ষ নয় (Foucault, 1972); এটি সমাজের বিদ্যমান শক্তি কাঠামোর প্রতিফলন করে এবং কখনো কখনো সেই কাঠামোকে আরও দৃঢ় করে। বিশ্বের প্রায় সকল সমাজেই পুরুষতন্ত্র একটি প্রভাবশালী কাঠামো হিসেবে কাজ করছে এবং ভাষা সেই পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ ও শক্তির অন্যতম বাহক হয়ে উঠছে (চক্রবর্তী, ২০১৮)। ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, পুরুষতন্ত্র ভাষার মাধ্যমে নারীকে অধীন, অবদমিত এবং অবমূল্যায়িত করে তুলছে। ফলে ভাষা হয়ে উঠছে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক। নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহার, প্রতিনিধিত্ব এবং সাংস্কৃতিক চিত্রায়ন বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, কীভাবে ভাষার মাধ্যমে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীর অবদমন নিশ্চিত করা হয়। ভাষার গঠন, শব্দের নির্বাচন, বাগধারা, প্রবাদপ্রবচন এবং দৈনন্দিন কথ্য রীতিতেও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুনির্মিত। ভাষার মাধ্যমে নারীর পরিচয় সামাজিক নির্মাণের অংশ হয়ে উঠে, যা তাঁর অবস্থান, ক্ষমতা এবং সুযোগকে নির্ধারণ করে দেয়।

এই প্রবন্ধে ভাষা, লিঙ্গ এবং ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পুরুষতন্ত্র কীভাবে ভাষায় প্রবিষ্ট হয় এবং ভাষা কীভাবে সামাজিক অসমতা গঠনে ভূমিকা রাখে, তা তাত্ত্বিক এবং প্রামাণিক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাষায় নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারের বৈষম্যমূলক দিকগুলির উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ভাষার ভেতর পুরুষতন্ত্রের সূক্ষ্ম অথচ প্রকট আধিপত্য কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে ভাষা নারীকে অধীন ও অনুচিত রূপে উপস্থাপন করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ভাষার ভেতরকার লিঙ্গ-নির্ভর ক্ষমতাবিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতীকী ও প্রাত্যহিক অবদমন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত কাঠামো উন্মোচন করা। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়– এটি সামাজিক চিন্তা, অর্থ, ও রাজনৈতিক মতাদর্শ গঠনের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে, গবেষণাটি ভাষা, লিঙ্গ এবং ক্ষমতার মধ্যকার জটিল আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে নারীর 'নীরবতা', ভাষাগত গৌণতা এবং ভাষার পুরুষকেন্দ্রিক নির্মাণ কীভাবে একটি সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে তা অনুসন্ধান করে। সর্বোপরি বলা যায় নারী ও পুরুষের অবস্থান হতে শুরু করে, নারী ও পুরুষের পরিচিতি নির্মাণ এবং যাপিত বাস্তব

জীবনে পুরুষতন্ত্র, আধিপত্য ও ক্ষমতা কাঠামোর বলয়ে নারী ও পুরুষের বিভাজন তৈরিতে ভাষার প্রগাঢ় ভূমিকা অনুধাবন এই প্রবন্ধের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণাটি একটি বিশ্লেষণাত্মক ও গুণগত গবেষণা, যেখানে নারীবাদী ভাষাতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে ভাষা, লিঙ্গ ও ক্ষমতা বিষয়ক ধারণাগুলোর গঠনগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে Judith Butler, Dale Spender, Robin Lakoff, Szlvia Walby, Pierre Bourdieu এবং Michel Foucault-এর ভাষা ও লিঙ্গ নিয়ে বিশ্লেষণ থেকে। ভাষাকে একটি সামাজিক ও মতাদর্শিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে নারীর অভিজ্ঞতা ও অবদমনগুলো কিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভাষায় নিহিত প্রতীকী কাঠামো, নীরবতার নির্মাণ এবং ক্ষমতার ভাষিক প্রকাশ চিহ্নিত করতে বক্তব্য, সাহিত্য এবং সামাজিক যোগাযোগের ধরনসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই  ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস মূলত ভাষার মাধ্যমে সামাজিক লিঙ্গ-কাঠামো কীভাবে রূপায়িত ও কার্যকর হয়, তা উন্মোচন করে। নারীবাদী ভাষাতাত্ত্বিক রচনা ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গূঢ় পাঠসমূহ পর্যালোচনা করে ভাষায় নারী অভিজ্ঞতা ও পিতৃতান্ত্রিক প্রতিসাম্যের প্রতিফলন খতিয়ে দেখা হয়েছে। সমগ্র গবেষণা জুড়ে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভাষাকে একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম নয় বরং মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র হিসেবে অনুধাবন করা হয়েছে। এই সমালোচনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি ভাষাকে ক্ষমতা-রাজনীতির একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে।

## ভাষা, লিঙ্গ ও ক্ষমতাঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত Ferdinand de Saussure এর মতে, ভাষা একটি সাংকেতিক বা চিহ্ন ব্যবস্থা (Sign system) যেখানে "Signifier" (শব্দের রূপ) এবং "Signified" (শব্দের ধারণা) পরস্পর নির্ভরশীল। উচ্চারিত শব্দ, ইমেজ, লিখিত শব্দ, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ইত্যাদি ভাষার ভিতরে চিহ্ন হিসেবে কেবল মাত্র তখনই কাজ করে যখন সেগুলো চিন্তা প্রকাশ করে কিংবা যোগাযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ ভাষা নিজে বাস্তবের সরাসরি প্রতিবিম্ব নয়; বরং এটি সামাজিক রীতির মাধ্যমে নির্মিত এক ধারা। এই সাংকেতিক নির্মাণের মধ্যে পুরুষতন্ত্র তার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করে। ফলে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে সমাজ যে ধারণা বহন করে, তা ভাষার মাধ্যমে স্থায়ী রূপ পায় (Saussure, 1916)। Saussure এর গঠনবাদের আলোকে বলা যায়, নারীর পরিচিতি, মর্যাদা এবং ভূমিকা মূলত সাংকেতিক ভাষার ভেতর তৈরি হয় এবং এর মাধ্যমেই নারীর ওপর সামাজিক মূল্যবোধ আরোপ করা হয়।

Edward Sapir 1920 এর দশকে একটি ধারণা প্রদান করেন যে, ভাষা বাস্তবতার উপলব্ধিকে আকৃতি দান করে। পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতে 'Sapir-Whorf Hypothesis' প্রস্তাব করে, যার কেন্দ্রীয় ভাবনা হলো ভাষা আমাদের চিন্তা এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে। এই হাইপোথিসিস অনুসারে, ভাষা কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, এটি চিন্তাকেও গঠন করে (Whorf, 1956)। আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তা আমাদের বিশ্ব দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে দেয়। যদি কোনো ভাষা নারী সম্পর্কে নেতিবাচক বা অবমূল্যায়নমূলক শব্দভান্ডার ধারণ করে, তাহলে সে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও নারীর প্রতি ততটাই নেতিবাচক হবে। Sapir-Whorf এর আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যে, যদি একটি ভাষা পুরুষকেন্দ্রিক শব্দভান্ডার ও গঠন প্রণয়ন করে, তবে সেটি কেবল ভাষার কাঠামো নয় বরং সমাজের প্রতিবিম্ব, যা বক্তার চিন্তার ওপর প্রভাব ফেলে।

অপরদিকে Michel Foucault (1972) ভাষাকে ক্ষমতার একটি মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, ভাষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং জ্ঞানের উৎপাদনও ভাষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাষা নির্ধারণ করে কে কথা বলবে, কী বলা হবে এবং কীভাবে বলা হবে। Foucault (1976) এর ভাষায়, "Power is everywhere because it comes from everywhere"। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ভাষা তাই এমনভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে পুরুষের আধিপত্য বজায় থাকে এবং নারীর কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষুণ্ন করা হয়। কথ্য ভাষা, গালি, প্রবাদ-প্রবচন, এমনকি সাহিত্য ও গণমাধ্যমের ভাষাতেও এই বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটানো হয়। Foucault এর তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষা নিছক নিরপেক্ষ প্রকাশ নয়; বরং এটি সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণের একটি উপায়। ফলে ভাষায় নারীর অবমাননাকর উপস্থাপনা কেবল সমাজের প্রতিফলন নয়, সমাজ নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া। তিনি ভাষাকে "জ্ঞান-ক্ষমতার" নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেন; ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী ভাষার নিয়ম নির্ধারণ করে, ফলে দুর্বল গোষ্ঠীর চিন্তা-উদ্দীপনা ও বক্তব্য অবরুদ্ধ হয় (Foucault, 1972)।

এ বিষয়ে Norman Fairclough (1989) উল্লেখ করেন যে, ভাষার ব্যবহার সামাজিক ব্যবস্থা ও সুশাসনের অংশ; ফলে ভাষার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ধারণার প্রচার যেমন হয় তেমনি সমাজের নিম্নস্তরের দমনের কাজও হয়। বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবচন, গালিগালাজ এবং লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শব্দ প্রয়োগ এই উপরোক্ত ধারণাগুলোকে সমর্থন করে কারণ এগুলো নারীর সম্মানকে লঙ্ঘন ও হ্রাস করে (Coates, 1996)।

Judith Butler (1990) লিঙ্গ পরিচয়কে পারফরমেটিভ (Performative) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, "Gender is not something one is, it is something one does." ভাষা সেই প্রধান মাধ্যম যার দ্বারা লিঙ্গ পরিচয় প্রতিনিয়ত

নির্মিত এবং পুনঃনির্মিত হয়। নারীকে 'কোমল', 'নমনীয়', 'আনুগত্যশীল' হিসেবে উপস্থাপন করা এবং পুরুষকে 'শক্তিশালী', 'স্বাধীন', 'নেতা' হিসেবে ভাষায় চিত্রায়িত করা Butler-এর ভাষায় লিঙ্গ ভিত্তিক পারফরমেটিভিটির উদাহরণ। তিনি মনে করেন ভাষায় যদি এই দৃশ্যপট পরিবর্তন করা যায়, তাহলে লিঙ্গ পরিচয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়াও বদলে যেতে পারে। Butler (1993) লিঙ্গকে কোনো অভ্যন্তরীণ সত্য বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয় বরং ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে 'অভিনয়' হয়ে আসা সামাজিক ফলাফল হিসেবে দেখেন। এই দৃষ্টিতে, ভাষার ব্যবহারই লিঙ্গ-বিশিষ্ট সামাজিক ভূমিকা তৈরির একটি উপাদান।

Deborah Tannen (1990) নারীর ভাষা ও পুরুষের ভাষার ধরন বিষয়ে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, নারী ভাষা ব্যবহার করে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং পুরুষ ভাষা ব্যবহার করে তথ্য বা মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য। তিনি জেন্ডারলেক্ট (Genderlect) ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে পুরুষ-নারীর কথ্য শৈলীকে ভিন্ন ডায়ালেক্ট বা রীতির মতো করে দেখা হয়। তার মতে, পুরুষরা ভাষায় প্রতিযোগিতা, মর্যাদা ও ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে (report-talk), আর নারীরা সম্পর্ক স্থাপন ও সংযুক্তি তৈরি করতে (rapport-talk) বেশি মনোযোগী হন।

Tannen দেখিয়েছেন, নারী ও পুরুষের ভাষিক শৈলীর পার্থক্য সামাজিকীকরণ এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার ফল। নারীকে বেশি নমনীয়, অনুভূতিপ্রবণ এবং সহযোগিতাপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে উৎসাহ দেওয়া হয়; পুরুষকে নিরপেক্ষ, দৃঢ় এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ভাষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী সমাজেও এই বৈষম্য সুস্পষ্ট। কথ্য ভাষা থেকে শুরু করে সাহিত্য, সংবাদ মাধ্যমের ভাষাতেও নারী ও পুরুষের ভাষাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, নারী-পুরুষের ভাষা শুদ্ধ কী অশুদ্ধ, ঊর্ধ্বতন কী অধস্তন সেটা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো, তাদের ভাষা আলাদা। এই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ এতটাই যে, একজন ব্রিটিশ ও একজন জাপানির সংস্কৃতিগত ভিন্নতার জন্য বাচনে যে ভিন্নতা দেখা যায় নারী ও পুরুষের বাচনে সেরূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

Robin Lakoff তার *'Language and woman's place'* নামক প্রবন্ধে লিখেছেন প্রতিটি ভাষারই একটি লৈঙ্গিক পরিচয় আছে এবং এই পরিচয় নির্ধারিত হয় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোকে এবং এই পটভূমিতে পুরুষগণ চিরকালই অসামান্য প্রাধিকারপ্রাপ্ত। শুধু তাই নয়, ভাষা সংগঠনের যে নিরবচ্ছিন্ন ধারাক্রম সেই ধারাও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'নারীর ভাষা' হিসেবে পরিচিত কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ধীর, নম্র ও আশা-প্রতীক্ষার বাক্য প্রকাশ করে এবং হেজ (hedge) বা অনিশ্চিত শব্দ ('আছে তো?', 'হয়তো') বেশি ব্যবহার করে (Lakoff, 1975)। এছাড়া অব্যয় ও বিশেষণ ব্যবহারে

ভেদাভেদ লক্ষ করা যায়, যেমন স্বামীর মান-উপাধি প্রকাশে যে শব্দ চয়ন করা হয় (যেমন 'স্বামীজিকে'), স্ত্রীর মান-উপাধি প্রকাশে ভিন্ন শব্দচয়ন (যেমন মহিলা, গৃহিণী ইত্যাদি) করা হয়। Lakoff বলেন যে, এই সব ভাষিক লক্ষণ সমাজে নারীদের অবহেলা ও অধিকারহীনতারই প্রতিবিম্ব।

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত Faye Crosby ও Linda Nyquist এর The Female Register: An Empirical Studz of Lakoff's Hypothesis নামক গবেষণা গ্রন্থে 'Female Register' সম্পর্কে Lakoff এর দাবিকে পরীক্ষা করা হয়। বিশেষ করে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ট্যাগ প্রশ্ন, হেজেস শব্দ এবং পরীক্ষামূলক ভাষা বেশি ব্যবহার করে কিনা তা দেখা হয়। গবেষণা ফলাফল দেখায় নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি পরীক্ষামূলক ভাষা ব্যবহার করেন না। তাদের এই অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পার্থক্যের বিষয়ে আরো বিতর্কের সূত্রপাত করে।

অপরদিকে Ludwig Wittgenstein এর 'Linguistic turn' ধারণাটি বিশ শতকের দর্শনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। যেখানে অভিজ্ঞতা ও যুক্তির পরিবর্তে ভাষা চিন্তা, জ্ঞান এবং বাস্তবতা বোঝার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তিনি বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়াকে পাকাপোক্ত করতে ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেখান ভাষা কি করে মানুষের চেতন ও অবচেতন মনে চিন্তার সূত্রপাত ঘটায় এবং সেই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ কি করে ভাষার হাত ধরে ঘটে (Wittgenstein, 1953)। তিনি যাবতীয় দার্শনিক সমস্যা সমাধানের জন্য দৈনন্দিন ভাষা বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। মূলত ভাষা কীভাবে বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে রূপ দেয় তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এর পাশাপাশি মানুষের চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতা গঠনে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন।

Doborah Cam eron (2003) ও Sara Mills (2004) সহ আধুনিক জেন্ডার ভাষাতত্ত্ববিদেরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, পুরুষ ও নারীদের ভাষাগত পার্থক্যকে 'প্রাকৃতিক' হিসেবে সহজভাবে দেখা উচিত নয়। কারণ তারা মনে করেন এই পার্থক্যগুলো সামাজিক পদবিন্যাস, ক্ষমতার বিন্যাস ও সামাজিকীকরণের ফল। Mills দেখিয়েছেন নারীদের কথায় অধিক বিনয় এবং স্বল্পাকাঙ্ক্ষা পোষণের প্রবণতা মূলত সামাজিকভাবে পুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত পছন্দের ফল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কিছু কাঠামোসমূহ নারীকে 'শান্ত এবং স্বল্পচাহিদার' চরিত্রে সীমিত করে, যা পুরুষতন্ত্রকে স্বাভাবিকায়িত করে (Mills, 2004)।

M atz I Borker (1982) ভাষা, লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক অন্বেষণ করে দেখান কীভাবে ভাষার ব্যবহার নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে এবং পার্থক্যগুলো কিভাবে ক্ষমতা ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া শৈলীর সাথে সম্পর্কিত। তারা বলতে

চান লিঙ্গ, মর্যাদা, ক্ষমতা ও ভাষা চর্চার মধ্যেকার সম্পর্ক কেবল প্রাকৃতিক নয় বরং অনেক বেশি সামাজিক।

Dale Spender (1980) তার *Man Made Language* নামক গ্রন্থে বলেন ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ নারীদের তুলনায় বেশি ক্ষমতাকে ধারণ করে। যার প্রভাব ভাষার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। ভাষার নিয়ম ও ব্যবহার অধীনে চলে যায়। যার ফলে পুরুষ তার নিজের মতো করে ভাষা চিন্তা ও বাস্তবতাকে রূপায়ন করে এবং ভাষাকে নারীর অবদমনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলা ভাষায় ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণায় অনেকে অবদান রাখলেও তাঁদের মধ্যে হুমায়ুন আজাদ বিশেষভাবে সমাদৃত। তিনি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ককে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয়ের ধারক ও বাহক। তিনি ভাষার বিশুদ্ধতা এবং এর সঠিক ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি ভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা সম্পর্ক ও সামাজিক বৈষম্যের দিকটিও তুলে ধরেছেন। তার 'বাক্যতত্ত্ব', 'তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান', 'বাংলা ভাষা' বইগুলোতে তিনি ভাষার গঠন, বিবর্তন এবং এর সাথে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (ইশতিয়াক, ২০২১)। তিনি মনে করতেন ভাষা সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং সমাজের রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তিনি ভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা সম্পর্ক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ভাষাগত বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ভাষার গঠনমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনার কথা বলেন।

অপরদিকে মনসুর মুসা (২০২০) বলেন, ভাষা বলে একটিমাত্র জিনিস নেই, যা আছে সেটি হলো ভাষা উৎপাদনের মানবীয় ক্ষমতা। তাঁর মতে মানুষ হবার প্রাথমিক শর্ত হলো ভাষা। তিনি মনে করেন ভাষা একটি শ্রেণীগত বিষয় যা সামাজিক বৈষম্যের ভিতরে চর্চিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয় (চৌধুরী, ২০২০)। ভাষাকে তিনি নির্মাণকারীর ভূমিকায় দেখতে চান।

### ভাষা ও পুরুষতন্ত্র: ধারণাগত পর্যালোচনা

পুরুষতন্ত্র (Patriarchy) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Patriarches' থেকে, যার অর্থ হলো 'পিতার শাসন'। উৎপত্তিগতভাবে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতো এক বিশেষ ধরনের 'পুরুষ-অধীনস্থ পরিবার' নির্দেশে, অর্থাৎ নারী, কমবয়সী পুরুষ, শিশু, দাস, গৃহকর্মী সকলকে অন্তর্ভুক্ত যে বিশাল পরিবার পরিচালিত হতো একজন আধিপত্যশীল পুরুষের অধীনে। কিন্তু এখন এটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে পুরুষের আধিপত্যকে নির্দেশ করতে; সেই শক্তি সম্পর্ককে বোঝাতে, যার দরুণ পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করে নারীর উপর (Peal,

2021)। তাছাড়া পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যও নিরূপণ করা হয়, যেখানে বেশ কিছু উপায়ে নারীকে অধস্তন করে রাখা হয়।

পুরুষতন্ত্র কী এবং কেন এর ধারণাটি বোঝা জরুরি- এটি ব্যাখ্যা করতে Kom ala Vasin (1993) এর *What is Patriarchy?* গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়ক। কথো াপকথনমূলক ভঙ্গিতে রচিত এই বইটি পুরুষতন্ত্র বিষয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তি দূর করে একটি স্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক বোধ তৈরি করে। নারীবাদী মনস্তত্ত্ববিদ Juliet Mitchell (1974) পুরুষতন্ত্রকে এমন এক প্রতীকী ও সামাজিক সম্পর্কব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন, যেখানে নারীদের পুরুষের আদান-প্রদানের বস্তু হিসেবে দেখা হয় এবং পিতারূপী পুরুষেরা সেই প্রতীকী ক্ষমতা চর্চা করে। তার মতে, এই কাঠামো নারীর হীনম্মন্য মনস্তত্ত্বের পেছনে অন্যতম নিয়ামক। অন্যদিকে, Silvia Walby (1990) তার Theorizing Patriarchy গ্রন্থে পুরুষতন্ত্রকে একটি সাংগঠনিক কাঠামো ও অনুশীলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য, শোষণ ও নিপীড়নের মাধ্যমে টিকে থাকে। তিনি জৈব নির্ধারণবাদ এবং পুরুষতন্ত্রের সর্বজনীনতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তবাদী ধারণাকেও প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। এই কাঠামোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ নারীর অধীনস্থতা ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে- যা দক্ষিণ এশীয় ভাষায় 'স্বামী', 'পতি', 'মালিক' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারেও প্রতিফলিত হয়।

এই পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে Friedrich Engles এর বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের জন্যই নারীর বশ্যতার সূত্রপাত হয়। তিনি তার *The Origin of the Family, Private Property and the State (1884)* গ্রন্থে বলেছেন, মাতৃস্বত্ব যেদিন পরাভূত হয় সেদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে চলে যায়, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং নারী দাসত্বের সূচনা ঘটে। অপরদিকে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী Max Weber (1947) পুরুষতন্ত্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, পারিবারিক কাঠামো থেকেই এর সূচনা, যা পরে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়েছে।

Mary Daly (1985) বলেন, পুরুষতন্ত্রের শাসকরা (ক্ষমতাবান পুরুষরা) স্বয়ং জীবনের বিরুদ্ধেই এক যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাঁর ভাষায় "পুরুষতন্ত্রের রাষ্ট্র হলো যুদ্ধের রাষ্ট্র, যেখানে যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণের এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সময়গুলোকে 'শান্তি' নামক শ্রুতিমধুর অভিধা প্রদান করা হয়।" তাঁর মতে, ভারতের সতীদাহ প্রথা, চীনের পদবন্ধন প্রথা, আফ্রিকার কমবয়সি মেয়েদের যৌনাঙ্গচ্ছেদ, 'রেনেসাঁ' যুগের ইউরোপে ডাইনি নিধন, আমেরিকান গাইনোকলজি ও সাইকোথেরাপির অন্তরালে গাইনোসাইড (নারী হত্যা) ইত্যাদি সবই হলো নারীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সহিংসতার দৃষ্টান্ত, যা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রচলিত রয়েছে।

নারীবাদী চিন্তাবিদ Hedi Hartm ann পুঁজিবাদ ও পুরুষতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র শনাক্ত করে বলেন, পুরুষতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো নারীর শ্রমশক্তির ওপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ। এটি অর্জিত হয় নারীদের উৎপাদনশীল সংস্থান থেকে দূরে রাখা এবং যৌনতা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। একগামী বিষমকামী বিবাহ ব্যবস্থাই এই নিয়ন্ত্রণের কার্যকর মাধ্যম, যা পুরুষকে নারীর যৌনতা ও শ্রমশক্তি উভয়ের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে (Pieal, 2021)। তার মতে, এই কাঠামো পারিবারিক ও সামাজিক উভয় পরিসরে নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক Gerda Lerner তাঁর *The creation of Patriarchy (1986)* গ্রন্থে বলেছেন, ”পিতৃতন্ত্রের অধীনে নারীর তুলনায় পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নির্ধারণবাদী সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে।” পুরুষতন্ত্রের কাঠামোগত বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, সামাজিক মঞ্চটির নির্মাণ, পরিচালনা এবং ব্যাখ্যার ক্ষমতা পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত। এটি শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের সম্পর্কের মতো, যেখানে শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ থাকে অন্যের হাতে। তাঁর মতে, মূল সংকট নারীর ভূমিকা নয়, বরং সেই মূল্যায়ন কাঠামো, যা পুরুষ কর্তৃক নির্মিত এবং নিয়ন্ত্রিত। এটি নারীকে পার্শ্বচরিত্রে রূপান্তর করে এবং তাদের অবদানকে সীমিত মূল্যায়নের আওতায় রাখে।

Kate Millett এর মতে, ভাষা সামাজিক বাস্তবতার প্রধান নির্মাতা এবং এটি পুরুষতন্ত্রের কাঠামোকে সুসংহত করে। তিনি তাঁর *Sexual Politics (1970)* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ভাষা ও সাহিত্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে। ভাষার ব্যবহারে, শব্দ নির্বাচনে, বাক্যগঠনে এমনকি ব্যাকরণেও পুরুষ আধিপত্যের ছাপ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অনেক ভাষায় পুরুষের অভিন্ন শব্দ থাকলেও নারীর জন্য আলাদা এবং প্রায়শই অবজ্ঞাসূচক শব্দের প্রয়োজন হয় (যেমনঃ ‘মাস্টার’ বনাম ‘মিস্ট্রেস’)। বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দ যেমন ‘সভাপতি’, ‘রাষ্ট্রপতি’, ‘সেনাপতি’ ইত্যাদির লিঙ্গ নির্দেশনা পুরুষ কেন্দ্রিক।

Robin Lakoff (1975) তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, নারীরা সামাজিক অনুশাসনে এমনভাবে কথা বলতে বাধ্য হন, যাতে তারা ক্ষমতার দাবিদার হিসেবে নয় বরং নম্র ও আনুগত্যশীল হিসেবে প্রতিভাত হন। ফলে ভাষা নিজেই এক প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র হয়ে ওঠে। আর এভাবেই ভাষা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখে এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে বৈধতা দেয় (হোসেন, ২০১৮)।

## ভাষা, প্রতিনিধিত্ব ও আধিপত্য: তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ

Edward Said তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Orientalism (1978)* এ ব্যাখ্যা করেছেন, ভাষা কীভাবে উপনিবেশিক শক্তি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পশ্চিমা বিশ্ব 'প্রাচ্য' বা 'পূর্ব' জাতিগুলিকে এমনভাবে ভাষায় উপস্থাপন করেছে, যা তাদের অবদমিত, দুর্বল এবং অধীনতর করে তোলে। ভাষার মাধ্যমে বাস্তবতাকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, যা ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠীর আধিপত্য বজায় রাখে। ঠিক একইভাবে পুরুষতন্ত্র নারীকে ভাষার মাধ্যমে 'অন্য' (Other) হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে নারীর স্বর ও অবস্থান অবদমিত হয় এবং পুরুষের দৃষ্টিকোণকে 'প্রকৃত' বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

Pierre Bourdieu (1991) তার 'Language and Symbolic Power' তত্ত্বে দেখিয়েছেন, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি ক্ষমতা প্রদর্শন এবং সামাজিক শ্রেণি গঠনের একটি প্রধান যন্ত্র। ভাষার ভেতর যে নিয়ম-নীতি, মানদণ্ড ও মান্যতা তৈরি হয়, তা ক্ষমতাবানদের আধিপত্য নিশ্চিত করে। যা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই বৈষম্য তৈরি করে। নারীর ভাষা অবদমন এই প্রতীকমূলক ক্ষমতারই অংশ। নারী যদি পুরুষনির্ধারিত ভাষিক রীতিতে না চলেন, তাহলে তাঁকে 'অশালীন' বলে চিহ্নিত করা হয়। ভাষার 'Colonical form' (একটি বাক্য বা শব্দ যা প্রকাশের সবচেয়ে আদর্শ রূপ) ক্ষমতাসীন শ্রেণির দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রান্তিক শ্রেণি ও লিঙ্গের কণ্ঠস্বর ভাষাগত কাঠামোতে নীরব করে দেওয়া হয়। Bourdieu ভাষাকে সাংস্কৃতিক পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, ভাষা সামাজিক শ্রেণি, ক্ষমতা এবং মর্যাদার প্রতীক। নির্দিষ্ট ভাষিক রীতি ও শৈলী ধরে রাখার মাধ্যমে উচ্চবিত্ত শ্রেণি নিজেদের সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখে। একইভাবে, লিঙ্গভিত্তিক ভাষিক রীতিতেও পুরুষরা নিজেদের সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে বলে তিনি মনে করেন।

নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়টি মূলত Stuart Hall (1997) এর 'Representation Theory' দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে, ভাষা ও চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবতা নির্মাণ করা হয়। আমরা বাস্তবতাকে সরাসরি দেখতে পাই না; বরং ভাষা ও চিত্রের মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি গঠিত হয়। ফলে নারীর সম্পর্কে সমাজে যে চিত্র বিদ্যমান, তা ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মাধ্যমে নির্মিত। তিনি বলেন, "Representation is the production of meaning through language." অর্থাৎ নারীকে যদি ভাষায় দুর্বল, আবেগতাড়িত বা অধঃস্থানে চিত্রিত করা হয়, তাহলে সেই চিত্র সামাজিক বাস্তবতার অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নারী প্রতিনিধিত্বের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, নারীর একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইমেজ- যেমন আত্মত্যাগী মা, প্রেমাসক্ত নারী অথবা চরিত্রহীন নারী- ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হয়েছে। এই ইমেজগুলো

নারীর বহুমাত্রিক পরিচয়ের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং একটি সংকীর্ণ সামাজিক প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

নারীবাদী ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন Dale Spender (1980), Robin Lakoff (1975) এবং Devora Cameron (1992) ভাষায় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের নিগূঢ় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো ভাষা পুরুষদের অভিজ্ঞতাকে সাধারণ এবং নারীর অভিজ্ঞতাকে বিশেষ করে তোলে। পুরুষ-নির্ধারিত ভাষাগত নিয়ম নারীর সামাজিক অধীনতা নিশ্চিত করে। যার ফলে নারীর অভিজ্ঞতা ভাষার কাঠামোতে যথাযথ স্থান পায় না বা বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় (আহমেদ, ২০১৮)।

এডওয়ার্ড সাঈদের অন্যকরণ (Othering), বোর্দিয়ের প্রতীকী ক্ষমতা (Szmbolic Power), Stuart Hall-এর প্রতিনিধিত্ব (Representation) এবং ফেমিনিস্ট ভাষাতত্ত্বের ভাষাগত আধিপত্য (Linguistic Domination) এ চারটি বিশ্লেষণ মিলিয়ে দেখা যায়, ভাষা শুধু সমাজের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না, বরং সমাজের লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও ক্ষমতার কাঠামোকে উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করে।

**বাংলা সাহিত্যে নারী ও অসমতার প্রতিচ্ছবি**

বাংলা সাহিত্যে নারীর অবস্থান, চিত্রায়ন এবং ভাষা ব্যবহারে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে নারী চরিত্র মূলত চারটি রূপে চিত্রিত হয়েছেঃ 'ত্যাগী ও মমতাময়ী মা', 'ধর্মপরায়ণা স্ত্রী', 'লজ্জাবতী কন্যা' এবং 'ভ্রষ্টা নারী'। এই কাঠামো থেকে সরে আসা নারী চরিত্রকে সচরাচর নেতিবাচক বা হুমকিস্বরূপ দেখানো হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা' উপন্যাসে নারী চরিত্র দুটি যথাক্রমে বিনোদিনী ও বিলাসিনী মূলধারার নারী আদর্শের বাইরে অবস্থান করায় সমাজ কর্তৃক সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়।

Sandra Gilbert এবং Susan Gubar (1979) তাঁদের M ad wom an in the Attic বইতে বলেন, সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে নারীদের 'পবিত্র দেবী' অথবা 'ভয়ংকর পাপিষ্ঠা' দুই মেরুর মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে। বাংলা সাহিত্যেও এই সংকীর্ণ কাঠামোর বাইরে বের হতে বেশ সময় ব্যয় করেছে।

ইংরেজ কবি ও নাট্যকার Shakespeare তাঁর Ham let নাটকে দেখিয়েছেন, বাবার মৃত্যুর পর মা এক মাসের মধ্যে ক্লডিয়াসকে বিয়ে করলে সন্তান বলেন, "Frailty thy nam e is wom an"। এই কথার মধ্য দিয়ে সমস্ত নারীকে অবজ্ঞা করা হলো। তাছাড়া সন্তান তার মাকে অবজ্ঞা করতে পেরেছে, কারণ মা হলেন নারী। সুতরাং শিল্প, সাহিত্য কখনও কখনও জেন্ডার নিরপেক্ষ না হয়ে পুরুষতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করে।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুটি ভাগ দেখা যায়। একটি ভাগে আছে কবিতা ও অন্য ভাগে আছে গদ্য। যে গদ্যে লেখা হয় গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে কবিতা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ভাষার শব্দসমূহ যুথবদ্ধ হয়ে ছন্দ তুলে সৃষ্টি করে কবিতার। কবিরা ছন্দের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সম্পর্কসহ সমাজের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৮০০ সালের পূর্বে গদ্য প্রায় ছিলই না তখন কবিতাই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাণ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত নারীর ভূমিকা মূলত সহনশীল, অনুগত এবং কখনো কখনো বিপদের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চর্যাপদে নারী কখনো কামনাময়ী, কখনো অবাধ্য চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের (ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল) নারীরা দেবীর আদেশের অনুসারী, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যহীন চরিত্ররূপে উপস্থাপিত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একটি নারীদের পতিনিন্দা এবং অন্যটি নায়িকার বারোমাসি বর্ণনা (খান, ১৯৯৫)। নারীকে মূলত ভোগের সামগ্রী রূপেই দেখা হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, তার মাতৃরূপ এবং অন্যান্য রূপ যদিও উপেক্ষিত হয়নি, কিন্তু নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে মহিমান্বিত করা হয়নি প্রায় কোথাও।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে প্রায় সোয়া তিন শত পংক্তি ব্যাপী কবি পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন:

শ্রুতিগত মাত্র রূপ সুধা রস বোল।
প্রেমের সায়রে শত উঠিল হিললল।।

পদ্মাবতীর অনেক পরে রচিত একটি কবিতায় নায়কের আকাঙ্ক্ষা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

গিয়া ছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
..............
যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
কোনমতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী।।

নারীর প্রতি পুরুষের হৃদয়ে ভোগের আকাঙ্ক্ষা এই মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

"অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা"। ঘোষণা দিয়ে বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ তার 'মানসী' কবিতায় নারীর অর্ধেক সত্তা বিনির্মাণের দায়ভার পুরুষের হাতে দিয়েছেন এ কথা

আধুনিক চিন্তা ধারার মানুষদের অজানা নয়। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলাম তার 'নারী' কবিতায় নারীকে উপস্থাপন করেন নিম্নোক্তভাবে:

নারী কভু নাহি চায়
একা হতে কারো
ওরা দেবী, ওরা লোভী
যত পূজা পায়, তত চায় আরো
ইহাদের অতি লোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়
এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।

এখানে দেখা যাচ্ছে নারী একজন অতি লোভী, অতি প্রত্যাশী, বহুগামী ব্যক্তি। অর্থাৎ নারীর নেতিবাচক উপস্থাপন এখানে লক্ষ করা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলই নয়, যুগে যুগে কালক্রমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে বিনির্মাণ করেছে নিজের মতো করে। নারীর চিত্ররূপ তুলে ধরতে কবিরা প্রায়শই যে ধরনের উপমা ব্যবহার করেন সেগুলোর মধ্য দিয়েও কবির পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। 'ধর্ষণ' কবিতাটিতে হুমায়ুন আজাদ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার উন্মোচন ঘটান এভাবেই:

একাত্তরের পাকিস্তান নামী এক নষ্ট তরুণী আমাকে দেখালো
তার বাইশ বছরের তাজা দেহ, পাকা ফল,
মারাত্মক জংঘা চৌরাস্তায় রিকশা থেকে টেনে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করলাম;
বিকট চিৎকারে তার দেহ রক্তাক্ত ও দুই টুকরো হ'য়ে গেল।

অপরদিকে 'সুসজ্জিতা' কবিতায় কবি ওমর আলী নারীকে উপস্থাপন করেন নানা বস্তুর সাথে তুলনা করে।

কদলী বৃক্ষের মতো উরু
সুমসৃণ যেন বা রেশম
কালো শেকড়ের মতো ভুরু'
নারী যদি হতো এরকম!
বিল্ব ফলের মতো স্তন,
বাহু দুটি সুপক্ক শশা,
গুরুভার পশস্ত জঘন
ঘিরে আছে নিরত তমসা।

নারীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গকে (বিশেষভাবে যেগুলো নারীর যৌনতার সাথে সংশ্লিষ্ট) কবিরা প্রায়শই বিভিন্ন বস্তুর সাথে তুলনা করে যেমনি তুলে ধরেন; তেমনি আবার কোনো দৃশ্যকল্পের সাথে সম্পর্কিত কোনো বস্তুকেও নারী-দেহের সাথে তুলনা করে তাকে তুলে ধরেন। তুলনা করার মধ্য দিয়ে নারীকে সহজলভ্য নিছক একটা বস্তু (প্রাণহীন) হিসাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন হুমায়ুন আজাদ এর 'ফেরা' কবিতার নিচের লাইন সমূহ:

ক্ষেত ফিরে যাচ্ছে ফলন্ত তরঙ্গরাশি শ্রোণিভারে দোলাতে দোলাতে; নৌকো, তন্বীস্তনের মতো পাল কাঁপে মৌশুমি বাতাসে; সবাই ফিরছে ঘরে সুখী তৃপ্ত সুন্দর মায়াবী। আবার একই প্রবণতা আমরা কবি আল মাহমুদ এর 'শোণিতে সৌরভ' নামক কবিতায় দেখতে পাই:

তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল–
ঈভের মতো আজ হও না চঞ্চল
আমার ডানহাতে রাখো সে গৌরব;
তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ।
.........
তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
দেবে কি গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ?

কবিরা সচরাচর নারীর সৌন্দর্যকে তার যৌনতার সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করে থাকেন। যেখানে নারী কেবল বস্তু হয়ে পড়ে থাকে। তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা সেখানে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাস্তব জীবনের শৃঙ্খলিত নারীর অবয়ব নির্মিত হয় সাহিত্যগুলোতে। যেখানে সমাজের আধিপত্যশীল পুরুষতান্ত্রিক আবহে নারীর অবয়ব ফুটে ওঠে, যা নারীকে একজন মূল্যবান সত্তা হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ না করে আধিপত্যশীল পক্ষের ফ্যান্টাসির বস্তুতে পরিণত করে।

ভাষা সমাজেরই একটি অংশ। ভাষা দিয়েই তৈরি হয় গান-গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি। সমাজ যখন জেন্ডারকে গুরুত্ব দেয় না তখন শিল্প, সাহিত্যের ভাষাও সংবেদনশীল হয় না। সাহিত্যে নারী-পুরুষের ভাষা ও সমাজে তাদের ভূমিকার উপস্থাপনে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন "যাহা দুরূহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ।" এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের অন্তর্গত। এটি কুমুদিনী নামক চরিত্রের উক্তি, যা তার স্বামীর প্রতি তার বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এই উক্তিতে কুমুদিনী বোঝাতে চেয়েছেন যে, যা কঠিন বা কষ্টসাধ্য, তাকেও অসাধ্য বা অসম্ভব

মনে না করে, সেই বিশ্বাসে কাজ করে যাওয়াই পৌরুষ বা সাহসিকতা। অপরদিকে নারীকে উপস্থাপন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই  লিখেছেন, "নারী জাতি যুক্তি বুঝে না, তারা সর্বক্ষেত্রে কেঁদে জিততে চায়।" সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদান থাকলেও এই বাক্যটির মাধ্যমে নারীর মেধাকে তুচ্ছ করা হয়েছে এটি বলা অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন এর কারণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে বিপ্রদাস চরিত্রের বয়ানে উল্লেখ করছেন যে, "মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম।" এই উক্তিটি উপন্যাসের একটি বিশেষ মুহূর্তে এসেছে, যখন বিপ্রদাস উপলব্ধি করেন যে, মেয়েরা তাদের নিজেদের সম্মান সম্পর্কে সচেতন নয় এবং এই কারণে তারা সমাজে অবমূল্যায়িত হয়। অর্থাৎ এখানে দোষারোপ করার সাথে সাথে দোষী ব্যক্তি হিসেবে নারীকেই উপস্থাপন করা হচ্ছে। যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যশীল মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যশীলতার প্রতিচ্ছবি খুজে পাওয়া যায় সাহিত্যের পরতে পরতে। তাই নানা অনুষঙ্গে এগুলোকে হাজির করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে লিখছেন,

> স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না, ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না, হয়তো আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন, আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইয়া আসেন, পত্নী পুলকিত হয়েন।

এই অংশে লেখক নারী ও পুরুষের প্রতি সমাজের দ্বৈত নীতি এবং নারীর প্রতি সমাজের কঠোরতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক কথায় এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করেছেন এবং নারীর প্রতি সমাজের অন্যায্য আচরণকে তুলে ধরেছেন।

একই প্রসঙ্গে সমীরণ মজুমদারের 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসের একটি চরিত্রের ভাষ্য এখানে তুলে ধরছি:

> পুরুষের বিবর্তন হয়েছে সমাজ-বিকাশের পথ ধরে। নারীর বিবর্তন ঘটেছে বিবর্তিত পুরুষের প্রয়োজনের অনুষঙ্গ হিসেবে। তাই ধর্মশাস্ত্র-সাহিত্য-শিল্পকলা কোথাও নারীর নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই।

এই উক্তিটিতে পুরুষের বিবর্তন এবং তার সাপেক্ষে নারীর বিবর্তন ও সাহিত্য-শিল্পকলায় নারীর অনুপস্থিতি নিয়ে একটি গভীর পর্যবেক্ষণ হাজির করা হয়েছে, যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এবং নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

## প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কাজে নারী

বাংলা সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন যশস্বী সাহিত্যিকের অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন কবি, লেখক ও সাহিত্যিকের সৃজনশীল লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধসহ বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন, আবার কেউ কেউ নতুন সাহিত্যিক ধারা তৈরি করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের লেখায় নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে নারীকে প্রেমাসক্ত, ব্যর্থ এবং অনুতপ্ত চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বীরাঙ্গনাদের (যেমন সীতা, দ্রৌপদী) কণ্ঠে পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি অনুযোগ থাকলেও, তাঁদের পরিচয় রয়ে গেছে পুরুষকেন্দ্রিক সম্পর্কের নিরিখে। মধুসূদন এই নারী চরিত্রগুলোর মানসিক দ্বন্দ্ব ও অনুভূতির গভীরতা বোঝাতে কিছু বিশেষ শব্দ ও ভাষার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'প্রেমাসক্ত' অর্থে 'অনুরাগী', 'ব্যাকুল', 'উন্মত্ত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ব্যর্থ' অর্থে 'হতাশ', 'বিফল', 'দুঃখিত' ইত্যাদি শব্দ এবং 'অনুত্তপ্ত' অর্থে 'লজ্জিত', 'অপরাধী', 'ক্ষমা প্রার্থী' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দগুলো নারীকে পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল এবং তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে জনা তার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে যে কষ্ট পেয়েছেন, তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে মধুসূদন লেখেন, "ধিক্, ধিক্, এ হেন পামর জীবন/আর কি সহিবে!"। এখানে 'ধিক' শব্দটি ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাশাপাশি, নিজের জীবনের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। অন্যদিকে, তারা নামক এক নারী, যিনি সোমের প্রতারণার শিকার, তার অনুশোচনা প্রকাশ পায় এইভাবে, "আমি অভাগী, আমিই দায়ী এই সকল কষ্টের জন্য"। এখানে 'অভাগী' শব্দটি নিজের দুর্ভাগ্য ও অসহায়ত্বকে তুলে ধরে। এছাড়াও, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় 'আঁখি ছলছল', 'হৃদয় বিদারিণী', 'উন্মাদিনী', 'অতৃপ্ত', 'অশ্রু জলে ভাসা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নারী চরিত্রের কষ্ট, দুঃখ ও অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে ভাষাগতভাবে নারীর অনুভূতি প্রকাশে দুঃখ, অনুশোচনা এবং আত্মনির্ভরতার অভাব বেশি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় নারী চরিত্রগুলির প্রকাশে ভাষার ব্যবহার ও প্রকাশভঙ্গি নারীকে দুর্বল, আবেগপ্রবণ এবং পুরুষের নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর আত্মপরিচয় ও মুক্তির প্রশ্ন তুললেও, তাঁর অনেক লেখায় নারী চরিত্রের আত্মত্যাগ ও প্রেমাসক্তি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী চরিত্র কিছুটা আত্মপ্রত্যয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত প্রেম ও সামাজিক স্বীকৃতির কাঠামোর বাইরে বের হতে পারে না। উপন্যাসের প্রথম দিকে,

বিনোদিনী মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়। এই আকাঙ্ক্ষা তাকে প্রচলিত প্রেম ও কামনার পথে চালিত করে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, বিনোদিনী সমাজের প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। সে বিহারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত সমাজের ভয়ে তা থেকে পিছিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনোদিনীকে "দুঃখিনী বিনোদিনী" হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যা তৎকালীন সমাজের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর অসহায়ত্ব, নারীর পরিস্থিতির শিকার হওয়া এবং সমাজের দেওয়া বাঁধনে আবদ্ধ থাকার দিকটি তুলে ধরে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনচেতা হলেও, পুরুষের প্রতি প্রেম-আবেগ তার সকল সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। লাবণ্যর এই দ্বিধাগ্রস্ততা ও প্রেম দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দিকটি বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দোটানায় পড়া', 'মনের অস্থিরতা', 'সিদ্ধান্তহীনতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে লাবণ্য এমন একটি মেয়ে, যে তার হৃদয়ের গভীরের অনুভূতিকে একেবারে গোপনে লুকিয়ে রাখতে জানে। তাই তার শেষ চিঠিতে লাবণ্য লিখেছেন:

> ওগো তুমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান, তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান, গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। হে বন্ধু, বিদায়।

রবীন্দ্রনাথ নারীর মানবিক গুণাবলীকে উদ্‌যাপন করলেও, এখানে নারীর আত্মত্যাগী ভূমিকার প্রতি তাঁর একধরনের রোমান্টিক অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে নারীরা প্রায়শই নিপীড়িত, আত্মনিবেদিত এবং ত্যাগের প্রতীক। 'দেবদাস' উপন্যাসে পার্বতী চরিত্রটি প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ এবং প্রিয়জনের প্রত্যাখ্যানের পর আজীবন দুঃখবরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পার্বতী দেবদাসের প্রতি গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক প্রথা ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেবদাসের প্রত্যাখ্যান মেনে নেয় এবং আজীবন দুঃখ বয়ে বেড়ায়। শরৎচন্দ্র এখানে 'সহিষ্ণুতা', 'ত্যাগ' ও 'নিঃস্বার্থ প্রেম'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করে পার্বতীর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরদিকে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ী সমাজের অবজ্ঞা ও নিন্দার শিকার। উদাহরণস্বরূপ, উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র কিরণময়ীর আত্মত্যাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে, শরৎচন্দ্র 'অসহায়', 'নিঃস্ব', 'বিধ্বস্ত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তার দুঃখ ও কষ্টের গভীরতা প্রকাশ করে। আবার 'আত্মত্যাগ', 'সহনশীলতা', 'মেনে নেওয়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে শরৎচন্দ্র নারীর এই কষ্টকর অবস্থানকে মহিমান্বিত করেছেন। একই সাথে, এই শব্দগুলো পরোক্ষভাবে সেই সময়ের সমাজে নারীর দুর্বল অবস্থান এবং পুরুষের কর্তৃত্বকেও নির্দেশ করে। উপন্যাসের একটি অংশে কিরণময়ী বলছেন, "আমি তো কারো মন্দ করিনি, তবু কেন সবাই আমার শত্রু?" এই উক্তিটি তার অসহায়ত্ব এবং সমাজের অবিচারের শিকার হওয়ার চিত্র তুলে ধরে। অন্য একটি অংশে, কিরণময়ী যখন

তার কষ্টের কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমার এই দুঃখের কথা কি কেউ বুঝবে?" তখন তার এই উক্তিটি নারীর প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এই উক্তিটি নারীর প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করে তোলে। তাই বলা চলে শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলোর ভাষা ও চরিত্রায়ন নারীর আত্মত্যাগ ও সহনশীলতাকে মহিমামণ্ডিত করে, যা পরোক্ষভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রশ্ন না করে বরং নিরুত্তরভাবে মেনে নেওয়ার মনোভাবকে চিত্রিত করে।

বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়া ছিলেন এক অনন্য ব্যতিক্রম। তাঁর *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৫) ও *অবরোধবাসিনী* (১৯৩১) গ্রন্থে তিনি ভাষার মাধ্যমে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি নারীর জন্য নতুন এক জগৎ রচনার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যেখানে নারীরা হবে স্বাধীন, সক্রিয় এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন।  যেমন 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসে তিনি 'লেডি ল্যান্ড' নামে একটি কল্পনালোক তৈরি করেন, যেখানে নারীরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।  রোকেয়ার ভাষা ছিল প্রত্যক্ষ, সাহসী, বিদ্রোহী, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বাস্তবধর্মী। তিনি প্রচলিত ভাষার বাঁধ ভেঙে নারীর নিজস্ব ভাষা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, যা ছিল সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবী পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ,'অবরোধবাসিনী'তে তিনি লিখেছেন, "পুরুষেরা আমাদের অবরোধে রাখিয়া ভাবে, আমরা বুঝি বড় সুখে আছি। তাহাদের এই ভ্রম দূর করিতে হইবে।" এই একটি লাইন থেকেই বোঝা যায়, রোকেয়ার ভাষা কতটা স্পষ্ট এবং প্রতিবাদী ছিল। তিনি প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ভাষার কাঠামো ভেঙ্গে নারীর জন্য নতুন স্বপ্ন নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রচনায় নারীর সক্রিয়তা, নেতৃত্ব এবং মুক্তির প্রয়াস স্পষ্টভাবে ভাষার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।

## আধুনিক সাহিত্য ও নারী ভাষার পরিবর্তন

সেলিনা হোসেন, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকেরা নারীর ভাষিক প্রতিনিধিত্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। এখানে নারী কেবল প্রেমিকা বা মা নয়, বরং নাগরিক, কর্মী ও প্রতিবাদী সত্তা হিসেবেও ভাষার মাধ্যমে নিজের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাসে নারী সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার স্বর ধারণ করে। মুনতাসীর মামুন তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাজে (যেমন: 'মুক্তিযুদ্ধকোষ', 'গণহত্যা ১৯৭১: বিশ্ব সিভিল সমাজের প্রতিবাদ' ইত্যাদি) নারীদের বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিশেষভাবে নারীদের সাহস, ত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সংগঠক হিসেবে দেখেছেন। আধুনিক সাহিত্যে ভাষার মাধ্যমে নারীর নতুন স্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে নারী কেবল অবলা নয়, বরং সংগ্রামী এবং আত্মপ্রত্যয়ী। তবে এখনো বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তন জরুরি।

হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় নারীবাদের আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। যেখানে তিনি পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেন এবং নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তবে এই হুমায়ুন আজাদ তাঁর এক উপন্যাসে লেখেন:

> আমি বলি, "কিন্তু তুমি পীড়ন (রেইপ) উপভোগ করলে কেন?"
> ফিরোজা বলে, "মনে হলো প্রতিরোধ করতে যেহেতু পারবো না তখন উপভোগ করাই ভালো।"

যা পুরুষতান্ত্রিক বচনের প্রতিধ্বনি। এটা যেন নারীর উদ্দেশ্যে পুরুষতন্ত্রের সেই জগৎ বিখ্যাত বাণী, "ধর্ষণ যদি অনিবার্য হয় তো উপভোগ করুন।"

অপরদিকে তসলিমা নাসরিন নারীবাদী হিসেবে সমাদৃত। তিনি তার উপন্যাস 'শোধ' এ নায়িকা ঝুমুরের অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে:

> আফজাল (সম্পর্কে দেবর) আমাকে যখনই স্পর্শ করে চোখ বুজে অনুভব করি আমি এক সেতার, স্পর্শ মাত্র বেজে উঠছি নানান সুরে।
> সিদ্ধান্ত নিয়েছি আফজালের বীর্যে আমি বীর্যবান হবো।

এখানে পুরুষ সকল ক্ষেত্রে দাতা এবং নারী গ্রহীতা। পুরুষতন্ত্র নারীকে করে তুলেছে যৌন যন্ত্র, পুরুষকে করেছে যন্ত্রী। অর্থাৎ যন্ত্রিপুরুষের স্পর্শে নারী যন্ত্রকে বেজে উঠতে হয় নানান সুরে। পুরুষতন্ত্রের ভাষায় পুরুষ হচ্ছে আনন্দ দাতা আর নারী হচ্ছে আনন্দ গ্রহীতা।

নব্য আধুনিক সাহিত্যে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এখনও নারীর মূল পরিচয় মমতা, প্রেম অথবা আত্মত্যাগের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ নারী চরিত্রের পেশাগত, ব্যক্তিত্বগত বা মননশীল দিকগুলি এখনো যথাযথভাবে উঠে আসছে না। Pierre Bourdieu (১৯৯১) তাঁর Language and Szmbolic Power গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ভাষা প্রতীকী ক্ষমতার বাহক, যা সামাজিক শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করে। নারীর প্রতি ব্যবহৃত ভাষা তাদের সামাজিক ভূমিকার সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে। যেমন নারী গৃহকেন্দ্রিক, ভোগ্য, সংবেদনশীল। অপরদিকে পুরুষ কর্মঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, নেতৃত্বসুলভ। এই ধরনের ভাষাগত নির্মাণ নারীর কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে ভাষা কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বাস্তবতা নির্মাণেরও সহায়ক হয়ে ওঠে।

### ভাষায় পুরুষতন্ত্রের প্রকাশ

বিশ শতকের ষাটের দশকে নারী মুক্তি আন্দোলনের সুবাদে পুরুষতন্ত্র প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রত্যয়টিতে সাধারণভাবে নারীর প্রতি পুরুষের নেতিবাচক

মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। পুরুষতন্ত্রের নিরাপদ আবাসস্থল হচ্ছে মানুষের মনোজগৎ। কেননা পুরুষতন্ত্র এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যা পুরুষকে নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবতে শেখায় (সেলিম, ১৯৯৫)। আর লিঙ্গ নির্বিশেষে এই শিখনের ক্রিয়াটি চলে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিকীকরণ ও লিঙ্গায়ন এর মাধ্যমে। ভাষায় পুরুষতন্ত্রের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে; যেমন শব্দচয়নে, খিস্তি-খেউরে, প্রবাদ-প্রবচনে। নিম্নে তার বর্ণনা হাজির করা হলোঃ

**শব্দভান্ডারে নারীর অবমাননা ও সংকীর্ণতা**

ভাষার শব্দভান্ডার আমাদের সমাজের মনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি। সমাজে নারীর প্রতি যে মনোভাব প্রচলিত, ভাষার শব্দচয়নে তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলাভাষায় নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে ব্যবহৃত হয় এমন অনেক শব্দ- যেমন 'রাঁড়', 'পিছলা', 'চরিত্রহীন', 'বেঈমান'। এই শব্দগুলোর অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত এবং অপমানজনক অর্থ বহন করে (Bandopadhyay, 2015)। ভাষার এই অবমাননাকর শব্দসমূহ কেবল ব্যক্তি নয়, গোটা নারী সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবকে প্রকাশ করে।

বাংলা ভাষায় নারীবিষয়ক বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর অর্থ নেতিবাচক বা সীমিত। যেমনঃ 'অবলা' (দুর্বল, অসহায়), 'লজ্জাবতী' (বিনয়ী, মুখচোরা), 'পতিতা' (পতিত, সামাজিকভাবে হেয়), 'পরিত্যক্তা' (স্বামী কর্তৃক বর্জিত নারী) ইত্যাদি। এসব শব্দ নারীর সামাজিক অবস্থানের দুর্বলতা এবং নির্ভরশীলতার চিহ্ন বহন করে। অন্যদিকে পুরুষদের জন্য শব্দ যেমন 'নেতা', 'যোদ্ধা', 'প্রভু', 'পিতা' এ শব্দগুলো শক্তি, কর্তৃত্ব এবং সম্মানের প্রতীক (রুহানি, ২০১৩)।

গবেষণায় প্রতিপন্ন হয় যে, নারীসংক্রান্ত শব্দাবলি অধিকাংশ সময় দুর্বলতা, নির্ভরতাবোধ বা সামাজিক অবনমনের সাথে যুক্ত। Deborah Cameron (1992) বলেন, "Language both reflects and reinforces cultural attitudes," অর্থাৎ ভাষা যেমন বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবিম্ব, তেমনি তা সামাজিক বাস্তবতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। বাংলা ভাষার শব্দচয়নও নারীর প্রতি অবমূল্যায়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থায়ী করেছে। Julia Penelope (1990) উল্লেখ করেন, "Language m irrors the value system of a culture and often reinforces it." বাংলার নারীবিষয়ক শব্দভান্ডার এই মূল্যবোধের প্রতিফলন যা নারীকে দুর্বল ও অপ্রেরণাদায়ক অবস্থানে আবদ্ধ করে।

বাংলা অভিধানে 'নারী' ও 'মহিলা' শব্দের সংজ্ঞায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকেন্দ্রিক শুদ্ধ অর্থ প্রাধান্য পেলেও সামাজিক ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ধারণা হিসেবে 'নারী' শব্দটির অর্থে সতীত্বের ভূমিকা সংযোজিত হলেও 'মহিলা' শব্দটির ব্যবহারে তুলনামূলক

ঢিলা, নম্র মনোভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় (হোসেন, ২০২৪)। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে দুটি শব্দের উপর বিতর্ক কেবল ভাষাতত্ত্ব নয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে একথা স্পষ্ট যে ভাষাগত শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমেই সমাজ নারীর চিত্র আঁকে।

সুকুমার সেন বলেছিলেন, "নারীর শব্দভান্ডার পুরুষের শব্দভান্ডার থেকে খুবই আলাদা।" এর কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই পরিচালিত হয় পুরুষতন্ত্র দিয়ে। কিছু কিছু শব্দ আছে, তা শুধুই নারীর জন্য। যেমন অসতী, পতিতা, বাঈজি, শাঁখিনী, এয়ো এ শব্দগুলোর কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই। আবার কিছু কিছু শব্দ অত্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক। যেমন কর্তা, মুরুব্বি ইত্যাদি। 'কর্তা' বলতে পরিবারের প্রধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়, যা সাধারণত পুরুষ হয়ে থাকেন। অপরদিকে 'মুরুব্বি' শব্দটি দ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে বোঝানো হয়, যিনি সমাজে সম্মানিত ও প্রভাবশালী। আবার প্রবচনেও পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন "বাপ কা বেটা সিপাহ কা ঘোড়া কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।" অর্থাৎ সন্তান যতই স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন হোক না কেন পিতার গুণ কিছু হলেও সন্তানের মধ্যে বর্তাবে। এই প্রবচনের মধ্য দিয়ে পুরো সুনাম বা খ্যাতি চলে যায় বাবার কাছে। মানে ছেলে ভাল কিছু করলে তখন সে হয় বাবার ছেলে। আর খারাপ করলে হয় মায়ের মতো; যেমন- "চোরের মায়ের বড়ো গলা।"

বাংলা ভাষার গবেষক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধে কিছু শব্দের উল্লেখ করেছেন যা থেকে পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়। যেমনঃ অনাছিষ্টি, লক্ষ্মীছাড়া, আটকুঁড়ো, আড়ি, আদিখ্যেতা, কটুনী, খোঁটা, গাদী, গুমর, গা, ছিরি, ঠমক, ঢঙ, দেমাক, ন্যাকা, পোয়াতি, বিয়েন, বেহায়া, কুট্টি, মিনসে, রাঁড়, রাঁড়ী, সেয়ানা, সোমত্ত, সোহাগ, সই ইত্যাদি। নারীর ক্ষেত্রে বাংলায় বিশেষ্য বাক্যাংশ এবং ক্রিয়া বাক্যাংশ প্রয়োগে কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ করেন। যেমন বিশেষ্য বাক্যাংশ কাঁচা বয়স, ননীর পুতুল, মাথার দিব্যি, পেটের ছেলে, কচি খুকি, নাড়ির টান, দাঁতের বিষ, কোলের ছেলে, চোখের বালি, রাঙা বৌ, হাঁড়ির খবর, পাতা কুড়নী, ঝগড়াটে, সাতে পাঁচে না থাকা, সাত পাঁচ ভাবা ইত্যাদি। ক্রিয়া বাক্যাংশ যেমন ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা, বানের জলে ভেসে আসা, বিয়ের ফুল ফোটা, মুখে খই ফোটা, হাঁড়িতে স্থান দেয়া, কেঁদে হাট বসানো, সইপাতানো, পাকা চুলে সিঁদুর পরা, হাঁড়ি ঠেলা, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, মাথা কোটা ইত্যাদি। এই শব্দগুলোতে সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা যেমন আইন, শিক্ষা, সরকারি নীতিমালা ইত্যাদিতে পুরুষকে 'ডিফল্ট' বা প্রাথমিক রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষায় অধিকাংশ আইনগত দলিলে 'ব্যক্তি' বলতে পুরুষকে বোঝানো হয়, নারীকে

আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই ভাষিক বিন্যাস Foucault (১৯৭৬) এর "Power/ Know ledge" ধারণার সাথে মিলে যায়, যেখানে ভাষা সামাজিক ক্ষমতার একটি প্রধান বাহন। এই ধরনের ভাষিক অভ্যাস নারীর সামাজিক অদৃশ্যতাকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিকে স্বাভাবিক ও অদৃশ্য রাখে।

পুরুষের জন্য প্রশংসাসূচক শব্দগুলো হচ্ছে- শৌর্য বীর্যের অধিকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বলবান। আর নারীর প্রশংসায়- মিতভাষিণী, সুহাসিনী, পতিপরায়ণা, সুদর্শনা ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ নারী হবে দুর্বল। নারীরা সারাক্ষণ চোখের জল ফেলবে, পুরুষের কথা মতো কাজ করবে, সংসার সামলাবে আর বাচ্চা জন্ম দেবে- এসব অর্থেই নারীর প্রশংসাসূচক শব্দগুলো এমন হয়েছে।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ হয়রানিমূলক কথা, গালি কিংবা শব্দ সাধারণত নারীকে অবমাননা কিংবা হয়রানি করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। তিরস্কারমূলক নারীবাচক অনেক শব্দের বিপরীতে পুরুষবাচক কোনো শব্দের অস্তিত্বই নেই। 'মুখরা', 'ঝগড়াটে', 'মাল', 'বন্ধ্যা', 'পোড়ামুখী'র মতো শব্দগুলোর বিপরীতে পুরুষবাচক শব্দ খুঁজে পাওয়া ভার। অন্যদিকে, 'ডাইনি', 'ছিনাল', 'খানকি', 'কুটনি'র মতো শব্দগুলো সব সময় নারীকে নেতিবাচকভাবে বর্ণনা করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঘটনার সঙ্গে নারীর ন্যূনতম সম্পর্ক না থাকলেও তাঁকে হেয় করে 'জন্ম নেওয়া' গালি ব্যবহৃত হতে থাকে বিনা সংকোচে যুগের পর যুগ। বাংলা ভাষার অধিকাংশ বাংলা গালিগালাজ নারীকেন্দ্রিক এবং নারীর শরীর ও যৌনতা অবমাননার মাধ্যমে নির্মিত, যা নারীর সম্মানহানি এবং সামাজিকভাবে তাকে হেয় করার সাংস্কৃতিক কৌশল। যেমন 'কুলটা', 'বেশ্যা', 'মাগি' ইত্যাদি শব্দ নারীর যৌন আচরণকে কেন্দ্র করে সামাজিক নিন্দা আরোপ করে। এসব গালি নারীকে অবমাননার প্রতীকী অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পুরুষকে গালি দেওয়া হয় তার সকল নারী আত্মীয়দের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়ে, কিংবা তাদের যৌনাঙ্গ নিয়ে অথবা তার জন্মপরিচয় নিয়ে গালির ক্ষেত্রে সব সময় তার মায়ের চরিত্র পরিণত হয় আক্রমণের লক্ষ্যে (ইসলাম ও ফেরদৌস, ২০০১)। ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুকুমার সেন এই ধরনের গালিকে "ইতর শব্দ" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন- যেগুলো সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সামাজিক হীনমন্যতা থেকে উৎসারিত (স্নিগ্ধা, ২০২১)। গালি শুধু ব্যক্তিগত অশোভন ভাষা নয়, বরং তা সমাজ স্বীকৃত মানসিকতা, প্রথা ও ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিফলন। এভাবে গালির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করে।

গালি দেওয়া অর্থে যে শব্দের ব্যবহার করা হয় সেখানেও পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিফলিত হয়। 'নটী' শব্দটি গালি দেওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। অথচ নটীর বিপরীতে আছে নট। নট গালি দিতে ব্যবহার করা হয় না। নৃত্য যার উপজীবিকা তাকে বলা হয়

নর্তকী। ছেলের পেশা নৃত্য হলে সেটির কোনো নাম নেই। পূর্বপুরুষ নামের একটি শব্দ থাকলেও পূর্বনারী বলে অভিধানে কোনো শব্দ নেই। তার মানে হলো, বংশের ধারক বাহক কেবল পুরুষরাই হবে। নারীর কোনো স্থান নেই সেখানে। স্বামী মারা গেলে মেয়েদের বলা হয় বিধবা আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে বিপত্নীক বা বিধুর হিসেবে ডাকা হয়। বিধবা নারী মানে অমঙ্গল, অকল্যাণ; কিন্তু বিপত্নীক পুরুষ মানে কিন্তু তা নয়। এজন্য বিয়ে কিংবা কোনো শুভ কাজের ক্ষেত্রে বিধবা নারীর উপস্থিতিকে ঝামেলা মনে করা হলেও বিপত্নীক পুরুষকে ঝামেলা মনে করা হয় না। অর্থাৎ শব্দভান্ডারে শব্দ থাকলেও তার প্রয়োগ এবং ব্যবহারে আধিপত্যশীল মনোভাব প্রকাশ পায়।

ইভটিজিং নামে নারীকে 'উত্ত্যক্ত' করার এবং বিরক্ত করার পারিভাষিক শব্দ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য, ফল, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, এই সব বিষয়কে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয় নারীকে ভাষিক নিপীড়ন করার জন্য। যেমন 'রসে ভরা কমলা', 'টাইট মাল', 'কচি ডাব', 'এটম বোম', 'মিষ্টি তেঁতুল', 'টসটসে মাল', 'পাকা পেয়ারা', 'তানপুরা', 'গাড়ির চেসিস', 'ডবল ডেকার', 'গোলাপ জাম', 'কোম্পানির মাল', 'মাগির গ্যারেজ বড়', 'কালনাগিনী', 'কাশবন', 'কচিমাল', 'ইন্ডিয়া গেট', 'জাম্বুরা', 'গোলাপি আপেল' ইত্যাদি। উপর্যুক্ত শব্দগুলো নারীকে উত্ত্যক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হলেও নারীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সাদৃশ্য করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। সেই উপস্থাপন যৌনতা, কামুকতা ও নোংরামিতে ভরপুর। "ইভটিজিং শব্দাবলি" দেখিয়ে দেয় কীভাবে খাদ্য, বস্তু বা সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে নারীকে লজ্জিত করা হয়। পুরুষকে কখনো এই ধরনের তির্যক পরিভাষায় সমালোচিত হতে হয় না (Coates, 1996)। নারীবাদী ভাষাতত্ত্ব অনুসারে এই সব অভিসম্প্রকাশ পুরুষতান্ত্রিক ভার্চুয়ালিস্ট ধারণার অংশ; ভাষার মাধ্যমে ক্রমাগত নারীকে অদৃশ্য করে রাখার প্রচেষ্টা (Butler, 1990; Cameron, 2003)। বাংলার ব্যবহারিক শাখায় এখনও এইসব ভাষিক ব্যবহারকে সামাজিক আচরণ মনে করা হয়, যা ভাষার গোপন ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। মনে রাখতে হবে, নারীর প্রতি অসংবেদনশীল শব্দের ব্যবহার নারীর অগ্রযাত্রাকে অনেকখানি থামিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, অসম্মানজনক ভাষার ব্যবহার নারীর আত্মবিশ্বাসকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলা ভাষা ও নারী বিষয়ে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন জানান, "বাংলা ভাষার শব্দ প্রয়োগে ও সম্বোধনে নারীকে সম্মানিত তো নয়ই বরং হেয় করা হয়েছে।" বাংলা ভাষায় এমন অজস্র শব্দ আছে, যা আবহমান কাল থেকে খুব অন্যায়ভাবে নারীর পরিচিতি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে (রুহানি, ২০১৩)। যেমন মানুষ (Man) শব্দটি দ্বারা নারী পুরুষ সকল মানুষকে বোঝায়; কিন্তু মহিলা (Women) শব্দটি কেবল মহিলা বা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অভিধান খুললেই দেখা যাবে সেখানে পুরুষবাচক আর স্ত্রীবাচক শব্দের অর্থ উপস্থাপনার মধ্যে কত পার্থক্য। বাংলা অভিধানে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দের উপস্থাপনে কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়। যা লিঙ্গীয় সমতা ও সামাজিক ন্যায়

বিচার পরিপন্থি। এই বৈষম্য মূলত শব্দচয়ন, লিঙ্গান্তর এবং ক্ষেত্র বিশেষে শব্দের প্রয়োগে পরিলক্ষিত হয়। নারীর প্রতি মানবিক সম্মানবোধের ধারণাটি পর্যন্ত আমরা সমাজে স্থাপন করতে পারিনি। তাই জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার মানসিকতাও আমাদের তৈরি হয়নি।

ধর্মীয় মতাদর্শের ভাষাও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণের পক্ষপাতী। ইসলামিক মাহফিলে কিছু প্রচলিত বক্তব্য প্রায় শোনা যায়। যেমন: স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত; নারীর কাজ হচ্ছে তার স্বামীকে খুশি রাখা; নিজের সতীত্বকে স্বামীর কাছে অর্পণ করা ইত্যাদি। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 'কথামৃত' গ্রন্থে সন্তান বলতে কেবল পুত্রকে বোঝানো হয়েছে। কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যেমন: "মাতৃভক্তি হয় অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি ততো।" "পিতায় শ্রদ্ধা ও মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্যপ্রাণ।" ধর্মগ্রন্থ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, "ধর্মগ্রন্থেও বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে নারীকে ছোটো করা হয়েছে।" রামায়ণে রামচন্দ্র বলেছেন, "দেশে দেশে গেলে সীতা পাব, কিন্তু লক্ষ্মণ পাব না।" অর্থাৎ যেকোনো দেশে সীতার মতো অনেক স্ত্রী পাওয়া যায়, কিন্তু লক্ষ্মণের মতো ভাই পাওয়া যায় না।

ভাষার মাধ্যমে নারীর অধীনতার প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। নারী সংক্রান্ত শব্দসমষ্টির মধ্যে অধিকাংশই নেতিবাচক, অবমূল্যায়নমূলক বা অবমাননাকর অর্থ বহন করে। তাই গবেষক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫) বলেন, "ভাষা হলো সমাজের মনস্তত্ত্বের দর্পণ। সমাজ নারীকে যেভাবে দেখে, ভাষায়ও তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।"

### কথ্য ভাষায় নারী নির্মাণ

কথ্য ভাষা নারীর সামাজিক নির্মাণের প্রধান মাধ্যমগুলির একটি। এখানেও নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন, অধঃস্তন রাখার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কিছু প্রচলিত কথ্য ভাষা যেমন "মেয়েদের তো এমনই হয়", "নারী জাতির বিশ্বাস নেই" এজাতীয় বাক্য নারীকে অবিশ্বস্ত ও দুর্বল চরিত্রের প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করে। অন্যদিকে, পুরুষদের উদ্দেশে ব্যবহৃত ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্মান, শক্তি এবং নিরপেক্ষতা প্রকাশ পায়। যেমন, "পুরুষের কথা একবার", "ছেলেরাই পারে" এ জাতীয় বাক্যগুলিতে পুরুষের কর্তৃত্বকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়। Deborah Cameron (1992) বলেন, "Language is the site where the politics of gender are played out most intimately." বাংলার কথ্য ভাষার এই রূপ নারীর অধীনতার সামাজিকীকরণকে সুসংহত করে।

ভাষা শারীরিক না হওয়া সত্ত্বেও এর মাধ্যমে সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটি রূপরেখা তৈরি করে। বাংলায় কথোপকথনে দেখা যায় নারীরা গোপন গল্প, অনুভূতি বিনিময়, ভ্রাতৃত্ব বোধ বাড়াতে চায়, তাই তারা বেশি সক্রিয় শ্রোতা হয় এবং সহানুভূতিশীল

বাক্যগঠন করে। Tannen (1990)-এর দেওয়া কথনসূত্র অনুসারে "Women seek human connection, whereas men are concerned mainly with status"। বাংলায় ভাষান্তর করলে এর সারমর্ম দাঁড়ায়: নারীরা আবেগ ও সম্পর্কের প্রতিফলন দিয়ে কথোপকথন স্থাপন করে, পুরুষরা মর্যাদার ওপর গুরুত্ব দেয়।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কথোপকথনে পুরুষরা সরাসরি কথ্য দায়ভার নিতে চান, আর নারীরা সম্পর্কীয় সংকেত দ্বারা কথোপকথন গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, নারীরা প্রায়ই বাক্য শেষে 'না?', 'ঠিক তো?' জাতীয় যুগ্মপ্রশ্ন (tag question) ব্যবহার করে, যা আলোচনাকে নমনীয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ রাখে। Lakoff (1975) উল্লেখ করেছিলেন যে নারীদের বাক্যে হেজ বা অনিশ্চিততা সূচক শব্দের (যেমন মনে হয়, মনে করেন, আসলে, বোধহয় ইত্যাদি) ব্যবহার বেশি থাকে। কথোপকথনের ক্ষেত্রে এসব পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ গোলযোগের কারণ হয় (Tannen, 1990)। অর্থাৎ ভিন্ন জেন্ডারলেক্টের অধীন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মানচিত্র নিয়ে আগাতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুরুষ সামাজিক মর্যাদা নিয়ে সচেতন তাই কথোপকথনে 'অফিস', 'কাজ', 'ক্ষমতা' ইত্যাদি শব্দ বেশি আসে। অপরদিকে নারীদের কথোপকথনে ভালোবাসা, সম্পর্ক বা সমবেদনা প্রসঙ্গে বেশি দেখা যায়।

### প্রবাদ-প্রবচনে নারী

প্রবাদ ও প্রবচন আমাদের সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত সামাজিক মূল্যবোধের পরিচায়ক। বহু প্রচলিত বাংলা প্রবচন নারীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রচার করে। যেমন:

> "নারী জাতি বিষের ফোঁটা।" "নারীর পায়ে স্বর্গ, মাথায় সর্বনাশ।" "পুরুষ রাগলে হয় বাদশা, নারী রাগলে হয় বেশ্যা।" "নাও, ঘোড়া, নারী, যে চরে তারই।" "লজ্জা নারীর ভূষণ।" "পুরুষের বল টাকা, নারীর বল শাঁখা।" "সতী নারী গঙ্গা জল, অসৎ নারী বদ্ধ জল।" "সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে, রমনী সুন্দর হয় সতীত্ব রক্ষণে।" "পতি বিনে গতি নেই।" "রান্ধিয়া বাড়িয়া যেই নারী পতির আগে খায়, সেই নারীর বাড়িতে শিগ্‌গির অলক্ষ্মী হামায়।" "মরদের জিদে বাদশা মেয়ের জিদে বেশ্যা।" "পুরুষের বল টাকা নারীর বল শাঁখা।" "অতি বড়ো ঘরনী না পায় ঘর, অতি বড়ো সুন্দরী না পায় বর।" "খানকি, তার আবার মান কী?" এই প্রবাদগুলো আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। সবগুলো প্রবাদেই নারীকে চরমভাবে অপমান করা হয়েছে। এই ধরনের প্রবচন সমাজে নারীকে একদিকে কোমল, অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক বা ছলনাময়ী রূপে উপস্থাপন করে।

প্রবাদ-প্রবচনে নারীর অবমাননা প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, পুরুষ মারা গেলে শোক প্রকাশ করার মানুষের অভাব হয় না। যেমন, মাছের মায়ের পুত্রশোক। আর নারী মারা গেলে সেটা সৌভাগ্য মনে করা হয়। এই ভাবনা থেকে প্রবাদ এসেছে,

অভাগার গরু মরে, ভাগ্যবানের বৌ মরে। একটি জাতি গরুর চেয়েও নিজের স্ত্রীকে তুচ্ছ মনে করে। এর ফলে ভাষার মাধ্যমে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। উধষব Spender (1980) তাঁর *Man Made Language* গ্রন্থে যুক্তি দেন, প্রবচন ও প্রবাদ হলো ভাষাগত নিয়মের অংশ, যা পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

শামসুজ্জামান খান প্রবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন, কোনো কোনো প্রবাদে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নির্যাতন বা অবদমনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। যেমন "মাগ জব্দ কিলে/হলুদ জব্দ শিলে।" একটি প্রবাদ বা পুরুষ প্রতাপের বচন। এতে ক্ষমতাবান পুরুষদের হেজিমনিক বা আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। ক্ষমতাবান পুরুষ নারীকে কী দৃষ্টিতে দেখে এই বচনে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবাদ সমাজে নারীর অবস্থানের যে বাস্তব চিত্র উন্মোচন করে তা প্রায় ক্রীতদাসীর মতোই।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তার দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে অবলোকন করে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে। এর কিছু নজির আমরা লক্ষ করব নিচের প্রবাদ প্রবচন গুলোতে:

> "স্ত্রীর দোষে পুরুষ নষ্ট, ভাত নাই যার ঘরে।" "গাইচ্ছা-মাগি গাছ বায়, নডি-মাগি তামুক খায়।" "পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই, তবে তার গুণ পাই।" " ছিনালের ভাইল রান্দে মোরগ কয় ডাইল।" "নষ্ট নারীর বড় গলা, শুনতে কান জ্বালা -পালা।"

লক্ষণীয় বিষয়ে এই যে প্রবাদ-প্রবচন গুলোতে নারীকে দেখা যায় ভিন্ন একটি প্রপঞ্চ হিসেবে। নারীকে একটি আলাদা সত্তা হিসেবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এর মাধ্যমে আমরা নারীকে নিয়ে ভাষাগত লিঙ্গীয় রাজনীতির স্পষ্ট এক চিত্র দেখতে পাই। প্রবাদ-প্রবচন আমাদের সমাজে সৃষ্টি হলেও তার রচিত হয়েছে মূলত পুরুষের পরিচর্যায়। তাই প্রবাদগুলোতে দেখা যাচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতামূলক উক্তির ব্যবহার; যেখানে প্রায়শ নারী অধস্তনতা ও অবজ্ঞার স্বীকার। প্রবাদ-প্রবচন সমূহ প্রায় সব সময়ই নারীকে দোষারোপ করা হয়েছে। সেখানে একজন নারী চরণদাসী, কলঙ্কিনী, অসতী, বেহায়া। সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকাকে প্রবাদ-প্রবচনে পদে পদে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, বোধ নেই, নেই কোনো পছন্দ-অপছন্দ। নারীর গুণ, শিক্ষা, বিবেক, ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার ও অবদমিত করতে পুরুষরা যুগযুগ ধরে যাকে নিপীড়ন করেছে ও নিপীড়নমূলক বাণী শুনিয়েছে। নারীর কোনো ভাষা নেই, পুরুষের চয়ন করা ভাষাই যেন নারীর ভাষা।

তাই Foucault (১৯৭২) ভাষায় বলতে হয় সামাজিক এই ডিসকোর্সগুলো একটি "regime of truth" তৈরি করে। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে এমন একটি বাস্তবতা নির্মাণ করা

হয়, যা সময়ের সাথে ‘স্বাভাবিক’ ও ‘অবশ্য স্বীকার্য’ বলে মনে হয়। বাংলা প্রবচনসমূহ নারীর বিরুদ্ধে এমনই এক বাস্তবতাকেই  নির্মাণ করে।

**পাঠ্যপুস্তকে লিঙ্গবৈষম্য ও ভাষার ভূমিকা**

শিক্ষা হলো সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের প্রধান ক্ষেত্র। আর পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার অন্যতম বাহক হিসেবে কাজ করে; অথচ এই পাঠ্যপুস্তকসমূহে নারীর প্রতিফলন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে পুরুষ চরিত্রকে নেতা, বিজ্ঞানী, সৈনিক রূপে এবং নারী চরিত্রকে মা, শিক্ষক, গৃহিণী ইত্যাদি ভূমিকায় চিত্রিত করা হয়। পাঠ্যবইয়ের গল্প, কবিতা ও উদাহরণে পুরুষকেন্দ্রিক ভাষার আধিক্য বিদ্যমান। নারীর কর্মজীবন বা স্বাধীনতার প্রসঙ্গগুলো অপেক্ষাকৃত কম বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রতি ১০টি পুরুষ চরিত্রের বিপরীতে নারীর উপস্থিতি মাত্র ৩টিতে (Ahmed, 2010)। গবেষণাটি বেশ পুরোনো তাই হাল আমলের গবেষণায় যেতে চাই এবং দেখতে চাই পরিবর্তন কোন দিকে আগাচ্ছে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী। তারা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ২৫টি বইয়ের মোট ৩৪৬৪ পৃষ্ঠা বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণার কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে উল্লেখ করতে চাই:

- বিভিন্ন টেক্সটের মাঝে ছবি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর ছবি একেবারেই প্রাধান্য পায়নি। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বইয়ে যেসব ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তার সবই ছেলেদের ছবি।

- মমতাময়ী চরিত্র মানেই সর্বদা নারীকে চিত্রায়িত করা হয়েছে আর পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একজন পুরুষ। বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আর্থিক লেনদেন বা ক্রেতার ছবি হিসেবে পুরুষকেই দেখানো হয়েছে।

- ছেলের কাজ মানেই কঠিন ও বাইরের কাজ আর মেয়ের কাজ মানেই কম পরিশ্রমের ও ঘরের কাজ দেখানো হয়েছে। পুরুষকে রোগী এবং নারীকে সেবিকা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞানের অথিউরিটি মানেই পুরুষকে দেখানো হয়েছে, এক্ষেত্রে নারীর উপস্থাপন একেবারেই দুর্বল (নাসরিন, ২০১৭)।

এই গবেষণার ফলাফলে আরও দেখা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের অনেক বইয়ে মেয়েদের নামের আগে ‘মিসেস’ ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নারীর স্বতন্ত্রতা হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন তাকে বলা হচ্ছে মিসেস মাসুদ। অর্থ্যাৎ স্বামীর পরিচয়ে নারী পরিচিত

হবে। আবার পাঠ্যপুস্তকের অনেক জায়গায় মহিলা শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে না। মহিলা অর্থ 'যে মহলে থাকে'। এই ধরনের শব্দগুলো পাঠ্যপুস্তকেই শিখছে শিশুরা (চক্রবর্তী, ২০১৮)। পাঠ্যপুস্তকে এই ধরনের উপস্থাপন লিঙ্গীয় বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করার পাটাতন হিসেবে কাজ করবে। কেননা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু এই পাঠ্যপুস্তকগুলোই শিক্ষার্থীদের জেন্ডার সংবেদনশীল করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হতে পারতো।

শিশুরা শৈশবে বড়োদের কাছ থেকে ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা শুনে বড়ো হয়। তারা এগুলোর মাধ্যমে শেখে শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন। এগুলোর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তাদের মূল্যবোধ। আর তার মধ্য দিয়েই একটু একটু করে কেউ পুরুষ, কেউ নারী হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত এখানে চলে আসে Sim one de Beauvoir-এর বহুল পরিচিত একটি মন্তব্য, "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, ক্রমে নারী হয়ে ওঠে।" বাংলাদেশের অনেক পাঠ্যপুস্তকে এখনোও উদাহরণ দেওয়া হয়: "রাহিম স্কুলে যায়, সে লেখাপড়া করে; রাহিমার কাজ রান্না করা এবং ভাইয়ের যত্ন নেওয়া।" এই ধরনের পাঠ্যবস্তুর মাধ্যমে ভাষাগতভাবে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা শিশুদের মনোজগতে স্থাপন করা হয়। যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক এই ভাষা সামাজিক ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি (Bourdieu, 1991)। ভাষার এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নারীর প্রান্তিক অবস্থানকে বৈধতা দেয় এবং পুরুষতন্ত্রকে সাংগঠনিকভাবে পাকাপোক্ত করে।

### গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিসরে নারীর ভাষা ও উপস্থাপন

গণমাধ্যম-বিশেষ করে সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সিনেমা এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-সমাজে ভাষার সবচেয়ে দ্রুতগতির এবং ব্যাপক বিস্তার সম্পন্ন বাহক। কিন্তু গণমাধ্যমের ভাষায় নারীর উপস্থাপন প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়। যেমন নারী চরিত্রের অতি সৌন্দর্যায়ন এবং ভোগ্যপণ্য হিসেবে চিত্রায়ণ। নারী বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনে সম্পর্ক, সৌন্দর্য ও পারিবারিক ভূমিকার ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পেশাগত সাফল্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে কৃতিত্বমূলক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পুরুষের ক্ষেত্রে 'দক্ষতা', নারীর ক্ষেত্রে 'সৌন্দর্য ও স্মার্টনেসকে' উল্লেখ করতে দেখা যায়। Tuchman (1978) তার 'Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, গণমাধ্যম নারীদের হয় অদৃশ্য করে, নয়তো বিকৃত করে তুলে ধরে। এটি ভাষাগত এবং চিত্রগত উভয় স্তরেই ঘটে বলে তিনি মনে করেন।

বাংলা গণমাধ্যমে বিশেষ করে টেলিভিশন ধারাবাহিকে এবং চলচ্চিত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব অধিকাংশ সময় গৃহকেন্দ্রিক, আবেগপ্রবণ এবং পুরুষকেন্দ্রিক সম্পর্কের

নির্ভরশীল রূপে নির্মিত হয়। নারীকে হয় মা, স্ত্রী অথবা প্রেমিকা হিসেবে দেখা হয়। নারীকে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা হিসেবে খুব কমই চিত্রিত করা হয়। বর্তমান বাংলা গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও, মূলধারায় নারী এখনও প্রধানত আবেগপ্রবণ, পরিবারের জন্য আত্মত্যাগকারী, অথবা পুরুষের প্রেমিকা চরিত্রেই বেশি দৃশ্যমান। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে ৭২% ক্ষেত্রে নারীকে গৃহস্থালি পণ্যের প্রচারক হিসেবে দেখানো হয় এবং কেবলমাত্র ১৪% ক্ষেত্রে পেশাগত সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় (Rahman, 2018)। এই প্রতিনিধিত্ব Butler (1990)-এর পারফরমেটিভিটি ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে ভাষা ও চিত্রের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় প্রতিনিয়ত নির্মিত হয়। যদি নারীর পরিচয় সবসময় আবেগ ও গৃহকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকে, তাহলে সামাজিক বাস্তবতাও তদনুযায়ী গঠিত হয়।

ভাষা ও সাংস্কৃতিক চিত্রায়ণের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিত্বে যে সংকট দেখা দেয় তা কয়েকটি প্রধান মাত্রায় বিবেচিত হতে পারে। যেমন:

ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বাধীন পরিচয়ের অভাব: নারীকে প্রথাগত ভূমিকার বাইরে চিত্রিত না করার প্রবণতা।

ক্ষমতা প্রদর্শনের অভাব: নারীর নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার দিকগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না।

স্টেরিওটাইপের পুনরুৎপাদন: প্রচলিত সামাজিক ধারণাগুলোকেই ভাষা ও চিত্রের মাধ্যমে বারবার নতুন করে পুনঃনির্মাণ করা হয়। এই সংকট, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে এবং নারীর সামাজিক মুক্তির পথে বড়ো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সীমা চৌধুরী (২০০৩) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, মিডিয়া ভাষার মাধ্যমে আদর্শ নারী'র একটি ছাঁচ তৈরি করে, যেখানে নারীর সৌন্দর্য, আনুগত্য এবং আত্মত্যাগকেই প্রধান গুণ হিসেবে প্রচার করা হয়। এর ফলে নারীদের আত্মপরিচয় বিকশিত হওয়ার সুযোগ সংকুচিত হয়।

ভাষার প্রমিত রূপের অন্যতম মূল বাহন হলো গণমাধ্যম। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত নারী বিষয়ক সংবাদের ভাষা নিয়ে নানা সময়ে প্রতিবাদ জানানো হলেও এখনও জেন্ডার সংবেদনশীল ভাষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। নিপীড়নের সংবাদে যে ভাষার ব্যবহার করা হয়, তা নারীর জন্য অবমাননাকর। যেমন নিপীড়ক ব্যক্তি যিনি কথায় বা ইশারা ইঙ্গিতে বা গায়ে হাত দিয়ে কিংবা ধর্ষণের মাধ্যমে নারীকে যৌন হয়রানি করেন, তার পরিচয় হিসেবে সংবাদ মাধ্যমগুলো বিশেষণবাচক শব্দ হিসেবে 'বখাটে' ব্যবহার করে। কিন্তু যিনি যৌন নির্যাতনের শিকার– তাকে বলা হয় শ্লীলতাহানির শিকার। পুরুষতান্ত্রিক মাধ্যমে অন্যান্য সংবাদের মতো নারীর ওপর নিপীড়নের সংবাদও একটি

পুরুষতান্ত্রিক পণ্য। তাই নারীকে নিয়ে যেকোনো সংবাদ লেখার সময় তার নামের আগে বিভিন্ন বিশেষণবাচক শব্দ যুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন সুন্দরী, কিশোরী, চরিত্রহীনা, সম্মানহানি, সম্ভ্রমহানি, পতিতা ইত্যকার শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহার আমরা প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমগুলোতে দেখতে পাই।

অপরদিকে বিজ্ঞাপন হলো একটি একমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোনো পণ্য বা সেবার প্রতি উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের একক প্রচেষ্টাকে বলা চলে বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্যোক্তার দ্বারা অর্থের বিনিময়ে ধারণা, মতাদর্শ, পণ্য বা সেবার নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা ও বিক্রয় প্রচেষ্টাই বিজ্ঞাপন (McGregor, 1973)। এখন বিজ্ঞাপন শুধু ভোগবাদী জীবন প্রতিষ্ঠার পণ্যমহড়া নয়, বিজ্ঞাপন এখন পণ্যসংস্কৃতি চর্চার আহ্বানকারী (হক, ২০১১)। এক্ষেত্রে McChesney (2001) বলেন, জনগণ পছন্দ করুক বা না করুক কর্পোরেট গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যায়নের কার্পেট-বোমা ফেলছে। অন্যদিকে Chom sky (1996) বলেন, গণমাধ্যমসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট অডিয়েন্সকে বিক্রি করা।

বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গবেষণা থেকে জানা যায়, বিজ্ঞাপনের দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে রয়েছে। প্রথমত হচ্ছে দর্শক-ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আসল বিষয় হচ্ছে বিক্রয়োন্নয়ন অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে মুনাফা অর্জন (McLuhan 1965)। রেডিও বিজ্ঞাপনের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, গৃহস্থালির পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭%, অন্যদিকে পুরুষের অবস্থান ছিল মাত্র ২০.৫%। তাছাড়া অন্যান্য (গৃহের বাইরে) বিজ্ঞাপনে নারীর অবস্থান ছিল মাত্র ৪৩%, যেখানে পুরুষের অবস্থান ছিল ৭৯.৫%। এছাড়াও বিজ্ঞাপনে নারীকে গতানুগতিকভাবে ছাঁচীকরণ করা হয়েছে (POP, 2000)।

বিজ্ঞাপনগুলোর ভাষা নারী-পুরুষের চরিত্রের উপস্থাপন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে নারীকে রূপ সচেতন, সৌন্দর্য পিয়াসী, ন্যাকামিপ্রিয়, কূটচরিত্রের অধিকারী, অক্ষম, দুর্বল, নির্ভরশীল, ঘরকুনো, লাজুক, অসহায় ও যৌনবস্তু হিসেবে ফ্রেমিং করা হয়। অন্যদিকে পুরুষকে সাহসী, কর্মঠ, মেধাবী, কর্মব্যস্ত, শক্তিশালী এবং বাহির্মুখি হিসেবে উপস্থাপন করা হয় (Barbeito & Fajula, 2010)। এভাবে নারীকে ভোগ্য ও সুন্দর পণ্য হিসেবে ভাষায় ও চিত্রে প্রতিষ্ঠা করা একটি সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল (Wolf, 1991) । তাই Judith Butler (1990)-এর কথার সাথে তাল মিলিয়ে বলতে হয়, লিঙ্গ একটি পারফরমেটিভ ঘটনা, যা ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি হয়। যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা নারীর অবস্থানকে সর্বদা নির্ভরশীল রূপে চিত্রিত করে, তবে তা লিঙ্গীয় অসমতাকে আরও দৃঢ় করবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমানে ভাষা ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পান।

নতুন শব্দ ও বাক্যের ধরন তৈরি করার মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভাষার ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভাষার নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে, যেখানে নারীর কণ্ঠ কিছুটা স্বাধীন হলেও, নারীর প্রতি ভাষাগত সহিংসতা, ট্রলিং, হয়রানি এবং অবমাননা বহুলভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীবাদী পোস্টগুলির নিচে কটু মন্তব্য, নারী ইউজারদের ভাষার মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া এবং ট্রল ও সাইবার বুলিংয়ে নারী-নির্দেশিত লিঙ্গভিত্তিক ভাষার ব্যবহার। Pew Research Center (2017)-এর জরিপ অনুযায়ী, নারী ইউজারদের প্রায় ৬৪% ইন্টারনেটে লিঙ্গভিত্তিক হয়রানির শিকার হন। পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন বিভাগের তথ্য মতে ২০২০ সালের ১৬ই নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৪ হাজার ৯৫৮ জন নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাষাগত হয়রানির শিকার হয়ে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন বিভাগে অভিযোগ করেন (তালুকদার, ২০২৩)।

ভাষা কেবল ভাবপ্রকাশের মাধ্যম নয়; ভাষা সামাজিক বাস্তবতার অন্যতম নির্মাতা। Michel Foucault (1972) তাঁর “Discourse” তত্ত্বে দেখান, ভাষার মধ্য দিয়ে ‘সত্য’ নির্মিত হয় এবং সমাজে নির্দিষ্ট জ্ঞান ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার এই নির্মাণশক্তি বিশেষভাবে নারীর পরিচয় ও অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Stuart Hall (1997) উল্লেখ করেন, “Representation” হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে ভাষা ও চিত্র ব্যবহার করে বাস্তবতার ধারণা নির্মাণ করা হয়। নারীর সম্পর্কে সমাজ যে ধারণা বহন করে, তা ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মাধ্যমে সংহত হয় এবং বৈধতা লাভ করে। অতএব বলা যায়, নারীর ব্যক্তি পরিচিতি, নারীর সামাজিক পরিচিতি, নারীর সামাজিক অবস্থান এর সবকিছুই সামাজিক নির্মাণের অংশ। আর গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিসরগুলো তাদের ভাষা ও উপস্থাপনার দ্বারা নারীর পরিচিতিকে নির্মাণ করে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও শিক্ষার একটি বৃহৎ অংশই এখন মানুষ গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিসরগুলো থেকে পায়। বহুধা বিস্তারের ফলে এই সমস্ত মাধ্যমগুলো এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক বাস্তবতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত গঠনে এবং তার বাস্তবায়নে এই পরিসরগুলোর ভূমিকা অসামান্য। নারী-পুরুষের বৈষম্য (বিশেষ করে ভাষাগত বৈষম্য) দূরীকরণে ও সমতামূলক সমাজ গঠনের বার্তার প্রসারে এই গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিসরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাই সমাজ, রাষ্ট্র তথা অন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারী ও পুরুষের ভারসাম্যময় উপস্থিতির জন্য গণমাধ্যম ও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক পরিসরগুলোতে নারীর ইতিবাচক প্রতিচ্ছবি একান্ত জরুরি।

## উপসংহার

ভাষা মানব সমাজের এক মৌলিক শক্তি, যা কেবল ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, বরং সমাজের গঠন, মানসিকতা ও ক্ষমতার সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। ইতিহাসের ধারায় ভাষা পুরুষতন্ত্রের এক নীরব সহচর হিসেবে কাজ করেছে। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, সাহিত্যিক উপস্থাপনা এবং সামাজিক কথাবার্তায় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা ও সংহত হয়েছে। নারীকে ভাষার মধ্যেই 'অপর', 'অবলা', কিংবা 'নিম্নতর' রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, যাতে সমাজের মূল শক্তির কেন্দ্র বরাবর পুরুষই অবস্থান করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও এই বৈষম্যমূলক ধারা সুস্পষ্ট। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য, রবীন্দ্রনাথের মৃদু পরিবর্তন, শরৎচন্দ্রের করুণা-আচ্ছন্ন নারী চিত্র এবং বেগম রোকেয়ার মুক্তির আহ্বান; সব কিছুই আমাদের ভাষাগত ইতিহাসের স্তরীভূত চিত্র তুলে ধরে। আধুনিক সাহিত্য ও গণমাধ্যমে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান হলেও পুরোনো পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ছায়া এখনো দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান।

ভাষা পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়, কারণ এটি কেবল শব্দের পরিবর্তন নয়, বরং চিন্তাভাবনার পরিবর্তন দাবি করে। তবুও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সচেতনতা ও সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাষার পরিবর্তন সম্ভব। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ভাষায় নারীবাদী ভাষা আন্দোলন তার প্রমাণ রেখেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, সাহিত্য এবং সরকারি ভাষায় লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা আনার প্রয়াসকে গতিশীল করতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতিনির্ধারণ এবং ব্যক্তিগত সচেতনতা–এই চারটি স্তম্ভের উপর ভর করে ভাষার লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার রাস্তা নির্মাণ করা সম্ভব। ভাষার গঠন ও ব্যবহারে পরিবর্তন আনা গেলে সমাজেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এজন্য চাই সচেতনতা, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃঢ় প্রচেষ্টা। ভাষার গঠন ও ব্যবহারের পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তবে এখানে বলে রাখা ভালো গবেষণা প্রবন্ধটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনাভিত্তিক হওয়ায় ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা ও দ্বান্দ্বিকতা বিশ্লেষণের সুযোগ এখানে সীমিত ছিল। এই বিষয়ে পরবর্তীতে আরো বৃহৎ পরিসরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। পরিশেষে নোয়াম চমস্কির থেকে ধার করে বলি ভাষা মানুষের আচরণের অন্তর্গত বিষয় নয় বরং ভাষা মানুষের সহজাত সক্ষমতার অংশ। একে জটিল কুটিল করে হীন স্বার্থে ব্যবহার এর সত্যিকারের সহজাত বিকাশকে প্রতিরোধ করে। পুরুষতন্ত্র, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বলয় থেকে ভাষা মুক্ত হলে ভাষার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

## তথ্য-নির্দেশ

ইসলাম, স. ন., ও ফেরদৌস, স.। (২০০০)। *চর্চা: নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধ সংকলন* (জ. আহমেদ ও ম. চৌধুরী, সম্পা.). নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

খান, হো. আ. (১৯৯৫)। বাংলা কাব্যে নারী। হোসনে আরা খান ও সোহরাব আলী খান আরজু (সম্পা.), *নারী-পুরুষ সম্পর্ক* । ঊষা প্রকাশনী।

চৌধুরী, ম., ও আহমেদ, র. (২০০৩)। *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ*। একুশে প্রকাশনী।

সেলিম, ফ. র. (১৯৯৫)। মনোজগতে পুরুষতন্ত্র। হোসনে আরা খান ও সোহরাব আলী খান আরজু (সম্পা.), *নারী-পুরুষ সম্পর্ক* । ঊষা প্রকাশনী।

হক, ফ. (২০১১)। *সম্মতি উৎপাদন: গণমাধ্যম-বিষয়ক-প্রতিভাবনা*। সংহতি প্রকাশনী।

হক, ফ. (২০০৬)। *মিডিয়া ও নারী*। স্টেপস্টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট।

Ahmed, R. (2010). *Gender representation in secondary school textbooks in Bangladesh*. BRAC University.

Ahmed, S. (2010). *Gender representation in Bangladeshi school textbooks*. University of Dhaka Press.

Akhther, N. (2018). Gender framing of Bangladesh mass media advertisement: A content analysis. *Jahangirnagar University*. Bandopadhyay, S. (2015). *Narir bhasha o lingobhed* [নারীর ভাষা ও লিঙ্গভেদ]. Dey's Publishing.

Bandopadhyay, S. (2015). Bhashar andhar: Narir abomanana [ভাষার অন্ধকার: নারীর অবমাননা]. Kolkata University Press.

Borker, R. (1980). *Anthropological contributions to the study of language and gender*. In S. McConnell-Ginet, R. Borker, & N. Furman (Eds.), Women and language in literature and society (pp. 26–42). Praeger.

Barbeito, ML, Fajula, A. (2010). Gender Role Stereotyping in radio advertisements: A Spanish case. Paper presented at the World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES). Serial panel: Communication. Cooperation and Human Development in the Mediterranean Region. Bauman, R. (1997). *Verbal art as performance*. Prospect Heights: Waveland Press.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press.

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Cameron, D. (1992). *Feminism and linguistic theory* (2nd ed.). Macmillan.

Cameron, D. (2003). Gender and language ideologies. In J. Holmes & M. Meyerhoff (Eds.), *The handbook of language and gender* (pp. 447–467). Blackwell.

Chowdhury, S. (2003). *Gender representation in media: A Bangladeshi perspective*. University of Dhaka.

Chomsky, N. (1996). *Powers and prospects: Reflections on human nature and the social order*. South End Press.

Coates, J. (1996). *Women talk: Conversation between women friends*. Blackwell.

Crosby, F. J., & Nyquist, L. (1977). The female register: An empirical study of Lakoff's hypotheses. *Language in Society*, *6*(3), 313–322. https://doi.org/10.1017/S0047404500005021

Daly, M. (1978). *Gyn/Ecology: The metaethics of radical feminism*. Beacon Press.

Engels, F. (1884). *The origin of the family, private property and the state* (E. B. Aveling, Trans.). Progress Publishers. (Original work published 1884)

Fairclough, N. (1989). *Language and power*. Longman.

Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books.

Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge and the discourse on language* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Pantheon Books.

Gilbert, S. M., & Gubar, S. (1979). *The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination*. Yale University Press.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

Hartmann, H. I. (1979). *The unhappy marriage of Marxism and feminism: Towards a more progressive union*. Capital & Class, *3*(2), 1–33.

Lakoff, R. (1975). *Language and woman's place*. Harper & Row.

Lerner, G. (1986). *The creation of patriarchy*. Oxford University Press.

Maltz, D. N., & Borker, R. A. (1982). A cultural approach to male–female miscommunication. *Language and Communication*, *2*(1), 1–16.

McChesney, R. W. (2001, March 1). Global Media, Neoliberalism, and Imperialism. *Monthly Review, 52*(10).

McGrego, E. (1973) *Advertising.* UK: The English University Press.Ltd.

Mills, S. (2004). *Gender and colonial space*. Manchester University Press.

Millett, K. (2000). *Sexual politics* (30th anniversary ed.). University of Illinois Press.

Mitchell, J. (1974). *Psychoanalysis and feminism*. Penguin Books.

Penelope, J. (1990). *Speaking freely: Unlearning the lies of the fathers' tongues*. Pergamon Press.

Rahman, M. (2018). Gender portrayal in Bangladeshi media advertisements: A critical discourse analysis. *Dhaka University Journal of Communication*, 23(1), 45–62.

Rahman, T. (2018). Gender representation in Bangladeshi television advertisements: A content analysis. *Dhaka University Journal of Communication*, 39(2), 45–63.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.

Sapir, E. (1929). The status of linguistics as a science. *Language*, 5(4), 207–214.

Smith, B. (2012). Language and gender identity: Power and politics in Bengali discourse. *Journal of South Asian Studies*, 28(3), 311–328.

Spender, D. (1980). *Man made language*. London: Routledge & Kegan Paul.

Stuart, H. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.

Tannen, D. (1990). *You just don't understand: Women and men in conversation*. Ballantine.

Tuchman, G. (1978). The symbolic annihilation of women by the mass media. In G. Tuchman, A. K. Daniels, & J. Benét (Eds.), *Hearth and home: Images of women in the mass media* (pp. 3–38). Oxford University Press.

United Nations. (2017). *Guidelines for gender-inclusive language in English*. United Nations Publications. https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/

Vasin, K. (1993). *Understanding cultural dynamics*. Academic Press.

Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Basil Blackwell.

Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (T. Parsons, Trans.). Free Press. (Original work published 1922)

Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf* (J. B. Carroll, Ed.). MIT Press.

Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, Trans.). Blackwell. *(Original work published posthumously)*

Wolf, N. (1991). *The beauty myth: How images of beauty are used against women*. Harper Perennial.

Ahammed, R. (2018, March 20). নারীর জন্য 'ভালো ভাষা'. উইমেন চ্যাপ্টার. https://womenchapter.com/views/26361

Banglay Pori. (2017, December 24). বাংলা ভাষাবিজ্ঞানিদের তালিকা. https://banglaypori.blogspot.com/2017/12/srchttpsonedrive.html?m=1

Chakrabarti, T.(2018, October 28).ভাষাও যখন নারীকে অবমাননা করে. *Sarabangla*. https://sarabangla.net/feature/post-160134/

Goutam. (n.d.). নারীর ভাষা বা ভাষায় নারীঃ ভাষাব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতীকায়ন. Somewhereinblog. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/goutamblog/28926442

Haq, B. (2017, January 29). বিজ্ঞাপন এবং নারী. বাংলা ট্রিবিউন. https://www.banglatribune.com/columns/177013/বিজ্ঞাপন-এবং-নারী

Iqbal, H. (২০১৫, ৭ ডিসেম্বর). ভাষিক নিপীড়ন ও নারী [Blog post]. Somewhere in… Blog. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/hasan_iqbal/30091797

Mondol, L. (2016, October 7). বাংলা ভাষা ও শব্দে পুরুষতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত প্রভাব. উইমেন চ্যাপ্টার. https://www.womenchapter.com/bangla-language-and-patriarchy-blogpost

Nashrin, S. (2017, January 3). লিঙ্গ বৈষম্য শেখানোর পাঠ্যপুস্তক. বাংলা ট্রিবিউন. https://www.banglatribune.com/columns/170183

Pieal, J. N. (2021, July 14). হোয়াট ইজ প্যাট্রিয়ার্কি: পুরুষতন্ত্রের সহজপাঠ. Roar evsjv. https://archive.roar.media/bangla/main/education/what-is-patriarchy

Rezwana, S. (2021, May 1). "মাগী মাইনষের কথা শোনাও যা, না শোনাও তা": ভাষার লিঙ্গীয় অসমতার একটি পাঠ. *Body Politics Magazine*. https://www.bodypolitics.com/issue-24/magi-mainsher-kotha-shonao

Ruhani, A. (2013, March 30). নারীর উপর ভাষিক আধিপত্যঃ পুরুষের পৌরুষত্ব প্রমাণের চেষ্টা. https://exampleblog.com/post/linguistic-domination-over-women

Shazia, F. (2017). নারীঃ পিতৃতন্ত্র ও পরবর্তী ফলাফলসমূহের প্রতিবিম্ব. *International Journal of Humanities & Social Science Studies*, *4*(1), 35–43. http://www.ijhsss.com

Talikdar, R. (2023, March 8). সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীরা কতটা নিরাপদ. বাংলা ট্রিবিউন. https://www.banglatribune.com/others/788706/সামাজিক-যোগাযোগমাধ্যমে-নারীরা-কতটা-নিরাপদ

# জেন-জি'র (Gen-Z) বাচনিক সত্তা: ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা

নাহিদা বেগম*

**Abstract:** This research presents a theoretical linguistic observation of Gen Z's communicative identity within the dynamic landscape of language use, analyzing their practices across various digital spaces. Their language often diverges from conventional grammatical norms, suggesting a natural linguistic evolution rather than decay. At the Phonological Level, Gen Z exhibits significant acoustic playfullness and sound experimentation, including sporadic and conditioned changes, and expressive lengthening to convey multi-layered emotions. The Morphological Level is defined by extensive lexical innovation, hybrid formations, reliance on English-based abbreviations, and the use of emojis as non-lexical shorthand. Syntactically, the language favors fragmentation and flexibility, prioritizing rapid communication and personal reflection over structured correctness. Finally, the Semantic Level demonstrates radical meaning reconstruction and shift, where established terms are given new metaphorical significance, creating a rich, polyphonic vocabulary that distinctly positions their generational identity and cultural stance. This study proposes these unique stylistic tendencies are key markers of language change in the digital era.

**মূলশব্দ (Keyword):** জেন জি (Gen Z), সমাজভাষাবিজ্ঞান (Socio-linguistics), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax), অর্থতত্ত্ব (Semantics), ডিজিটাল ভাষা চর্চা (Digital Language Practice)

* ড. নাহিদা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা, ইমেইল: nahid.oprotim13@gmail.com

## ভূমিকা

ভাষা একটি জীবন্ত এবং গতিশীল ব্যবস্থা, যা প্রজন্মগত পরিবর্তনের সঙ্গে নিরন্তর পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের সাম্প্রতিকতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হল জেন জি। 'Pew Research Center' ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের জেনারেশন জি (Generation Z or Gen Z) নামে অভিহিত করেছে (Dimock, 2019)। ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগে অভ্যস্ত এই প্রজন্ম প্রচলিত ভাষাগত মানদণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে সংক্ষিপ্ততা, সৃজনশীলতা এবং তাৎক্ষণিকতার উপর জোর দিয়েছে, যা তাদের ভাষাকে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং গোষ্ঠীগত পরিচয় ও সামাজিক অভিব্যক্তির একটি শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলেছে। নির্ভুল ব্যাকরণিক নিয়মের চেয়ে তারা তাদের ব্যবহৃত ভাষায় কার্যকরী ভাব প্রকাশের উপর গুরুত্ব দেয়, যা প্রবীণ সম্প্রদায়ের কাছে ভাষাজনিত অবক্ষয় বলে মনে হলেও বাস্তবে তা ভাষা-বিবর্তনেরই অংশ। এই গবেষণা জেন জি-এর ব্যবহৃত অনানুষ্ঠানিক কথ্যভঙ্গির ভাষারূপ কীভাবে তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় তৈরি করে বৈশ্বিক ভাষা কাঠামোয় প্রভাব ফেলছে, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

## সমস্যা শনাক্তকরণ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের ভাষাচর্চার অভিনব রূপ, সংক্ষিপ্ততা, ইমোজিভিত্তিক যোগাযোগ, প্রমিত ব্যাকরণ থেকে বিচ্যুতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হলেও এই ভাষার প্রায়োগিক ও কাঠামোভিত্তিক বিশ্লেষণ অপর্যাপ্ত; যা আছে তা মূলত পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেয় ফলে জেন জি কীভাবে বৈশ্বিক প্রবণতাগুলোকে স্থানীয় ভাষার নিদর্শনগুলোর সঙ্গে একীভূত করেছে, সে সম্পর্কে ধারণা সীমিত থেকে যায়।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

জেন জি-এর ভাষা কাঠামোর সাংগঠনিক রূপ; অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তনসমূহ বৈশ্বিক ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহারে কীরূপ প্রভাব ফেলেছে তা তত্ত্বীয় দিক থেকে যাচাই করে দেখা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

## পূর্ব-গবেষণা পর্যালোচনা

জেন জি-এর ভাষা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। *Journal of Applied Linguistics and Tesol – JALT* (2025) থেকে প্রকাশিত Saiyida Shahbano Jabeen ও Hafiz Imran Nawaz এর গবেষণায়  জেন জি-এর ভাষার শব্দ মিশ্রণ (Blending) ও নতুন প্রত্যয়ের (Affixation) আলোচনা এবং *Young*

*Journal of Social Sciences and Humanities* (2025)-এ প্রকাশিত জেন জি-এর ভাষার শব্দার্থগত পরিবর্তন (Semantic Shift) এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য Gretchen McCulloch এর *Because Internet: Understanding the new rules of language* এবং Sali A. Tagliamonte এর *Teen talk: The language of adolescents* বই দুটো; যেখানে জেন জি-এর ভাষার Typographical Tone ও Internet influence এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাইম ইউনিভার্সিটির গবেষক সায়েমা ইয়াসমিন (২০২৪) জেন জি-এর প্রজন্মগত পরিচিতি নির্ধারণকারী 'জার্গন' নিয়ে কাজ করেছেন। পূর্ব গবেষণার সূত্র ধরে এটি স্পষ্ট যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী জেন জি-এর ভাষা কাঠামোর যে অনানুষ্ঠানিক, সৃজনশীল এবং দ্রুত সম্প্রসারণের দিকটি চিহ্নিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের জেন জি-এর ভাষিক আচরণেও সক্রিয়।

### গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলা ভাষার বিবর্তনে জেন জি-এর ভাষা ব্যবহারের ধারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই গবেষণার মাধ্যমে জেন জি-এর ভাষার উদ্ভাবনী প্রবণতা, সংক্ষিপ্ততা, ব্যঞ্জনধর্মী প্রবণতা, দ্রুত প্রসারণশীল আচরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে যা জেন জি-এর ভাষা ও তাদের প্রজন্মগত পরিচিতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়ক হয়ে উঠবে।

### গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণায় মূলত চারটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রথমত, জেন জি-এর ভাষা ব্যবহারে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন, দ্বিত্বকরণ, বানানগত অস্বাভাবিকতা কীভাবে প্রচলিত লিখিত ও কথ্য ভাষার মানদণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে এবং অনলাইন যোগাযোগের সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করে? দ্বিতীয়ত, জেন জি-এর ভাষায় রূপতাত্ত্বিক উদ্ভাবন যেমন: মিশ্রণ, শব্দাংশ যোগ এবং সংক্ষেপণ প্রক্রিয়া কীভাবে ইংরেজি শব্দভান্ডারকে দ্রুত প্রসারিত করে? তৃতীয়ত, জেন জি-এর ভাষা ব্যবহারের অনানুষ্ঠানিকতা এবং সংক্ষিপ্ততার প্রতি অগ্রাধিকার কীভাবে প্রচলিত বাক্য গঠন কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে এটি যোগাযোগের কার্যকারিতাকে সংজ্ঞায়িত করে? চতুর্থত, ডিজিটাল যোগাযোগের প্রভাবে জেন জি-এর ব্যবহৃত স্ল্যাং শব্দগুলোতে অর্থের পরিবর্তন (Semantic Shift) কীভাবে ঘটে (যেমন: রূপকগত বিস্তার, অর্থের অবনতি, অর্থের উন্নতি, সংকোচন ও সম্প্রসারণ) এবং এটি জেন জি-এর সামাজিক অভিজ্ঞতা, পরিচয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে কীভাবে প্রতিফলিত করে?

## গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোটি রূপতাত্ত্বিক, ভাষাবৈজ্ঞানিক ও সমাজ ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য বিন্যাস-উপাদান তত্ত্ব (Item-and-Arrangement / IA) এবং প্রক্রিয়া-উপাদান তত্ত্ব (Item-and-Process / IP) ব্যবহার করা হবে। ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস ও ব্যাকরণিক সংগঠনের বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করা হবে। জেন জি-এর ভাষায় ডিজিটাল প্রভাব ও ভাষিক বিবর্তনে শ্রেণি, লিঙ্গ ও ক্ষমতার ভাষাকে সামাজিক ভাষাতত্ত্বের আলোকে আলোচনা করা হবে।

## গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method) অনুসরণ করে পাঠবিশ্লেষণ (Textual Analysis) প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসে (Primary sources) সামাজিক মাধ্যম কর্পাস (Social Media Corpus): Twitter, TikTok এবং Instagram এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে জেন জি-এর স্ল্যাং, আদ্যক্ষর, বানানগত পরিবর্তন এবং মিশ্রিত শব্দ নেওয়া হয়েছে। দ্বৈতয়িক বা মাধ্যমিক উৎসে (Secondary Sources) গবেষণাটির তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং তুলনামূলক আলোচনার জন্য ভাষাতাত্ত্বিকদের গুরুত্বপূর্ণ বই, প্রবন্ধ ও পূর্ববর্তী গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া জেন জি নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধগুলোও দ্বৈতয়িক সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধে চিত্রের মাধ্যমে যে মিমস, ফেসবুক পোস্ট ও হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিনশট ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রামাণ্য আইডি লিংক তথ্যসূত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে।

## গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা

জেন জি-এর ভাষা নানাদিক থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তাদের ভাষিক পরিবর্তন শুধুই প্রাকৃতিক ভাষাগত পরিবর্তন নয়, বরং এক সংস্কৃতি অভিমুখী পরিবর্তনও। তাদের ভাষিক আচরণ এমন একটি অনানুষ্ঠানিক দিক প্রকাশ করে, যা ভাষার প্রয়োজনানুগ ব্যবহারের সঙ্গে চিন্তা, সত্তা ও পরিচয় প্রকাশেরও সহায়ক। নিম্নে স্তরভিত্তিক আলোচনায় জেন জি-এর ভাষা-কাঠামোর বিভিন্ন বিচার্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলো:

### ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তর

ভাষার অর্থবোধক সংকেত শ্রোতার কাছে পৌঁছায় ধ্বনি-প্রবাহের মাধ্যমে। মূলত, "ভাষার বহিরঙ্গ গঠনটি ধ্বনিপ্রবাহ (Sound structure) দিয়ে গঠিত বলে ভাষার অন্তরঙ্গ দিকের সঙ্গে রয়েছে এর অর্থের (Semantic structure) যোগ" (রামেশ্বর, ২০১২: ১১১)। ভাষার ইতিহাস, পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় ধ্বনিতত্ত্ব ভাষার মূল সংগঠনকে একবারে

গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু জেনারেশন জি-এর ভাষিক যোগাযোগের সিংহভাগই লিখিত রূপে ঘটে বলে এর রূপতাত্ত্বিক (Morphological) বা শব্দতাত্ত্বিক (Semantic) স্তরের মতো ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরের (Phonological Level) পরিবর্তন তুলনামূলক কম; তবু জেন জি-এর লিখিত ভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের Typographical Tone of Voice এর সূক্ষ্ম পরিবর্তন আলোচনাযোগ্য।

যেহেতু জেন জি-এর স্ল্যাং প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া, টেক্সট মেসেজ ও চ্যাট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঘটে, তাই এখানে লিখিত রূপটিই ধ্বনির ভূমিকা পালন করে এবং সে রূপ প্রকাশিত হয় অতি সংক্ষেপে হোমোফোন (Homophone) আকারে।

> The tendency in text-messaging is towards the development of a highly abbreviated, phonetic style of writing, maximizing the use of space and minimizing the time taken to enter the data (David Crystal, 2001)

এই সংক্ষেপণে তারা “2” দিয়ে to/too, “4” দিয়ে for, “8” দিয়ে ate এবং “u” দিয়ে you বোঝায়।

সময় সাশ্রয় বা সংক্ষেপণের জন্য কখনো কখনো উচ্চারণিক বিপর্যয় ঘটে। যেমন: নোক্যাপ (No cap) প্রায়ই উচ্চারিত হয় ‘নোক্ক্যাপ’, সেম হেয়ার (same here) হয় ‘সেম্মিহার’ এবং ডেড ইনসাইড (Dead inside) হয় ‘ডেডিনসাইড’। ধ্বনিগত এরূপ অনানুষ্ঠানিক ভঙ্গির মধ্যে আরো কিছু শব্দ রয়েছে। যেমনঃ : Because এর “Cuz” হয়ে যাওয়া, Though এর “Tho” হয়ে যাওয়া এবং Want to এর “Wanna” হয়ে যাওয়া এই উদাহরণের মধ্যে পড়ে। রাহুল হাজারে এটিকে “less words and more communication” বলে উল্লেখ করেছেন (Rahul Hajare, 2023)।

জেন জি-এর ভাষায় নিয়ম ছাড়া ধ্বনির বিক্ষিপ্ত (Sporadic) পরিবর্তনে কখনো ধ্বনির সম্প্রসারণ ঘটে, কখনো সংকোচন ঘটে, কখনো মাঝের দু’একটি স্বরধ্বনি বদলে যায়। যেমন: ইংরেজি ‘Blood’ (রক্ত) শব্দটি ‘Blud’ (বন্ধুপ্রতিম), ‘Spitting’ (কফ নিক্ষেপ করা) শব্দটি ‘Spiting’ (আক্রোশভাব) ও ‘Facts’ শব্দটি ‘Faxx’ (জোর দিয়ে সত্য বলা) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা একটি মিমসের ছবি উপস্থাপন করা হলো। মিমসটি ২০২৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর Membrane পেজ থেকে আপলোড করা হয়।

চিত্র-১

😔👈 লাইফ একদম 🫠, খুব টায়ার্ড, নিড ☕🥺, তুই না থাকলে মুড = buffering 🔄💔। নিম্নে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত জেন জি-এর ভাষায় এরূপ ইমোজি সংমিশ্রণের একটি স্ক্রিনশট দেওয়া হলো। হোয়াটসঅ্যাপের এই বার্তালাপটি Jerin Tabassom নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট করা হয়। পোস্টকারী ব্যক্তিটি East West University-এর একজন শিক্ষার্থী।

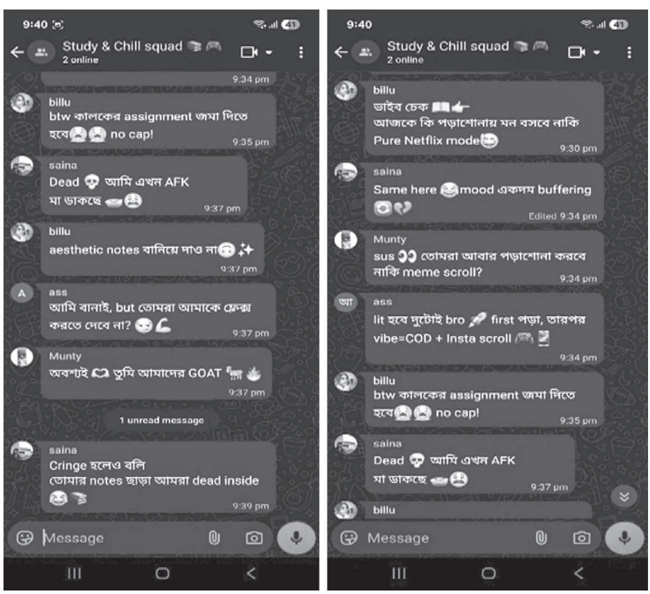


চিত্র-২

মূলত, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে জেন জি-এর ভাষার দ্বান্দ্বিক অবস্থান চলমান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বৈচিত্র্যও ভাষার প্রবাহরীতির একটি সাধারণ প্রবণতা। এদিক থেকে জেন জি-এর ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ রাখার অবকাশ থাকে না।

সংক্ষেপণ

শব্দের দৈর্ঘ্য হ্রাস করার জন্য একটি শব্দের এক বা একাধিক অংশ বাদ দেওয়া বা ছেঁটে ছোটো করে দেওয়াই ক্লিপিং। এটি মূলত "ভাষাগত অর্থনীতি" (Linguistic Economy) অর্জনের একটি কৌশল, যেখানে একটি শব্দকে ছেঁটে ছোটো করা হয় যাতে ব্যবহারকারী দ্রুত ও কার্যকরভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। মূলতঃ

> Clipping is highly productive in digital environments because of its inherent nature of reducing character count, a crucial feature in text-messaging and microblogging platforms (Crystal, 2011:198-212).

ভাষাতত্ত্ববিদরা ক্লিপিং-কে চারটি প্রধান প্রকারে ভাগ করেন, এবং জেন জি-এর ব্যবহারে প্রতিটি প্রকারই দেখা যায়ঃ অ্যাপোকোপ (Apocope/Back-Clipping): শব্দের শেষ অংশ বাদ দেওয়া। যেমনঃ Professor থেকে Prof, অ্যাফেরেসিস (Aphaeresis/Fore-Clipping): শব্দের প্রথম অংশ বাদ দেওয়া। যেমনঃ Telephone থেকে Phone, সিনকোপ (Syncope/Middle Clipping)ঃ মাঝের অংশ বাদ দেওয়া। যেমনঃ Thank you থেকে tnx, অ্যাপিকম্প্রেশন (Apicompression/Complex Clipping): উভয় অংশ বাদ দেওয়া। যেমনঃ Refrigeretor থেকে Fridge।

সংক্ষেপণে (Acronyms) আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে নতুন শব্দ হয়। নতুন যুগের স্বভাব অনুযায়ী জেন জি এই মিনিম্যালিস্টিক ভাষা ব্যবহার করে যেখানে বাক্যকে স্বল্প আকৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ দেয় যার অপর নাম Abbreviation। জেন জি-এর ব্যবহৃত অজস্র Acronyms/Abbreviation এর মধ্যে IDK (I dont know), OMG (Oh My God), BTW (By The Way), Lol (Laughing Out Loud), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এগুলো অহরহ ব্যবহৃত হয়। ভাষাগত এ সংকোচন শুধুমাত্র শব্দের আকৃতি হ্রাস করে এমন নয়, দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করে। তবে

> While abbreviations can save time and effort, our research suggests that they may also hinder effective communication and negatively influence interpersonal perceptions (Sample, 2024: 10).

ফলত কিছু ক্ষেত্রে এটি আন্তঃব্যক্তিক উপলব্ধিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং আন্তরিকতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।

**রূপান্তর**

রূপান্তর শব্দের অর্থ এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে স্থানান্তর। ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ নানা কারণে রূপান্তরিত হয়। জেন জি-এর ভাষায় এই রূপান্তর অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ প্রক্রিয়া; বিশেষ করে শব্দতাত্ত্বিক স্তরে। তারা তাদের ভাষা ব্যবহারে নিজস্ব সৃজনশীলতা ও রসবোধ বজায় রাখতে রূপতাত্ত্বিক উদ্ভাবনে প্রত্যয় যুক্তকরণ (Affixation), মিশ্রণ (Blending), সংক্ষেপণের (Clipping) মতো প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে শব্দার্থগত রূপান্তরে (Semantic Shifts) থাকে ভিন্ন পরিস্থিতি। কারণঃ

> These shifts are not merely linguistic trends but form part of a wider cultural adaptation in which language becomes a tool for redefining relationships, attitudes, and values in digital spaces (Sitohang & Damanik, 2025: 149).

ফলে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে জেন জি-এর ভাষা যে সংকুচিত, প্রসারিত ও দ্ব্যর্থকতার অভিমুখে পৌঁছায় তা সংজ্ঞায়নে রয়েছে বিচিত্র নাম। যেমনঃ পেজোরেশন (Pejoration); যাতে মূল শব্দকে খারাপ অর্থে রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। উদাহরণ Simp শব্দটি। "Simpleton" (বোকা) বা "Sympathy" (সহানুভূতি) থেকে আসতে পারে এ শব্দটি। কিন্তু বর্তমানে এটি সংকীর্ণ হয়ে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে প্রেমের মানুষের জন্য মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ বা আত্মসমর্পণ করে, যা প্রায়শই নেতিবাচক বা হাস্যকর বৈশিষ্ট্য বহন করে। এরপর আছে অ্যামেলিওরেশনও (Amelioration)। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে শব্দের মূল অর্থ রূপান্তরিত হয়ে পূর্বের চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠে। যেমনঃ Slay শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে 'মেরে ফেলা' বা 'ধ্বংস করা' বোঝাতো। কিন্তু বর্তমানে এটি জেন জি-এর ব্যবহারে অ্যামিলিওরেশন হয়ে অসাধারণ কিছু করা, অত্যন্ত ভালো পারফর্ম করা বা চমকপ্রদ দেখতে হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে-যা সর্বোচ্চ প্রশংসা বোঝায়। জেন জি-এর ভাষায় অর্থ রূপান্তরে রূপক প্রসারণ (Metaphorical Extension) ঘটে। যেমনঃ Healing শব্দটি 'সুস্থতা' বা 'আরোগ্য লাভ' থেকে রূপকভাবে প্রসারিত হয়ে মানসিক চাপ কমানোর জন্য ভ্রমণ বা বিশ্রাম অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থের সংকীর্ণকরণে (Narrowing) দেখা যায় Tea শব্দটি। মূলত এটি দ্বারা 'পানীয়' বোঝায়। কিন্তু জেন জি-এর ভাষায় বর্তমানে এটি সংকীর্ণ হয়ে গোপন বা আকর্ষণীয় তথ্য (গসিপ) হওয়া বোঝায়। সবশেষে বলা যায় বিস্তৃতকরণ (Broadening) প্রসঙ্গ। যেমনঃ Receh

শব্দটি; যা 'ক্ষুদ্র বা খুচরো পয়সা' বোঝাত কিন্তু এর অর্থ বিস্তৃত হয়ে জেন জি-এর ভাষায় এখন সহজ অথচ মজার কিছু বোঝায়।

ফরাসি দার্শনিক ও সমালোচক জাক দেরিদা ভাষার ক্ষেত্রে বলেছেন-ভাষাচিহ্ন কিংবা শব্দের বিপরীতে কোনো ধ্রুব অর্থ নেই, নেই কোনো ধ্রুব উপস্থিতির চিহ্ন। (উদ্ধৃত, পারভেজ, ফয়েজ, ২০২০: ৭৬)। জেন জি-এর  ভাষার জন্য এ উক্তি ধ্রুব সত্য। যেমন: ইংরেজি Cap (ক্যাপ) শব্দটি টুপি অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু জেন জি-এর কাছে No cap মানে সত্য বলা। অনুরূপ ইংরেজি Chop (চপ) শব্দটি যার অর্থ কেটে ফেলা বা টুকরো করা কিন্তু জেনারেশন জি এই শব্দটিকে ব্যবহার করে ব্যর্থ হওয়া অর্থে। আবার Paper শব্দটি দিয়ে যে কোনো কাগজ বা বিশেষ অর্থে খবরের কাগজ বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু জেন জি-এর কাছে পেপার শব্দটি টাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

**চিত্র-৩ :** এ ছবির প্রতিটি সদস্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী

জেন জি-এর এ স্বতন্ত্র উদ্ভাবিত শব্দসমৃদ্ধ ভাষারীতিকে পিজিন ভাষার সঙ্গেও তুলনা করা চলে। "পিজিন হলো এমন একটি ভাষা যার সংগঠন দুর্বল, শব্দ সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত এবং যারা এটি ব্যবহার করে তাদের কারোরই নিজস্ব ভাষা নয়।" (Pride, Janet, 1987: 142)। পিজিন যেমন কারো মাতৃভাষা নয় শুধুমাত্র সংযোগের ভাষা (contact language), জেন জি-এর ভাষাও মাতৃভাষার আওতাভুক্ত নয় বরং, স্বায়ত্তশাসিত বা স্বনির্ভর; যার সঙ্গে মিশে রয়েছে একটি Rule-governed creativity ও স্বতন্ত্র ভাষিক পরিকল্পনা। যার ফলে নির্দিষ্ট ব্যাকরণের নিয়ম (Rules) না মেনেও অসীম সংখ্যক নতুন শব্দ (Creativity) ব্যবহারে তারা সফল হয়ে উঠেছে। তাদের এ ধরনের ভাষা-পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সমালোচক জাহাঙ্গীর আলম জাহিদের মন্তব্য যথোপযুক্ত। তিনি বলেন:

> ভাষার এ ধরনের ব্যবহারের সাথে অসচেতন পরিকল্পনার কিংবা সচেতন পরিকল্পনার সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিক বাচনভঙ্গী ও রুচিবোধ এর মূলে অবস্থান করে। উল্লেখ্য যে, ভাষার সংগঠনগত ও ভাষা-সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনই ভাষা-পরিকল্পনার জন্য প্রযোজ্য (জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ, ২০০৬: ৪৮)।

জেন জি-এর এই ভাষাগত উদ্ভাবন কেবল শাব্দিক রূপান্তর নয়, বরং যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের আবেগপ্রবণতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। তাদের এই ভাষাভঙ্গি প্রথাগত ব্যাকরণের নিয়ম না মেনেও অসীম সৃজনশীলতার জন্ম দেয়; যা বাংলা ভাষার নতুন আঙ্গিক নির্মাণে ভূমিকা রাখে।

**বাক্যিক স্তর**

যেকোনো প্রজন্মের ভাষা অনুধাবনে বাক্যের প্রকাশরীতির নানা ভঙ্গি পর্যালোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বাক্য হলো শব্দের প্রতিসংযোগ, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োগের জটিল নেটওয়ার্ক, যা অভীষ্ট মনোভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। বাক্যের প্রথাগত ধারায় জেন জি-এর ব্যবহৃত বিবৃতিমূলক, আদেশমূলক, প্রশ্নবোধক, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাসূচক, বিস্ময়সূচক সবধরনের বাক্যেই সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় লক্ষগোচর হয়। কর্তা, ক্রিয়া, কর্মের অনিয়মিত বিন্যাস, ইংরেজিতে বাংলা লেখার মতো বাংলা অক্ষরে ইংরেজি শব্দ লেখা ইত্যাদি উল্লেখ করার মতো। তাদের প্রচলিত কিছু বাক্যের নমুনা: প্ল্যান রেডি, দারুণ! আবার বাস মিস করলাম। যাস কই? এই আউটফিট একদম মেইন ক্যারেক্টার ভাইব দিচ্ছে না ইত্যাদি। মূলত তাদের অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া ভঙ্গির বাক্য বেশিরভাগই একশব্দ নির্ভর। যেমন: সিরিয়াসলি! এবসলুটলিইইইই, ওএমজি। অস্তিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার বাক্যের মধ্যেই তাদের নিজস্ব আবেগ ও অনুভূতির অনুগামী অতিরিক্ত স্বরারোপ করার প্রবণতা থাকে। যেমন: ইয়েসসসসসসস, ওহ, নোওওওও। তাদের ব্যবহৃত এ সমস্ত বাক্যে

নাটকীয়তা, আবেগময়তা থাকলেও পূর্ণাঙ্গতা নেই। এই অপূর্ণতাকে যদি সার্থক বাক্যের গুণাগুণে পরিমাপ করা হয় তবে দেখা যায় তাদের ব্যবহৃত বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্যপদ শোনার যে আগ্রহ তা জাগ্রত থাকলেও আগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে না। এমনকি বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মাঝে অর্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস প্রয়োজন হয় তাদের বাচনরীতিতে তা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। একই সঙ্গে বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের অভাবও বাক্যগুলোকে সাধারণের বোধগম্যতায় আনে না। তবে জেন জি-এর ভাষা ব্যবহারে ব্যাকরণগত নিয়ম-কানুনের সঠিক ব্যবহারের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিফলন বেশি পরিলক্ষিত হয়; যাকে বাক্যের স্বেচ্ছাচারিতাও বলা যায়।

মিখাইল বাখতিন (Mikhail Bakhtin)-এর Heteroglossia ধারণার মধ্যেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে রয়েছে জেন জি-এর বাক্যিক শক্তি। বাখতিন বাচনের বহুরৈখিক অবস্থান দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোনো কথা আসলে একরৈখিক বা একক স্বরের নয়; বরং সেখানে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন শ্রেণি, বয়স, পেশা, সংস্কৃতি, সময় ও ক্ষমতার মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন স্বর। তাঁর মতে “There are no ‘neutral’ words and forms -words and forms that can belong to noone” (Bakhtin, 1981: 293)। সমাজ ভাষাবিজ্ঞান ভাষাব্যবহারকারীর এরূপ বিভিন্ন স্বর ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দান করে। যদি শ্রেণিগত ভাষা অবয়বের প্রসঙ্গ ধরা যায়, তবে এটা সুস্পষ্ট যে, সকল শ্রেণিরই রয়েছে স্বতন্ত্র বাক্যিক অভিধান। মূলত, “Linguistic variables correlate not with single social factors but with social class as a whole (Labov, 1996:129)। ফলে উচ্চবিত্ত সমাজে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের বাক্য যেখানে স্থির, মার্জিত এবং আনুষ্ঠানিক সেখানে জেন জি-এর ব্যবহৃত বাক্য ডিজিটাল চ্যাট, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাবে সংক্ষিপ্ত, মিশ্র, অনানুষ্ঠানিক এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক কথোপকথনে ব্যবহার করা তাদের দু’একটি বাক্যের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন: সমাজে বসবাসকারী ভিন্ন প্রজন্মের উচ্চবিত্ত শ্রেণি তাদের স্বাভাবিক কথায় যেখানে বলে ‘দুঃখিত, আগামী সপ্তাহ থাকতে পারছি না, দেশের বাইরে যাচ্ছি।’ সেখানে জেন জি বলে ‘পাসপোর্ট ready, Weekend এ বিদেশ যাচ্ছি, সো সরি।’ অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাধারণ মানুষ তুলনামূলকভাবে সরল, স্বাভাবিক এবং অনানুষ্ঠানিক বাক্য ব্যবহার করে, যেমন: ‘চল, হালকা নাস্তা করে আসি বা আজকে কাজের খুব চাপ।’ এরূপ বাক্যে জেন জি-এর মধ্যবিত্তের ব্যবহৃত বাক্য হয় এরূপ-‘চল, স্ন্যাকস খেতে যাই। ওয়ার্কিং স্ট্রেসে প্যানিকড হচ্ছি।’ নিম্নবিত্ত শ্রেণি সাধারণভাবে আঞ্চলিক ও আপ্তবাক্য দ্বারা প্রভাবিত। জেন জি-এর নিম্নবিত্তের অঙ্গভঙ্গিও কখনো কখনো বাক্যভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন: নিম্নবর্গের জেন জি-এর মধ্যে ‘middle finger’ প্রদর্শন এবং fuck you, whatever, go to hell বলার প্রবণতায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত।

প্রজন্মগত ভাষায় লিঙ্গভিত্তিক বাক্য ব্যবহারের প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য। স্বভাবতই নারী-পুরুষের বাচন আলাদা। Leonard Bloomfield বলেছেন- "Some exclamations, such as goodness gracious! or Dear me! are largely reserved for the woman" (Bloomfield, 1933: 46)। বাংলায় পুরুষের তুলনায় নারীদের এরূপ বিশেষণ, আশ্চর্যবোধক এবং জোর-সূচক শব্দের আধিক্যে বাক্য বলার মধ্যে রয়েছে 'ও মাগো মা', 'কী দারুণ!' 'যাহ দুষ্ট!' এরূপ। বাংলায় পুরুষের ভাষা হয় উচ্চকণ্ঠী, আঞ্চলিক প্রভাবাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল, যেমনঃ ওরে বাপরে, হায়রে হায়, কি ভয়ানক! কিন্তু জেন জি-এর ক্ষেত্রে নারীরা বলে 'হ্যাঁই, কত্ত কিউট!' 'সোওও ফানি' 'ট্রাই মারি', জোসস, সো এডোরেবল।' আর ছেলেরা বলে 'ক্রেজি বয়', 'ফ্লিক্সি টাইম', 'কপ করতে চাই' প্রভৃতি বাক্য।

পেশাগত ও প্রাত্যহিক জীবনের ভাষায়ও জেন জি-এর ব্যবহৃত বাক্যের এক বিশেষ ভঙ্গি রয়েছে। সাধারণত অফিস বা কর্পোরেট কাজের ক্ষেত্রে যেখানে ফরমাল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে জেন জি অনানুষ্ঠানিক ভাষায় ব্যবহার করে কর্পোরেট slang। যেমনঃ 'বস, updated report attach, pls check।' এছাড়াও তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষা অভিধানে 'কুল ম্যান', 'ইন্টারেস্টিং টপিক', 'ওয়াও লুকের' মতো Slang-ও থাকে। কর্মস্থলে তাদের এরূপ ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি অনুযায়ী কথা, অপভাষা ব্যবহারকে ভাষাবিজ্ঞানের 'রেজিস্টার' অভিধার সঙ্গে তুলনা চলে।

> রেজিস্টার হল সাধারণত টেকনিক্যাল ভাষা, বিশেষিত ভাষা (specialized language), অপভাষা (slang) অথবা বাণিজ্যিক ভাষা। তিনি আরো বলেন যে রেজিস্টার বিশেষ অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত-এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে প্রতিষ্ঠানের, কর্মক্ষেত্রের/পেশার অবস্থা, বিধিগত (formal) বা বিধিবাহ্য (informal) পরিস্থিতি অথবা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি (idiosyncrasies) (Dittmar, 1976 : 110)।

ভাষা অস্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ধরনের রাজনৈতিক ডিসকোর্স। "ভাষা-রাজনীতি (Politics of Language) ভাষাকে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে" (মনসুর, ১৯৮৫: ১)। মিশেল ফুঁকোর মত অনুযায়ী কথা বলার ধরনের (ডিসকোর্স) মাধ্যমে ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়।

> ফুকোঁ দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিরোধ বা বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ এটি কেবল রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু সমাজের প্রতিটি স্তরে চলা ক্ষমতাচর্চা এটি ঠেকাতে পারে না। তবে ফুকোঁ ডিসকোর্সকে প্রতিহত করার একটি উপায় বাতলে দিয়েছেন, আর তা হলো এর বিপরীত আরেকটি ডিসকোর্স তৈরি করা।

দৃশ্যত জেন জি-এর ভাষাভঙ্গি গাঠনিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হলেও কখনো কখনো দাবি আদায়ের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি বাংলাদেশের প্রসঙ্গে বলা হয়, তাহলে দেখা যায় ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে–'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার', 'নাটক কম কর পিও' প্রভৃতি বাক্য ভিন্নার্থক ব্যঞ্জনায় জেন জি-এর হ্যাশট্যাগ (#QuotaReform, #FairJobs) আন্দোলনকে বেগবান করেছে। সর্বোপরি, বাক্যতাত্ত্বিক দিক থেকে জেনারেশন জি-এর ভাষা হলো এক চলমান সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিফলন, যা প্রজন্ম, শ্রেণি, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রভাবে তৈরি হয়েছে; যার সংক্ষিপ্ত রূপ, ডিজিটাল Slang, রূপক এবং সামাজিক অর্থের পুনর্গঠন দিক বিবেচনায় এনে একে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে রূপ দিতে পারে।

**বাগার্থিক স্তর**

ভাষা কখনো স্থির নয়; বরং সময়, সমাজ, ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ভাষার অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ বাগার্থবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। বাগার্থবিজ্ঞান বা Semantics শব্দ ও বাক্যের অর্থবোধক বিশ্লেষণ করে ভাষার মূল উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষেত্রে কাজ করে। জেন জি-এর ভাষা প্রবণতাকে চমস্কির ভাষাদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ভাষার সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়েছেন। "তাঁর কাছে মানুষ যেন বাক্য উৎপাদনকারী যন্ত্র বিশেষ, সে সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টিক্ষম" (রফিকুল, ১৯৯২: ২৬)। চমস্কির মতবাদ অনুসারে ভাষা তৈরি হয় বহির্কাঠামো ও অন্তর্কাঠামোর সমন্বয়ে। জেন জি-এর তরুণ সম্প্রদায় ভাষার গভীর কাঠামো (Deep Structure) ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব হাইব্রিড ভাষা উৎপাদন করেছে। এ উৎপাদনে Syntactic playfulness-এর মাধ্যমে ভাষার নিয়ম ভাঙার কাজটি সুসম্পন্ন করেছে যা ভাষার নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনেরই অংশ। তাদের ভাষা পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে ফার্দিনান্দ দি সস্যুর (Ferdinand de Saussure) এর কালিক মতবাদটির কথাও বিবেচনা করা যায়। তিনি বলেন 'বর্তমানকালের সাংগঠনিক সংশ্রয় (Structural Systems) অতীতের ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে আলাদা করে দেখতে হবে। এক করে দেখলে চলবে না। দুয়ের মিলন কখনো সম্ভব নয়' (মৃণাল, ১৯৯৯: ১৭৮)

জেন জি-এর ভাষা এরূপ বহু অর্থবোধক বলে এই ভাষায় সমার্থক শব্দ ও সমোচ্চারিত শব্দের অভিধান সমৃদ্ধ। বহুবচনবাচক শব্দ তারা মূল শব্দের বাইরে গিয়ে ভিন্ন বাগার্থিক পরিসর ব্যবহার করে। যেমন: জামাকে 'আউটফিটস', বাড়িকে 'ক্রিবস', ফুলকে 'ব্লুমস', বন্ধুকে 'বেস্টিজ', মেয়েদের 'গার্লিজ', ছেলেদের-'ডুডস', ইত্যাদি বলে থাকে। তাদের শব্দতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ইংরেজির আধিক্য নতুন অর্থ সৃষ্টির প্রবণতায়

একদিকে ভাষার বহুস্বরযুক্ত (Polyphonic) চরিত্র স্পষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে বাংলা ভাষা কেবল টিকেই নেই বরং নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে প্রজন্মের হাত ধরে। তাদের ভাষায় বাংলা ও বিদেশাগত কিছু শব্দের সমার্থক প্রয়োগেও রয়েছে এরূপ অভিনবত্ব: জেন জি-এর যেমন: কথা-chat, convo, talk talk, মিথ্যা বলা-গল্প মারানো, ফেইক মারা, ভুল-fail, oopsie, mess up, mistake, হাসি-lol, haha, kek, বিরক্ত-meh, ugh, annoyed, দুর্বল dead inside, soft weak, সুন্দর–পুকি, কিউট, হট, হ্যান্ডসাম, সুন্দরী-baddie, slay, সময়-rn (right now), ASAP time, দুষ্ট-savage, bad, wild, naughty, গরম-spicy, lit hot, সত্য-facts, legit, real talk, truth, মনের কথা-feels, vibes, heart talk, feelings, বন্ধু-ফ্রেন্ড, দোস্ত, বেস্টি, ব্রো, বন্ধুদের দল-squad, gang, fam, আড্ডা-hangout, chill sesh, sesh gathering।

সমার্থক শব্দের মতো জেন জি-এর বিপরীতার্থক শব্দ ও বাগধারার ভান্ডারও সমৃদ্ধ। জেন জি-এর তাদের দৈনন্দিন কথায় যে সমস্ত বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে তা গঠনগত দিকের চেয়ে অর্থগত দিক থেকে নতুন। যেমন: তারা Cool (ঠান্ডা) এর বিপরীতে Hot (গরম) শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করে Dull (মলিন) শব্দটি। কারণ তারা cool শব্দটির মান ধরে আকর্ষণীয় হওয়া। আবার based শব্দটি দিয়ে নিচু বা অশালীনতা বোঝালেও জেন জি কারো সঙ্গে একমত পোষণ করলে বলে Based; মানে কথায় যুক্তি আছে বা ঠিক কথা। এর বিপরীত শব্দ হিসেবে তারা ব্যবহার করে Cringe ও Biased স্ল্যাং যা কোনোভাবেই প্রকৃত Based শব্দের সম্পূরক নয়। অন্যদিকে Energy শব্দটির বিপরীতে তারা ব্যবহার করে Boring যা বাংলা বা ইংরেজি রূপমূল অনুগামী অর্থবৈশিষ্ট্য দিয়ে নয় বরং উচ্চারণিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়ে স্বতন্ত্র অর্থ তৈরি করেছে। এরূপ আরো দুটি উদাহরণ, Low-key এবং High-key যা আভিধানিক না হলেও তাদের কাছে বিপরীতার্থক। Low-key বলতে খুব সূক্ষ্ম, অনেকটা গোপন কিছু বোঝায়। যেমন: ‘আমি লো-কি এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি। কাউকে বলিস না।’ অন্যদিকে কেউ অনেক উত্তেজিত হলে High-key শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণ- ‘হাই-কি, সিনেমাটা আসলেই অনেক ভয়ংকর ছিল’।

জেন জি-এর ভাষায় স্বেচ্ছাচারী অর্থ আরোপণ বাংলা ভাষার প্রচলিত বাক্য-সংক্ষেপণের রূপকেও নানাদিক থেকে পরিবর্তন করেছে। যেমন: GOAT (Greatest of all time)—যা ইংরেজি থেকে সরাসরি ধার নেয়া হয়েছে। শব্দটি গাঠনিক দিক থেকে ছাগল নামক প্রাণীকে বোঝালেও জেন জি ব্যবহার করে মহৎ ব্যক্তির প্রায়োগিক অর্থে। অনুরূপ TR শব্দটি ইন্টারনেটে HTML এর ক্ষেত্রে টেবল রো (Table Row) হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু জেন জি ব্যবহার করে Thats right হিসেবে। আবার IRL এটি ইংরেজি বাক্যাংশ ‘ইন রিয়েল লাইফ’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলা ভাষায় ‘বাস্তবিকতা’

বলতে যে অনুভূতি বোঝায়, IRL তা-ই প্রকাশ করে। জেন জি সাধারণত অনলাইন ও অফলাইন অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে এই শব্দের আশ্রয় নেয়। আবার OTP যা মূলত One Time Password বোঝায়, কিন্তু জেন জি-এর বাগার্থিক বৃত্তি অনুযায়ী One True Pair অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সংক্ষেপণটি তারা বলিউড চলচ্চিত্র তারকা রণবীর-আলিয়ার মানানসই জুটি অর্থে ব্যবহার করার পর থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জেন জি-এর ভাষায় নতুন নতুন শব্দের অর্থ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির কারণের মধ্যে মিডিয়ার বদৌলতে পাওয়া দেশ-বিদেশের কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। মূলত "নতুন শব্দভাণ্ডার সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবর্তন এবং বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে" (Zaraiskiy, 2019: 162)। উদাহরণস্বরূপঃ জেন জি বর্তমানে 'স্ট্যান' শব্দটি ব্যবহার করে। মূলত 'স্টকার' ও 'ফ্যান' এই দুই শব্দের মিশেলে তৈরি হয়েছে স্ট্যান শব্দটি। ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া শাহরুখ খানের 'ফ্যান' সিনেমার এমিনেমের গান থেকে এই শব্দটির জন্ম। আবার ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কাউকে কোনোরকম বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত হওয়া প্রসঙ্গে সার্কাস্টিক বাক্য 'ওই মামা না প্লিজ' ও 'নাটক কম করো পিও' বাক্যের উদ্ভব ঘটেছে। তেমনি 'ওকে বুমার' (OK Boomer) শব্দটির উদ্ভব হয়েছে মূলত বেবি বুমার প্রজন্মের (১৯৪৬-১৯৬৪) গোঁড়া বা রক্ষণশীল মতামতকে বিদ্রুপ বা প্রত্যাখ্যান করার প্রেক্ষাপটে। আবার একসময় কলেজ র‍্যাগিংকে রোস্টিং বলা হতো, ঠিক ঐ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এখন ট্রোলিং, ড্র্যাগিং শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। সামাজিক ইতিহাস বোঝাতে পূর্বে যেখানে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অভ্যুদয়, রূপান্তর, আন্দোলন, উন্নয়ন, অবক্ষয়, উত্থান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হতো; ঠিক একই প্রেক্ষাপটে জেন জি-এর ভাষা সময় ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে Cancel culture (গ্রহণযোগ্যতা হারানো), Woke (সচেতনতা), Throwback (অতীত স্মৃতি), Vibe shift (সাংস্কৃতিক পরিবর্তন), Clout (সামাজিক প্রভাব), Movement/মুভমেন্ট (সামাজিক আন্দোলন), Ally (প্রান্তিক গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো) প্রভৃতি ব্যবহার করেছে। তারা সামাজিক অনুষ্ঠান যেমনঃ বাগদান, আংটি বদল, গায়ে হলুদ ইত্যাদিকে ডিজিটাল Slang-এ রূপান্তরিত করে কাপল গোলস, শাদি ভাইবস, মেহেন্দি নাইট, হালদি ফাংশন, শাদি স্কোয়াড, শাদি স্ন্যাপ, আংটি ভাইব ইত্যাদি বিশিষ্টার্থক শব্দ নিয়ে এসেছে। পরিবার বা আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শব্দে নতুন রূপ প্রত্যক্ষ হয় যেমনঃ Bro /Sis, Cuz / CuzZz, Fam, Unc, Aunt, Mama / Moma, Pops, Cousin squad, Bro-in-law / Sis-in-law, Mini-প্রভৃতি। আমেরিকান ভাষাবিদ ও নৃবিজ্ঞানী হ্যারি হোয়েজার বলেছেন "সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, যেমনঃ অনেক শব্দ ও গঠনের জন্ম দেয় তেমনি সমাজব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটলে, ভাষা সংগঠনে, কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। (Hoijer, 1966: 458)

জেন জি-এর ভাষায় শব্দ ও বাক্যের বাগার্থিক বৃত্তির সংকোচন ও প্রসারণের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন: 'ফেস কার্ড' শব্দটি। এটি 'ক্রেডিট কার্ড' থেকে রূপক সম্প্রসারণ (Metaphorical extension) পেয়েছে। এটি বোঝায়, কেউ এত সুন্দর বা আকর্ষণীয় যে তার সৌন্দর্যই তার ক্ষমতার প্রতীক যেন সীমাহীন ক্রেডিটের মতো সবকিছু পেতে পারে। শব্দটি সামাজিক কনটেক্সট এবং প্রাসঙ্গিক রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থের মানোন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু ধ্বনিগত সংক্ষেপণ ও নতুন বানান ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে রিজ (Rizz), এটি মূলত ক্যারিশমার (Charisma) একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দটি প্রায়শই 'রিজ আপ' হিসাবে ব্যবহৃত হয় যখন কেউ অন্য ব্যক্তিকে মোহিত করার চেষ্টা করে। এই জেনারেশনের পূর্বের ফ্লার্ট বা মোহিত করার অর্থকে আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থানান্তরিত করা হয়েছে রিজ শব্দের দ্বারা, যা S40emantic shift I এর উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়।

## গবেষণার প্রাপ্তফল

জেনারেশন জি-এর বাংলা ভাষা ব্যবহারের উপর পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা যায় যে, ডিজিটাল যোগাযোগের চাহিদা মেটাতে তাদের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক এবং বাগার্থিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও উদ্ভাবন সাধিত হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলো মূলত অনলাইন যোগাযোগের সংক্ষিপ্ততা এবং তাৎক্ষণিকতা প্রতিফলিত করে। তারা সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করে এবং অক্ষর পুনরাবৃত্তি করে লিখিত স্বরভঙ্গি (Intonation) ও জোর (Stress) প্রকাশ করে, যা তাদের যোগাযোগে সৃজনশীলতা আনে। রূপতাত্ত্বিক স্তরে, প্রত্যয় সংযোজন, সংমিশ্রণ ও সংক্ষেপণের মাধ্যমে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াগুলো কেবল যোগাযোগের গতি বাড়ায় না, বরং জেন জি-এর মধ্যে 'ইন-গ্রুপ সলিডারিটি' বা গোষ্ঠীগত সংহতি প্রকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে, অনানুষ্ঠানিকতা ও সংক্ষিপ্ততার প্রতি অগ্রাধিকারের কারণে প্রচলিত বাক্য গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে; প্রায়শই কর্তা, ক্রিয়া, কর্মের অনিয়মিত বিন্যাস এবং অসম্পূর্ণ বাক্য দেখা যাচ্ছে। যদিও এটি ভাষার প্রথাগত 'অর্থের সংগতি' থেকে বিচ্যুত, তবুও তা যোগাযোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রতিফলিত করে। সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবর্তনটি হলো বাগার্থিক পরিবর্তন (Semantic Shift), যেখানে প্রচলিত শব্দগুলো রূপক প্রসারণ, অর্থের উন্নতি বা অবনতির মাধ্যমে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থ বহন করছে, যা তাদের প্রজন্মগত অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

## সুপারিশমালা

এই গবেষণার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা শিক্ষাক্রমে জেন জি-এর ব্যবহৃত ডিজিটাল স্ল্যাং, সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়া এবং

ইমোজি ভিত্তিক যোগাযোগের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে একটি নিয়মিত পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এবং এই ভাষাকে কেবল 'ভাষার অবক্ষয়' হিসেবে না দেখে, বরং এটিকে একটি 'ইন-গ্রুপ' সংহতি এবং স্ব-পরিচয়ের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করা প্রয়োজন। প্রচলিত ব্যাকরণবিদদের উচিত জেন জি-এর ভাষার এই সহজতা ও সংক্ষিপ্ততাকে ভাষার অর্থনৈতিক ব্যবহারের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তা বা বিকল্প মানদণ্ড তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করা। এছাড়া এই ভাষায় ব্যবহৃত স্ল্যাং, কোড-মিক্সিং এবং নতুন শব্দগুলোর একটি গতিশীল ডিজিটাল অভিধান বা 'Social Media Corpus' তৈরি করা আবশ্যক, যা ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

## উপসংহার

জেনারেশন জি-এর ভাষা ব্যবহার বাংলা ভাষার বিবর্তন প্রক্রিয়ায় একটি যুগান্তকারী, সৃজনশীল এবং বহুমাত্রিক অধ্যায়। এই গবেষণা স্পষ্টভাবে দেখায় জেন জি-এর ভাষা কেবল প্রচলিত ভাষাগত নিয়ম ভাঙা নয়, বরং ডিজিটাল যুগে উদ্ভূত নতুন যোগাযোগের চাহিদা মেটানোর একটি সক্রিয় ও কার্যকর প্রক্রিয়া। ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক স্তরের সংক্ষিপ্তকরণ এবং সংমিশ্রণ প্রমাণ করে যে তারা প্রথাগত বানানের চেয়ে কার্যকারিতা ও আবেগ প্রকাশকে অধিক গুরুত্ব দেয়। বাগার্থিক পরিবর্তন (Semantic Shift) এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রজন্মগত অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। মোটকথা, জেন জি-এর ভাষা হলো একটি সৃজনশীল হাইব্রিড রীতি (Creative Hybrid Style) যা বৈশ্বিক ডিজিটাল প্রবণতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং এটি বাংলা ভাষার 'বহুস্বরযুক্ত' (Polyphonic) চরিত্রকে তুলে ধরে ভাষাকে কেবল সংরক্ষণের বস্তু না রেখে একটি 'চলমান' এবং 'পুনর্নির্মিত' সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তাই জেন জি-এর ভাষাকে নেতিবাচক 'অবক্ষয়' হিসেবে না দেখে, ডিজিটাল যুগের উপযোগী একটি স্বতন্ত্র ভাষিক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

## তথ্য-নির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন। (২০০৭)। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল। (১৯৯২)। ভাষাতত্ত্ব। বুক ভিউ: ঢাকা।

জাহাঙ্গীর আলম, জাহিদ। (২০০৬)। বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা: পর্যালোচনা ও প্রস্তাব। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

দানীউল হক, মহাম্মদ। (২০১৪)। ভাষাবিজ্ঞানের কথা। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

দানীউল হক, মহাম্মদ। (২০০৭)। ভাষা আয়ত্তকরণ ও শিখন প্রাথমিক ধারণা। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ: কলিকাতা।

পবিত্র, সরকার। (২০০৩)। ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

পারভেজ হোসেন, ফয়েজ আলম। (২০২০)। জাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা। সংবেদ: কলকাতা।

মনসুর, মুসা। (১৯৯৬)। ভাষা-পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

রাজীব, হুমায়ুন। (১৯৯৩)। সমাজভাষাবিজ্ঞান। বাঙলাদেশ ভাষাতত্ত্ব-চর্চা পরিষদ ও দ্বীপ প্রকাশন: ঢাকা।

রামেশ্বর, শ'। (২০১২)। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

Bakhtin, M. (1981). The dialogic imagination: Four essays. University of Texas Press: Austin.

Bauer, P. (1983). English Word-Formation. Cambridge University Press.

Bloomfield, Leonard. (1933). Language. George Allen & Unwin Ltd.: London.

Crystal, D. (2001). Language and the Internet. Oxford University Press.

Crystal, D. (2011). The language of social networking: The linguistic compression in digital communication. Journal of Computer-Mediated Communication, 16(3), 198-212.

Dittmar, N. (1976). Sociolinguistics. Cambridge University Press: London.

F. G. Fowler, & H. W. Fowler. (1957). The Pocket Oxford Dictionary of Current English. Oxford University Press: England

Hajare, R. (2023). Slang Language and Generation 'Z': A Sociolinguistic Study. International Journal of Current Science (IJCSPUB), 13(1), 741-744.

Hoijer, H. (1966). Linguistic and Cultural Change. The Linguistic Society of America: America.

Jabeen, S. S., & Nawaz, H. I. (2025). Morphological innovations in Gen Z language and their impact on English language usage. Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT), 8(1).

Labov, William. (1996). The Social Stratification of English in New York City. Cambridge University Press: Cambridge.

McCulloch, G. (2019). Because Internet: Understanding the New Rules of Language. Penguin Publishing Group.

Pride, J. B., & Janet Holmes (Eds.). (1987). Sociolinguistic. Harmondsworth: England .

Pyshna, A. (2024). [Digital Communication, Gen Z and the Culture of Irony: An Interview/Article Title], [Publication Name/Platform, e.g., Language Trends Magazine]

Sample, Ian. (2024, November). Using abbreviations in text messages comes across as less sincere, study finds. The Guardian.

Sintia et al. (2025). A Sociolinguistic Analysis of Code Mixing Usage Among Generation Z at Muhammadiyah University of Tangerang. Variable Research Journal, 1(3), 154-168.

Sitohang, D. P., & Damanik, B. A. R. (2025). A semantic analysis of slang words used by Gen Z on social media. Young Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 149.

Yeasmin, S. (2024). Constructing Identity: The Role of Slang in Shaping Ethno-Linguistic Unity Among Bangladeshi Gen Z. Prime University Journal of Linguistics and Cultural Studies, 10(2), 45-62.

Zaraiskiy, A. (2019). Language and cultural identity in the digital era monograph. Saratov Publishing house: Russia.

**অনলাইন উৎস:**

Roar Media. (2025) । মিশেল ফুকো: ক্ষমতা ও জ্ঞানের পারস্পারিক সম্পর্ক। সংগৃহীত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, https://archive.roar.media/bangla/main/world/michel-foucault-the-interrelation-of-power-and-knowledge |https://www.facebook.com/share/1Q1WSEhbiz/

https://www.facebook.com/share/p/1C4fbtSjJs/

https://www.facebook.com/share/p/1HJRnFeEtF/

# ময়মনসিংহ-গীতিকা: ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের সূত্র-সন্ধান

সাবিনা ইয়াসমিন*

**Abstract:** Folklore is an invaluable cultural asset for any community, encompassing its traditions, customs, antrhopology, and the markers of class and caste. In Bengali literature, the medieval period is regarded as the golden age of folkloric expression. The ballads of the Mymensingh region, later compiled by Dinesh Chandra Sen as *Mymansingh-Geetika*, exemplify this tradition. Though their origins lie in the medieval era, these ballads reflect a mature linguistic form and embody elements of modern sensibility. However in the nineteenth century, under the influence of colonial governance, a Sanskritized Bengali prose style and modern literary forms emerged. As a result, the urban educated elite rejected these ballads as rustic, severing Bengali literature from its own traditional and cultural roots. This rupture in both language and cultural identity was shaped by the politics of language and culture under colonial authority. Against this backdrop, the present eassay seeks to examine the dynamics of such linguistic and cultural politics through the lens of *Mymensingh-Geetika*. This paper will apply both historical-analytical and comparative method.

**মূলশব্দ (Keyword):** লোকসাহিত্য (Folklore), গদ্যভাষা (Prose language), উপনিবেশ (Colony), সাংস্কৃতিক-রাজনীতি (Cultural-politics), সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (Cultural heritage)

## ভূমিকা

বিশ্বের প্রতিটি জাতির ভাষা-নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে আদি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর হাতে। যূথবদ্ধ জীবনচেতনার ভেতর থেকে যে সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

* ড. সাবিনা ইয়াসমিন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইল: sabinayeasmin450@gmail.com

তার প্রাথমিক রূপটি লোকসাহিত্য হিসেবে পরিচিত। ছড়া, গান, প্রবাদ-প্রবচনের পাশাপাশি লোকসাহিত্যের আরেকটি সমৃদ্ধ শাখা গাথা, যা পালা বা গীতিকা নামেও পরিচিত এবং সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন। মধ্যযুগে লোকসমাজ এবং রাজন্যবর্গের অর্থনৈতিক অবস্থান ভিন্ন হলেও লোকসাহিত্য এবং রাজসভার সাহিত্যের রসোপভোগে কোনো পক্ষই কোনো বিঘ্ন ঘটায়নি। উনিশ শতকে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্তি তৈরি হয়– যার একদিকে ছিল সাধুভাষা ও শিক্ষিত সমাজের ভদ্রসংস্কৃতি এবং অন্যদিকে গ্রামীণ জনসমাজের লোকসংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক শাসন, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে লোকসাহিত্য তার পূর্বমর্যাদা হারিয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় ভাষা-সংক্রান্ত জটিলতা; প্রকৃত বাংলা ভাষা কোনটি এবং সাহিত্যের ভাষা কী হওয়া উচিত– এসব নিয়ে নানা বিতর্ক উনিশ শতকে শুরু হয়ে বিশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, যার প্রভাব একবিংশ শতাব্দীর ওপরেও বহাল রয়েছে। উনিশশো বায়ান্ন সালকে ভাষা-আন্দোলনের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে বহুপূর্বে; মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের *নূরনামা*'য় এই ভাষা-বিতর্কের সংবাদ পাওয়া যায়: "আরবী ফারসী শাস্ত্র কিবা হিন্দুয়ানী।/সর্ব শাস্ত্রে লিখে আল্লা নবীর কাহিনী॥" (হাকিম, ১৯৮৯: ৪৭১)। মধ্যযুগে সংস্কৃত পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মতো কবির কাব্যে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ১৯৪০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং দেশবিভাগোত্তর কালের ভাষা সংস্কার কমিটির (১৯৪৯) কার্যক্রম পরিচালনার একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার। ১৯৫৬ সালে বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভের পরেও ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নটি বিতর্কিত হয়েছে। এভাবে সময়ের নানা বাঁকে ভাষা-সাহিত্য ও বর্ণমালা সংস্কারের নামে বাংলা ভাষাকে দিতে হয়েছে তার শুদ্ধতার পরীক্ষা, বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তার জন্ম, বংশ পরিচয়, টিকে থাকতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রুচির সঙ্গে অভিযোজন করে।

## সমস্যার বিবৃতি

উনিশ শতকের গদ্যভাষা এবং নাগরিক অভিরুচির অভিঘাতে লোকসাহিত্যের অনেক শাখা অস্তিত্বসংকটে পড়ে, লোকগীতিকাগুলোও তার প্রাপ্য সাংস্কৃতিক মূল্য আদায় করতে পারেনি শিক্ষিত সমাজের কাছে। আধুনিক যুগের সূচনাপর্বের একটা বড়ো সময় জুড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল যার দায়ভার অনেকটা বহন করতে হয়েছিল লোকসাহিত্যকে। সেই সময়-প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত হয়েছিল বেশ কয়েকটি সমস্যা: প্রথমত, ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে নির্মিত বাংলা গদ্যভাষাকে সাহিত্যভাষা হিসেবে

গ্রহণ এবং লোকসাহিত্যকে অবজ্ঞা করায় প্রাকৃত ভাষার উত্তরাধিকার ও উপভাষার বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য নতুন গদ্যভাষা অবলম্বনে বিকশিত হয়, যে ভাষা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে নির্মিত সাহিত্যের চাপে লোকসাহিত্যের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, নতুন গদ্যভাষার ভেতরে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের সূচনা হয়। তৃতীয়ত, নতুন গদ্যের দুর্বোধ্যতা এবং জনসমাজবিচ্ছিন্নতার কারণে তৎকালীন লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এ-ভাষার কঠোর সমালোচনা করেন। চতুর্থত, নতুন গদ্যভাষা ভাষিক সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করে, এ ভাষাকে কেন্দ্র করে 'মুসলমানি বাংলা' বা 'হিন্দুয়ানি বাংলা'– এ ধরনের বাইনারির জন্ম হয়, যা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণ। বিষয়টি দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছিল: "এক সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ অতিকায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানি করিয়া এই ভাষার পর্ণ কুটিরটিকে ঐরাবতশালায় পরিণত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবে আরবি-পারসির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্য্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন" (সেন, ১৯৭৩, ভূমিকা)।

### গবেষণার উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের ভাষা-বিতর্ক এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব যা বর্তমানকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্তরালে এখনো প্রবহমান, সেই ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ উন্মোচন এবং সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টের কারণ অনুসন্ধান বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

### গবেষণার উপকরণ

বর্তমান প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক উৎস লোকসাহিত্য। উনিশ শতকের ভাষিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে এখানে লোকসাহিত্যের সামগ্রিক পাঠের পরিবর্তে শুধু *ময়মনসিংহ-গীতিকা*'র প্রাসঙ্গিক পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে গবেষণা-পরিধিকে সংহত রাখার সুবিধার্থে।

### পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

মধ্যযুগ বাংলা লোকসাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হলেও লোকমুখে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত রূপ লাভ করায় লোকসাহিত্যের প্রকৃত বয়স নির্ধারণ করা কঠিন। আধুনিক সমাজে লোকসাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর

কবিসত্তায় অনেকাংশে ক্রিয়াশীল ছিল লোক-কবিদের ভাবনা ও আদর্শ। তিনি *লোকসাহিত্য* শিরোনামের গ্রন্থে লোকছড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তাঁর *বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থে লোকছড়া ও অনেক লোককবির সঙ্গে স্থান পেয়েছে *ময়মনসিংহ গীতিকার* *মহুয়া* ও *মলুয়া* পালার অংশবিশেষ। দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র এবং পূর্ববঙ্গের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রমুখ লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও চর্চায় মনোযোগী হয়েছিলেন। লোকসাহিত্য সংগ্রহের এসব আন্তরিক উদ্যোগে *ময়মনসিংহ-গীতিকা*'র পালাগুলো আবিষ্কৃত হয় এবং সম্পাদিত হয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর গোচরে আসে। জসীমউদ্দীন লোকসাহিত্যের পরিচর্যায় যুক্ত করেছিলেন নতুন মাত্রা। ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ওয়াকিল আহমদ প্রমুখ লোকসাহিত্যের শ্রেণিকরণ, ভাষা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *বাংলা সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে *ময়মনসিংহ-গীতিকার* পাঠভেদ ও পাঠ-সম্পাদনা নিয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। বিমল গুহের *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান* এবং অনু হোসেনের *লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব* গ্রন্থে আধুনিক কবিতায় ব্যবহৃত লোকসাহিত্যের নানা উপাদানের বিশ্লেষণ উঠে এসেছে। সৈয়দ আজিজুল হক *ময়মনসিংহ-গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য* শিরোনামের গ্রন্থে গাঁথাগুলো নিয়ে মূল্যবান বিশ্লেষণ ও মতামত তুলে ধরেছেন। গীতিকার সমাজ-সংস্কৃতি, কাহিনি-বিশ্লেষণ, চরিত্রায়ন-কৌশল, ভাষা-অলঙ্কারাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে থাকলেও *ময়মনসিংহ-গীতিকা* বা বৃহত্তর অর্থে লোকসাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উনিশ শতকের ভাষিক রাজনীতির চালচিত্র, ভাষা-বিতর্ক ও প্রতিরোধ-চেতনার বিষয়টি স্থান পায়নি। লোকসাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধে *ময়মনসিংহ-গীতিকার* ভাষিক বিপন্নতা ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস দেখা যায় না।

### গবেষণার যৌক্তিকতা

লোকসাহিত্য এবং প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার কারণ সংগুপ্ত রয়েছে উনিশ শতকের ভাষা-পরিস্থিতির ভেতরে। এক্ষেত্রে *ময়মনসিংহ-গীতিকার* ভাষা ও সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে তৎকালীন ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক পাঠ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে। *ময়মনসিংহ-গীতিকার* ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অবস্থানের পরিচয় দিয়েছেন:

> "কেহ কেহ ইংরেজি শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "ছোটলোকেরা, বিশেষত মুসলমানরা, ঐ সকল মাথামুণ্ড গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ সকল গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন?" (সেন, ১৯৭৩, ভূমিকা)।

লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে-কেও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়েছিল:

> "...সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিষগুলিকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে সভ্যগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন" (সেন, ১৯৭৩, ভূমিকা)।

লোকসাহিত্য সম্পর্কে সে সময়ের সভ্যগণের এরকম মনোভাব কোনো কারণ ছাড়া নিশ্চয়ই তৈরি হয়নি, সেই কারণ নতুন কালে নতুন ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষাপটে যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শত বছর ধরে দীনেশচন্দ্র সেনসহ অন্যান্য পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিক যে সংকটের কথা বলেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা খতিয়ে দেখার দিন আজও ফুরিয়ে যায়নি।

## গবেষণা-প্রশ্ন

প্রাকৃত ভাষা নাকি সাধুভাষা, লোকসংস্কৃতি নাকি ভদ্রসংস্কৃতি, মুসলমানি বাংলা নাকি হিন্দুয়ানি বাংলা– বহুপূর্বে উদ্ভূত এসব অমীমাংসিত প্রশ্নকে নতুন করে উত্থাপন করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। 'বাংলাভাষা-পরিচয়' প্রবন্ধের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলাকেই 'প্রাকৃত বাংলা' হিসেবে নির্দেশ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত ভাষার রূপভেদ হিসেবে স্বীকার করেছেন; *মৈমনসিংহ-গীতিকা*র ভূমিকায় তিনি প্রকৃত বাংলা ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন:

> "মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বহুশতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর ভাষা। এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই" (সেন, ১৯৭৩, ভূমিকা)।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাকৃত বাংলা বলতে সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত এবং জনসমাজে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত উপভাষার বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অকৃত্রিম বাংলা ভাষাকে নির্দেশ করা হয়েছে। লোকসাহিত্যের নবীন শাখা লোকগীতিকা, এর ভাষা পরিণত ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ। তারপরও কেন লোকসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের সূচনা হলো এবং জনসমাজের ওপর এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হয়েছে সে বিষয়টি বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে। এক্ষেত্রে উনিশ শতকের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট কেমন ছিল সে প্রশ্নটিও বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে যৌক্তিকভাবে সংশ্লিষ্ট।

## গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান গবেষণায় বাংলা লোকসাহিত্য তথা *মৈমনসিংহ-গীতিকা*র মর্যাদা-সংকটকে কোনো ঐতিহাসিক বা স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফল হিসেবে নয়, বরং ঔপনিবেশিক

জ্ঞানরাজনীতির কাঠামোগত পরিণতি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হবে। ঔপনিবেশিক শাসন কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানব্যবস্থা ও রুচিবোধকে প্রাধান্য দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতিকে শ্রেণি-বর্গভুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে পোস্টকলোনিয়াল তত্ত্বের আলোকে জ্ঞানগত শ্রেণিবিন্যাস (Epistemic hierarchy) হিসেবে দেখা যায়, যেখানে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা নির্ধারণ করে কোন জ্ঞান গ্রহণযোগ্য। ভাষার রাজনীতিও এখানে প্রভাব বিস্তার করেছে; উপনিবেশ-পর্বে প্রমিত বাংলা ভাষার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে লোকসাহিত্যের ভাষা শিক্ষিত শ্রেণির সাংস্কৃতিক রুচি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শহরকেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্য এবং গ্রামকেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের মধ্যে কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্ক তৈরি হয়। এটি কোনো সাধারণ ভাষিক বা সাহিত্যিক বিবর্তন নয়, বরং ঔপনিবেশিক ক্ষমতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ঔপনিবেশিক রুচিবোধের অধীনে আধুনিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, ফলে লোকসাহিত্যকে কেবল আধুনিক সাহিত্যের পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে পাঠ বা বিশ্লেষণের পরিবর্তে বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিক ফল হিসেবে বোঝা প্রয়োজন। এই তাত্ত্বিক কাঠামো লোকসাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার না করে সেই মানদণ্ডের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। এর ফলে বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে পরিচিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা*র প্রান্তিক অবস্থানকে পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

## গবেষণা-পদ্ধতি

যে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ বর্তমান প্রবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয় তার বীজ রোপিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক সময়পর্বে, বিষয়টি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য *ময়মনসিংহ-গীতিকা*র প্রাসঙ্গিক পাঠের সঙ্গে উনিশ শতকের ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক এবং তুলনামূলক উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।

## গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা

*ময়মনসিংহ-গীতিকা*র সংগ্রাহক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সংগৃহীত গাথাগুলোকে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে। চন্দ্রকুমার দে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এসব পালার সরাসরি রসোপভোগ করেছেন এবং কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রহ করেছেন। সরাসরি আসরে বসার পর এসব পালার যে সজীব সতেজ রস আস্বাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেটি গাথার লেখ্যরূপের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে পাঠ্যরূপের ভেতর দিয়ে গাথাগুলো স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। উনিশ শতকে আধুনিক

যুগে সাহিত্যচর্চার উপযোগী বাংলা গদ্যভাষার নির্মাণ ও পরিণতিতে উপনিবেশের ভূমিকা ছিলো গভীর– তবে এর পেছনে বিশেষ অভিসন্ধিও ছিল, যেহেতু ব্রিটিশ উপনিবেশ কেবল রাজনৈতিক উপনিবেশ নয়, সাংস্কৃতিক উপনিবেশও বটে। ফলে ধর্মীয়, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক প্রয়োজনে যে ভাষা সৃষ্ট হলো, লোকসাহিত্যের ভাষা সে-ভাষার উত্তরসূরির মর্যাদা লাভ করতে পারেনি; বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উপনিবেশ আমলে বাংলা রাজভাষার মর্যাদা পায়নি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও সবসময় একে গ্রহণ করা হয়নি। তবে এ গদ্যভাষা বাংলা সাহিত্যচর্চার বাহন হিসেবে একটি বিশেষ শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। মধ্যযুগে পদ্যভাষার পাশাপাশি বাংলা গদ্যও সীমিত আকারে দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু সে গদ্যকে পরিচর্যার মাধ্যমে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলার পূর্বেই নতুন গদ্যের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে গদ্যভাষার তুলনায় পদ্যভাষা বেশি পরিণত ছিল, পদ্যভাষার ভেতরে সঞ্চিত ছিল গদ্যভাষার সব গুণ।

*ময়মনসিংহ-গীতিকা*র বড়ো গুণ এর ভাষার সারল্য ও সহজবোধ্যতা, যা লোকসমাজ ও বিদ্বৎসমাজ সবার কাছেই সমান বোধগম্য ছিল। আজকের যুগে শিল্প-সাহিত্য সবই প্রায় বাণিজ্যের অংশ, পণ্যের মতো এর প্রচারণা-বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়। কিন্তু আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে জনজীবনকেন্দ্রিক গাথাগুলো যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির পরিচর্যায় পূর্ণরূপ পেত এবং বিরাটসংখ্যক দর্শক-শ্রোতার মনে প্রবেশ করে সার্থক হতো, তখন সাহিত্যের স্বভাব পণ্যের মতো ছিল না, এ রস আস্বাদনের জন্য অন্তরের তাগিদই যথেষ্ট ছিল। পালাগানের আসরে যত লোক জমা হতো বর্তমানের উন্নত বিপণন-কৌশল, বিজ্ঞাপনের প্রলোভনও তত লোককে টানে না শিল্প-সাহিত্যের অভিমুখে। কারণ বর্তমান শিল্প-সাহিত্য জীবনের সহজ-সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন:

> "সেকালের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের সাংস্কৃতিক উপভোগ ছিল তাঁদের সামগ্রিক জীবনবোধের অঙ্গ। যে গান শুনে বা পালা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হতেন, তার আবেদন তাঁদের বিশ্বাসে, তাঁদের জীবনচর্যায় জায়গা পেত। আধুনিক কবির রসভোক্তার ভোগ তাঁর 'ইন্টেলেক্ট'-এর ব্যায়াম। এই রসোপভোগের সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পূর্ণ জীবনের সংযুক্তির কোনও প্রশ্নই থাকে না" (সেনগুপ্ত, ২০২২: ২১০)।

যে ভাষায় জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্তি তৈরি হয় সেটি কেবল বর্ণমালা, শব্দ বা ধ্বনির সংকলন নয়, সেই ভাষিক পরিপ্রেক্ষিতের শিকড় ও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে বিজড়িত থাকে যাপিত জীবন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়; এই বিস্তৃত ভাষিক দক্ষতা মানুষ অর্জন করে জন্ম ও ঐতিহ্যসূত্রে। লোকসাহিত্য সেই ভাষিক অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে নির্মিত হয়। এ সাহিত্য যৌথজীবনের কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে নৌকা বাওয়ায়, নৌকা-বাইচে, ধান কাটায়, রাস্তায়-আইলে, ঘরের আঙ্গিনায় সামান্য একতারা-দোতরা, ঢোল-

বাঁশির সহযোগে পরিবেশিত হতো। অবকাশযাপনের উপায় হিসেবে বসতো পুথি-পালার আড়ম্বরহীন আসর। আধুনিক সাহিত্য হাটে-মাঠে-ঘাটে, খোলা আকাশের উদারতায় পরিবেশনের জিনিস নয়, এর জন্ম থেকে বিপণন– সবই আনুষ্ঠানিক। লোকসাহিত্য জীবনের অঙ্গ ছিল, দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহের সঙ্গে ছিল তার আত্মিক সম্পর্ক। ভাষা পদ্য হলেও এর আঙ্গিকবৈচিত্র্য ছিল– ছড়া, গীত, পালা; এগুলোর ভাষা গ্রহণ করা হয়েছিল জনসমাজের অভ্যন্তর থেকে, এ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল ব্যাবহারিক ভাষার শব্দভাণ্ডার, এর ভোক্তাশ্রেণিতে ছিল সুবিশাল কৃষিজীবী বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্য যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইংরেজ প্রশাসকের হাতে তৈরি এবং নাগরিক সুশীলদের পরিচর্যায় বিকশিত বাংলা ভাষা অবলম্বন করে, এই ভাষার ভোক্তাশ্রেণি ছিল খুব সীমিত। শহুরে নাগরিক সমাজে লোকসাহিত্যের সমঝদার অনেকে থাকলেও, অপ্রচলিত শব্দবিশিষ্ট আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভোক্তাশ্রেণিতে নাম লেখাতে পারেনি গ্রামীণ বিপুল জনগোষ্ঠী।

উনিশ শতকের নবজাগরণ আংশিক বলে যে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ– নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভাষাগত দূরত্বের কারণে প্রান্তবাসীরা কেন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, আর্থ-রাজনৈতিক কারণও ছিল যা নগর ও গ্রামকে কেন্দ্রে এবং প্রান্তে বিভক্ত করেছিল। বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্যের* মতো যুগান্তকারী কাব্যে যুক্ত হয়েছিল মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নারী-স্বাধীনতা। তিনি রাম-লক্ষ্মণ এবং রাবণ ও মেঘনাদকে আধুনিক যুগচেতনার আলোকে নতুন করে নির্মাণ করেছেন বলে প্রশংসিত হয়েছেন। সম্প্রতি গবেষক ক্লিনটন বি সিলি তাঁর 'মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে মাইকেলের *মেঘনাদবধ কাব্যের* সঙ্গে কৃত্তিবাসের *রামায়ণের* তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সামান্য কিছু রদবদল ছাড়া প্রায় পুরো কাব্য কৃত্তিবাস-প্রভাবিত। কৃত্তিবাসের বাইরে যে দুএকটি ঘটনা-অনুষঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে একটি হল প্রমীলার চিতারোহন। নবজাগরণস্নাত সমাজে নারীস্বাধীনতার প্রতীক প্রমীলার যে পরিণতি দেখানো হয়েছে আধুনিক চেতনার সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক। সুরেশ মৈত্র ধারণা করেন মাইকেল এই প্রসঙ্গটি গ্রহণ করেছেন কম্ব'র দ্রাবিড়ী *রামায়ণ* থেকে, এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: "মধুসূদন বৃহত্তর ভারতের শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে মিলিয়ে তার প্রাদেশিক মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছেন। অবসান ঘটালেন বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের দৃষ্টি-সংকীর্ণতার" (সিলি, ২০২৫)। প্রাদেশিকতা শিক্ষিত সমাজের কাছে কতটা অগ্রহণযোগ্য ছিল সেটি এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। কৃত্তিবাসের বিষয় গ্রহণ করেছেন মাইকেল, ভাববিন্যাসেও তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাননি; যে ট্র্যাজেডি তিনি গ্রিক সাহিত্য, শেক্সপিয়র ঘুরে বাংলায় আমদানি করেছেন তার অস্তিত্ব কৃত্তিবাস এবং বাল্মীকিতে ছিলো। পূর্ব-ঐতিহ্য বলতে মাইকেল সংস্কৃতকে গ্রহণ করেছেন, আর উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের। ফলে তিনি ঘরের

দিকে নজর দিতে পারেননি, তিনি জানতেন না যে *ময়মনসিংহ গীতিকা*র বেশিরভাগ পালাতে ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব রয়েছে। লোকসাহিত্য তখনও লিখিত আকারে সংগৃহীত হয়নি, শিকড়সন্ধানী ব্যক্তি ছাড়া লোকসাহিত্যের সন্ধান বাঙালিরা নেয়নি। লোকসাহিত্যের কদর উপলব্ধি করেছিলেন মাইকেলের অগ্রজ কবি ঈশ্বরগুপ্ত, তিনি প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহ করেন, লোকগানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, তাঁর কাব্যের বিষয় ও ভাষা একান্তই স্বদেশি হওয়ায় বঙ্কিম তাঁকে 'খাঁটি বাঙালি' কবি হিসেবে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য সন্ধান, সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং লোকঐতিহ্যের নানা উপাদানকে নতুন করে সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেন। মাইকেলের সঙ্গে বাংলার লোকসাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপিত হলে *কৃষ্ণকুমারী নাটকে*র ট্র্যাজেডি এবং *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাবণের ট্র্যাজেডি উভয়ের রসদ জোগাতে পারতো *মহুয়া* পালা। মহুয়ার আত্মঘাতী হয়ে ওঠা এবং হুমরা বাদ্যার পিতৃ-হৃদয়ের উন্মোচন এক অনির্বচনীয় ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছে। প্রেমিক নদের চাঁদকে হত্যার জন্য হুমরা বিষলক্ষের ছুরি তুলে দিয়েছিল মহুয়ার হাতে; সে ছুরি প্রেমিকের বুকে গেঁথে দেবার পরিবর্তে নিজের বুকেই বিদ্ধ করে মহুয়া। তখন কন্যা হারানোর অনুতাপ নিয়ে হুমরা সব ছেড়ে বনবাসী হয়েছে:

শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইলা চাও।
একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও।।
আর না ফিরিব আমি আপনার ভবনে।
তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, ১৯৭৩: ৪১)

*ময়মনসিংহ-গীতিকা*র দশটি পালার অধিকাংশের পরিণতি বিয়োগান্তক। সুতরাং ট্র্যাজেডি রস বাঙালির দেশজ সাহিত্যের ভেতরেই ছিল। *মহুয়া* পালায় মহুয়া চরিত্রে শক্তি, সাহস, প্রেম, সেবা ও সততার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সমাজ-বহির্ভূত প্রেম, প্রেমকে বিয়েতে পরিণত করার দুঃসাহস, বিপদে স্থির মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুদ্ধিমত্তায় মহুয়া আধুনিক নারীর আদর্শ প্রতিমূর্তি। পিতার নির্বাচিত পাত্র সুজনকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত এবং মত প্রকাশের স্বাধীন স্বর তার কণ্ঠে ছিল:

তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া।।
আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, ১৯৭৩: ৪০)

স্বাধীনচেতা নারী মলুয়া, চন্দ্রাবতী, ও সুনাইয়ের জীবনেও নেমে আসে গভীর ট্র্যাজিক পরিণতি। *কঙ্ক ও লীলা* পালায় যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে তা কোনো অংশেই শেক্সপিয়রের *রোমিও জুলিয়েট* থেকে কম নয়। গীতিকার ট্র্যাজেডি বা নারীর স্বাধীনসত্তার ঐতিহ্যকে আধুনিক কবিতা বা নাটকে প্রয়োগ করলে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রকৃত

মর্যাদা রক্ষা হতো। প্রমীলার দ্রোহী ও স্বাধীন নারীসত্তার যথার্থ প্রতীক হয়ে উঠতে পারত মহুয়া, কিন্তু মাইকেল প্রমীলার উপযুক্ত প্রতিমা জোগাড় করতে ভার্জিল, ট্যাসোর জগত ঘুরে এসেছিলেন। মাইকেলের প্রকৃত মৌলিকতার প্রকাশ তাঁর ভাষা এবং ছন্দে। কিন্তু যে ভাষা তিনি নির্মাণ করেছিলেন সেই ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে হলে বর্তমানকালেও সাধারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অভিধান-সহযোগে পাঠ করতে হয়, অন্যদিকে মধ্যযুগে অনূদিত কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* ধর্মগ্রন্থ হলেও ভাষাগুণে তা হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আধুনিক যুগে আক্ষরিক অর্থে ভাষার অপরিচিতিকরণ প্রথম ঘটেছিল মাইকেলের হাতে, এতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল আধুনিক শিক্ষিত সমাজের গণ্ডিতে। মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের ভাষাগত ব্যবধান বুঝতে একটি ছোট্ট উদাহরণ বেছে নেয়া যায় মাইকেলের কাব্য থেকে যেখানে রয়েছে অশোকবনে বন্দি থাকার কারণে সীতার রূপলাবণ্য কতখানি মলিন হয়েছিল তার বর্ণনা:

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে ( না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বরাশি-তলে!' (দত্ত, ১৯৯৫: ১৭৩)

*মেঘনাদবধ কাব্যে*র পাশে *ময়মনসিংহ-গীতিকা* থেকে নারীর রূপলাবণ্যের একটি বর্ণনাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। *দেওয়ান ভাবনা*য় সুনাইয়ের রূপবর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

আষাঢ়মাসে দীঘলা পানসীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে।।
... ... ...
কাজল মেঘে সাজল হাসিরে বিজুলীর ঝলা।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো আন্ধাইর ঘর উজালা।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, ১৯৭৩: ১৭৬)

মাইকেলের ভাষার দুর্বোধ্যতা উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে নেই, পরিচিত সামাজিক ভাষাকে এখানে অনেকটা অকৃত্রিমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকগাথার উপাদান-উপকরণ প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেয়া হলেও এর ভেতরে প্রাত্যহিকতাকে অতিক্রম করার মতো শিল্পগুণ রয়েছে, রয়েছে সুনির্দিষ্ট রূপতাত্ত্বিক কাঠামো। এসব সাহিত্য রচনা ও মৌখিক চর্চার পেছনে রয়েছে লিখিত সাহিত্যের মতোই এক ধরনের চিন্তাকাঠামো, যা আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত-

নিরক্ষর, লোকজ-আধুনিক– এসব যুগ্ম বৈপরীত্য (binary opposition) দিয়ে একে বিচার করার প্রবণতা সাংস্কৃতিক রাজনীতির অংশ। অথচ এগুলো উপনিবেশ এবং সংস্কৃত ভাষার প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলায় লেখা বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ। দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্যের এই মৌলিকতার দিকে বারবার দৃষ্টি ফিরিয়েছেন: "বাংলা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের পণ্ডিতেরা এই ভাষায় অপর্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদলাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি, পাঠ করিলে, সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাংলা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে" (সেন, ১৯৭৩, ভূমিকা)।

লোকসাহিত্যে আধুনিক জীবনবোধের নানা উপাদান-উপকরণ যেমন: অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতা, নারীর প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা– এসবের পাশাপাশি রয়েছে প্রেম-বাৎসল্য ও মানবিক সম্পর্কের চিরায়ত কিছু আবেগ, যে অনুভূতি মানবসমাজে পুরোনো হবার নয়। *মহুয়া* পালায় প্রেম ও যৌবনের অনুভূতি বর্ণনায় বলা হয়েছে:

জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ।।
... ... ...
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, ১৯৭৩: ১১-১২)

আরও একটি উদাহরণ দেয়া যায় *মলুয়া* পালা থেকে:

মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল।।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা*, ১৯৭৩: ৮৪)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো গ্রামীণ প্রান্তবাসী ও শিক্ষিত সুধীজন– উভয়েরই বোধের সীমানায় সমানভাবে আবেদন সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগের বৃত্তভুক্ত না হয়েও *ময়মনসিংহ গীতিকা* আধুনিক জীবনচর্যা ও সাহিত্যধর্মকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধারণ করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গীতিকার আধুনিকতা উনিশ শতকীয় আধুনিক চিন্তাধারার চেয়েও অগ্রসর, বিশেষ করে নারী-স্বাধীনতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রশ্নে, যা হতে পারতো উনিশ শতকের নবজাগরণের পাথেয়।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার লিখিত রূপ ও প্রচলিত ব্যাবহারিক রূপের ক্ষেত্রে এক ধরনের ভাষিক বর্ণবাদের সূচনা হয়। ভাষাও যে 'অপরতা'র বোধ জন্ম দিতে পারে সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে:

> "বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধু ভাষা বা সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আরেকটীর নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১: ৮৬২)।

আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর অভ্যন্তরে জন্ম নেয়া 'অপরতা'র মতো ভাষাভিত্তিক 'অপরতা'র ধারণাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে:

> "ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গড়া অভিজাতদের কাছে ঔপনিবেশিক বলয়ে ঢুকতে না পারা দেশীয়রাই ছিল 'অপর' (আজম, ২০১৪: ১৮২)।

অপরদের ব্যবহৃত দেশীয় ভাষা এবং দেশজ সাহিত্যও 'অপরে'র কাতারভুক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় রামগতি ন্যায়রত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ছিলেন সংস্কৃতবাদী। নতুন বাংলা গদ্যের যে কঠিন এবং কঠোর রূপ তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের সংস্কৃতবাদী গোষ্ঠীর হাতে তাদের সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন:

> জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র' (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১: ৩৭৩)।

বিষয়টি কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত নয়, এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তৎকালীন সাংস্কৃতিক রাজনীতির সুদূরপ্রসারী প্রেক্ষাপট। প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দকে বাদ দিয়ে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় সংযোজন করে ভাষাকে অকারণে দুর্বোধ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। প্রয়োজনে সাহিত্যে ইংরেজি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য– যে কোনো ধরনের শব্দ আমদানিতে তাঁর আপত্তি নেই, আপত্তি কেবল অপ্রয়োজনে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আরবি-ফারসিকে বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দ আরোপের ব্যাপারটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলেও ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে নানা কারণে তা প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে আইন-আদালতসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং ধর্মীয় প্রচারণার জন্য আঞ্চলিক বা উপভাষার প্রভাবমুক্ত সরল বাংলা গদ্যের প্রতি ছিল তাদের ঝোঁক। বঙ্কিমচন্দ্র যে সরল গদ্যের কথা বলেছেন তার সাথে ইংরেজদের সরলতার পার্থক্য রয়েছে। বাংলার আঞ্চলিক ভাষা-বৈচিত্র্য ইংরেজ প্রশাসকদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, ভাষার দেশীয় ভোক্তাদের প্রতি তাদের সুনজর ছিল না। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভোক্তা-পরিধি বাড়ানোর অভিপ্রায়েই সরল ভাষারীতির কথা বলেছেন, কিন্তু সে ভাষা লোকসমাজের ভাষা নয়, এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী ভাষা' বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমী' ভাষাও নয়।

উনিশ শতকে ভাষার যে লেখ্যরূপ তৈরি হয়েছিল তার ভোক্তাশ্রেণিতে স্থান পায়নি সে সময়ের বাঙালি নারীসমাজও, কারণ তারা দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থালির প্রয়োজনে বাংলার ব্যাবহারিক রূপটির সঙ্গে পরিচিত ছিল। নারীমুক্তি, নারীশিক্ষার পাশপাশি নারীর জন্য বোধগম্য একটি সহজবোধ্য বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা প্রকাশ করে *জ্ঞানাণ্বেষণ* পত্রিকা। প্যারীচাঁদ মিত্র ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন, কালীপ্রসন্ন সিংহও ছিলেন এই দলে। কিন্তু তাতে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের কোনো সুরাহা হয়নি, কারণ তাঁরা সহজ ভাষার সন্ধানে লোকসাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হননি, বরং কলকাতা ও তার আশেপাশের আঞ্চলিক-কথ্য ভাষার ভেতরে সেই সহজবোধ্যতা সন্ধান করেছেন। আলালী বা হুতোমী গদ্যভাষা শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয় আরও অনেক পণ্ডিতের সমালোচনার মুখে গতি হারায়। বাকি ছিল সংস্কৃতায়িত গদ্য যা গণমানুষের অন্তরে প্রবেশ করার গুণাবলি অর্জন করতে পারেনি, তারপরও এ ভাষা যাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল তাদের ভেতর অনেক সময় ভাষাচেতনার পরিবর্তে ধর্মীয় পবিত্রতার বোধ কাজ করেছে: "সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কাছে ওই বাংলা ছিল শুদ্ধাচারের প্রতীক, অবচেতনে ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে শ্রদ্ধেয় করত" (সেনগুপ্ত, ২০২২: ১৮৫)। অথচ এ ভাষা যাদের হাতে এবং যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তার সঙ্গে ধর্মবোধের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি সাহিত্যের বিষয়ও যে বাঙালির ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র" প্রবন্ধে সে বিষয়টিকে তিনি দেখেছেন 'গুরুতর বিপদ' হিসেবে:

> সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরেজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১: ৮৬২)।

বাংলা লোকসাহিত্য ভাবে ও ভাষায় একান্ত মৌলিক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের শিকড়সন্ধানী দৃষ্টির অভাবে *মৈমনসিংহ- গীতিকা*র গাথাসমূহে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও 'নভেলে'র ধারণা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে। আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ– এসব ক্ষেত্রে গীতিকার ভেতরে উপন্যাসের একটা ছাঁচ প্রস্তুত ছিল, বাংলা উপন্যাসের পরিচর্যা এখান থেকে ঐতিহ্যঋণ নিয়ে শুরু হতে পারতো, সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা তৈরি এবং উপন্যাসের জন্ম ত্বরান্বিত হবার সম্ভাবনাও ছিল:

> "পল্লী-সাহিত্যের ধারা যদি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ন থাকিত, গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা যদি কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করিত...তবে সম্ভবত বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মদিন আরও অগ্রবর্তী হইত" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৬: ১৬)।

ভাষার পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিচ্ছেদ-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তৎকালে বিতর্ক ও প্রতিরোধভাবনাও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন, সংস্কৃত ও ইংরেজি-আশ্রিত আধুনিক ভাষা-নির্মাণের পদ্ধতিকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। নতুন গদ্যভাষার দাপ্তরিক প্রয়োজনীয়তাকে তিনি খারিজ করেননি:

> "রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেভানো চলে না" (ঠাকুর, পৌষ ১৩৫৫: ৯২৩)।

লোকসাহিত্যের সহজ-স্বাভাবিক সাহিত্যরসের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক মূল্যকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তারপরও বিষয় ও ভাষা নির্বাচনে গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে সংযোহীনতার  দায় তিনি এড়াতে পারেননি, আধুনিক যুগের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর নামও উঠেছে অভিযোগের তালিকায়:

> "বাংলার লক্ষ লক্ষ পল্লী স্তব্ধ হইয়া রহিল; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ কি কথা বলিতে চাহিলেন, কি গান শুনাইলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এ ভাব যেন তাহাদের নয়, এ ভাষা যেন তাহাদের নিজের সুরে বাঁধা নয়..." (সেনগুপ্ত, ২০০২: ১৯৯)।

বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে লালিত খাঁটি বাংলা ভাষা রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুসৃত হয়নি, যার অনুশীলন অনায়াসে সম্পন্ন হয়েছিলো *ময়মনসিংহ-গীতিকায়*, মলুয়ার পিতৃ-পরিচয় বর্ণনার সূত্রে উঠে আসে গ্রামীণ কৃষিজীবী জনজীবনের কথা:

> সরু সশ্যে ভরা টাইল গোলা ভরা ধান।।
> ঘরে আছে দুধবিয়ানী দশ গোটা গাই।
> হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ  নাই।।
> বাইস আড়া জমীন তার সাইল আর আমন।
> ধনে পুত্রে বর তারে দিছে দেবগণ।। (*মৈমনসিংহ-গীতিকা* ১৯৭৩: ৫৬)

এটি গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জমি, হালের গরু, দুধেল গাভী, গোলাভরা ধান-চাল কৃষিজীবী মানুষের সম্পন্নতার পরিচয়। কৃষিজীবী গ্রামীণ জীবনচিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপকভাবে স্থান পায়নি, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলে আত্মসমালোচনা ও আত্মস্বীকারোক্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পরিণত বয়সে এসে তাঁর ব্যর্থতার দায় তিনি স্বীকার করেছেন *জন্মদিনে* কাব্যে। 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে' বসে নিচের সমাজটাকে তিনি অবলোকন করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন:

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। (ঠাকুর, বৈশাখ ১৩৫৫: ৭৫)

একদিন পদ্মায় নৌকাভ্রমণের সময় একদল মাঝির মুখে সমবেত সংগীত শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এসব গানের ভোক্তাপরিধি ব্যাপক, কিন্তু আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে কেবল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদার সংকীর্ণ পরিসরে আটকা পড়ে গিয়েছে, সাহিত্যের সর্বজনীন রূপটি এখানে অধরা। প্রতিদিনের পরিচিত জীবনাভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত বলেই লোকসাহিত্য এত প্রাণস্পর্শী:

"গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে" (ঠাকুর, ১৩৪৭: ৬৪১)।

এই জনজীবনের ভাব ও ভাষাকে তিনি আয়ত্ত করতে পারেননি বলে ভাবি কবির কাছে রেখে গেছেন তাঁর বিনম্র নিবেদন:

কৃষাণের জীবনের শরীক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
... ... ...
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়–
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
(ঠাকুর, বৈশাখ ১৩৫৫: ৭৯)

নাগরিক জীবনের কেন্দ্রে বাস করা শিক্ষিত সুশীল মানুষের বাইরেও সমাজ বিস্তৃত, তাদের সম্পৃক্ত করেই তৈরি হয় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস। প্রথমে সংস্কৃতায়িত বাংলা গদ্য এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষার দাপটে বিকল্প ধারা হিসেবেও লোকসাহিত্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল:

ইংরেজির অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা চাইলেন নানা ভাবনা প্রকাশের উপযোগী শাস্ত্রসম্ভব একটি বাংলা। কঠোর শব্দ এবং ধাতুর নব্য ধাতব-বাংলা আটকা পড়ল সংস্কৃত পণ্ডিত আর ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে। সে ভাষার সৃষ্ট সম্পদ গ্রাম-বাংলার শিক্ষিত মানুষেরও সম্পদ হল না। নতুন বাংলায় বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগল, আর

> পূর্বতন কবিগান, আখড়াই, পাঁচালি ইত্যাদির বিশাল সম্ভার সমাজের শীর্ষস্তরের অশ্রদ্ধায় ক্রমশ শুকিয়ে গেল। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত রয়ে গেল বিশাল গ্রাম-বাংলার মানুষের ভিতরে, বিশেষ করে পূর্ববাংলায়।...নব্যসাহিত্য সেখানে অনেক উপাদান, অনেক প্রেরণা পেতে পারত; কিন্তু পেতে ইচ্ছুক হলো না' (সেনগুপ্ত, ২০২২: ২৩)।

উনিশ শতকের ভাষা-বিতর্ক বিশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয় প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে। বিশ্বের অনেক সমৃদ্ধ সাহিত্য আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয়েছে, গ্রিসের সাহিত্য একাধিক ডায়ালেক্টে নির্মিত হয়েছিল– এসব বিষয়ে অবগত ছিলেন প্রমথ ফলে তিনি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে কথ্যভাষাকে সমর্থন করেছেন এবং কথ্যভাষাতে যে বড়ো সাহিত্য রচিত হতে পারে সে ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সমকালেও ভাষা নিয়ে যে 'বামনাই' আচরণ প্রচলিত ছিল তার সমালোচনা করে বলেছিলেন:

> আমরা সমাজের যেমন অধিকাংশ লোককে শূদ্র করে রেখে দিয়েছি, ভাষা রাজ্যেও আমরা সাধুতার দোহাই দিয়ে তারই অনুরূপ জাতিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি এবং অসংখ্য নির্দোষ বাংলা কথাকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করে তাদের সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে দিতে আপত্তি করছি (চৌধুরী, ১৯৫২: ২৬৪)।

বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত শব্দঋণ গ্রহণ করে তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। পর্তুগিজ, ফরাসি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি– প্রয়োজনে যে-কোনো ভাষা থেকে শব্দ আহরণের ব্যাপারে প্রমথের আপত্তি নেই। বাংলা ভাষার সংকট ছিল উভয়মুখী; একদিকে বাংলাকে 'যবন-দোষ' মুক্ত করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে ছিল 'হিন্দুয়ানি-মুক্ত' করার প্রচেষ্টাও। বিশ শতকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক নতুন করে ভাষায় আরবি-ফারসি প্রচলনের প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ভাষার এই উভয় সংকটের মুখে প্রমথ ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন: "বাংলা ভাষা হতে বাংলা শব্দসকল বহিষ্কৃত করে দিয়ে অর্ধেক সংস্কৃত আর অর্ধেক আরবি-পারসি শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে দুকূল রক্ষা হয়" (চৌধুরী, ১৯৫২: ২৭৭)। প্রমথ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে লোকমুখে প্রচলিত কথ্যভাষার সহজ ভঙ্গির ভিত্তিতে চলিত ভাষা নির্মাণের দিকে অগ্রসর হন। তিনি বারবার যেমন ভাষার সহজবোধ্যতার কথা বলেছেন তেমনি এ ভাষার ভোক্তাশ্রেণিতে কারা থাকবেন সেটিও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন 'বাঙালি ভদ্রলোক', 'ভদ্রসমাজ', 'শিক্ষিত সমাজ'– এসব শব্দ চয়ন করে। কিন্তু এই শব্দগুলো যে বাইনারি প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ 'বাঙালি অভদ্রলোক', 'অভদ্রসমাজ', অশিক্ষিত সমাজ'– এদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ধরন কেমন হতে পারে বা এই ধারাটির অবস্থান কী হবে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা তিনি দেননি। ফলে, বাংলার প্রান্তিক মানুষের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের কোনো সুরাহা প্রমথের চলিত ভাষার ভেতর দিয়ে আসেনি। বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় উপাদান-উপকরণ– আখ্যান, চরিত্র, নাট্যগুণ, কাব্যগুণ, রোমান্স, ট্র্যাজেডি– এসব থাকার পরও লোকসাহিত্য কেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের পূর্বসূরীর মর্যাদা পায়নি, কাব্যগুণ থাকা সত্ত্বেও কেন কাব্যের মর্যাদাও

নয়?– এসব প্রশ্ন ক্রমশ চাপা পড়ে গিয়েছে। লোকসাহিত্য মৌখিক, পারফরমেটিভ, যার জন্ম সামষ্টিক জীবনানুভব থেকে। লিখিত সাহিত্যের পূর্বে ' Orality' ছিল জ্ঞান সংরক্ষণের শক্তিশালী উপায়। ঔপনিবেশিক শাসন লিখিত সাহিত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে। উইলিয়াম জোন্স ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করায় সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল বাঙালির ল্যাটিন। সংস্কৃতকে প্রাধান্য দেয়ায় কারণ জ্ঞানকে এলিট এবং টেক্সুয়াল কাঠামোয় নিয়ে আসা। ইউরোপীয় রেনেসাঁ চেয়েছিল ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি, গ্রিক-ল্যাটিন ছিল ইউরোপের নিজস্ব 'Classical mirror', তাদের আত্মনির্মাণ; কিন্তু সংস্কৃত-প্রাধান্য বাঙালির জন্য ঔপনিবেশিক পুনর্নির্মাণ: "ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষা ইংরেজ সমাজের উপকরণ ইংরেজের সমাজ-সম্পর্ক হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙ্গিতেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের ছাঁচে গঠিত হইতেছে না– গঠিত হইতেছে 'ঔপনিবেশিক' ছাঁচে" (হালদার, ১৯৭৬: ১৮৪)। *Provincializing Europe: Postcolonial Though and Historical Difference* গ্রন্থে দীপেশ চক্রবর্তী ইউরোপকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বিকল্প আধুনিকতা ও আধুনিকতার বহুত্ববাদের কথা বলেছেন। এই বিকল্প আধুনিকতা লোকসাহিত্যকে কেন্দ্র করে দেশীয় পরিসরে বিকশিত হতে পারেনি, কারণ:

> ইউরোপ আধুনিকতার একটি নির্দিষ্ট রূপই গেঁথে দিয়েছে আমাদের মনে। জানিয়েছে আধুনিকতার সবচেয়ে বিকশিত রূপ দেখতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইউরোপের দিকেই। সেভাবে তাকাতে গিয়ে স্বভাবতই বাকি সব অ-ইউরোপীয় সমাজ নিজেদের দেখতে পায় 'অবিকশিত', 'অসম্পূর্ণ', 'সীমাবদ্ধ' হিসেবে (শাহাদুজ্জামান, ২০২৩: ৬১)।

উপনিবেশে দমননীতি কাজ করে নিজেদের ভেতর থেকে, উপনিবেশিত সমাজের ব্যক্তি নিজের সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাসকে নিম্নমানের ভেবে হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে। শিক্ষিত এলিট শ্রেণি ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করে ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, পরবর্তীকালে তাদের হাতেই নির্ধারিত হয় ভাষা-সাহিত্যের মানদণ্ড। উপনিবেশে যে ভাষা ক্ষমতার সবচেয়ে কাছাকাছি সেই ভাষাই মর্যাদা লাভ করে, ফলে স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতি হয়ে পড়ে প্রান্তিক। ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে উপনিবেশের প্রভাবে স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতি সংকটের মুখে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ২৫০টির বেশি আদিবাসী ভাষা এবং উপভাষার বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভাষা-রাজনীতির শিকার হয়েছে আফ্রিকাও। ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আফ্রিকান জনগোষ্ঠীকে সরাসরি ঔপনিবেশিক ভাষায় দীক্ষিত করা হয়েছিল, ফলে আফ্রিকান মৌখিক সাহিত্যধারা 'ওরাটিউর' মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তরুণ প্রজন্ম বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাদের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার থেকে। উপনিবেশ যে পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া কার্যকর করে তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো দিয়েছেন:

> Colonial alienation takes two interlinked forms: an active (or passive) distancing of oneself from the reality around; and an active (or passive) identification with that which is most external to one's environment. It starts with a deliberate disassociation of the language of conceptualization, of thinking, of formal education, of mental development, from the language of daily interaction in the home and in the community. It is like separating the mind from the body so that they are occupying two unrelated linguistic spheres in the same person. On a larger social scale it is like producing a society of bodiless heads and headless bodies (Thiog'o, 2007: 28).

নগুগি দীর্ঘদিনের নিরীক্ষণ শেষে উপলব্ধি করেছিলেন যে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। কারণ উপনিবেশিত রাষ্ট্রের নিজস্ব ভাষা ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। লোকভাষা ও সাহিত্য সহজাতভাবেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের বাহন, বিশেষ করে পিতৃতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও আধিপত্যকামী ঔপনিবেশিক শাসনের জন্য; এটি ঔপনিবেশিক মহাফেজখানা ও এলিট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে নির্মিত বহুস্বরিক স্বাধীন কণ্ঠ। টেক্সট-নির্ভর, স্থির ও অনুবাদযোগ্য এবং সীমিত মানুষের দখলে থাকা ভাষা-সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ, অন্যদিকে লোকসাহিত্যের তরল, জীবন্ত ও বহুস্বরিক ভাষা ঔপনিবেশিক আদর্শের জন্য অনুপযোগী। উনিশ শতকে নতুন গদ্যভাষা নির্মাণ এবং সাহিত্যে এর ব্যবহার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যকে অনেকটাই সাধন করেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উনিশ শতকে নির্মিত বাংলা গদ্যভাষা কি বাঙালির মাতৃভাষা নয়? এই ভাষা নির্মাণের নেপথ্যে যে সাংস্কৃতিক রাজনীতি ক্রিয়াশীল তাতে উপলব্ধি করা যায় যে, শাসন-শোষণের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত এ গদ্য ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে কাজ করেছে, বিশেষ করে যতদিন না ভারতের মাটিতে ইংরেজি ভাষার প্রসার ঘটেছে। *প্রবোধচন্দ্রিকায়* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল 'অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে'। এ শিরোনাম থেকে বোঝা যায় সংস্কৃতায়িত বাংলার নির্মাণ প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ ইংরেজ সাহেবদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল, দেশীয় পরিসরে যোগাযোগ রক্ষাই ছিল তার প্রধান উপযোগিতা। কিন্তু এই ভাষাকে সাহিত্যে ও সমাজে প্রতিষ্ঠাদানে কাজ করেছে উপনিবেশিত লেখক-বুদ্ধিজীবীরা। জনসংযোগবিচ্ছিন্ন দুর্বোধ্য এ গদ্যভাষা মাতৃভাষার আবরণে মোড়া 'মুণ্ডবিহীন শরীর', অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ভাষা ইংরেজিকে বলা যায় 'শরীরবিহীন মুণ্ড', ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। এই দুই ভাষার রাজনৈতিক চাপে প্রাকৃত বাংলা ও তার আঞ্চলিক রূপগুলো পরিণত হয়েছিল 'অপর' ভাষায় এবং এই ভাষায় নির্মিত সাহিত্যও হয়ে পড়েছিলো অপাঙ্‌ক্তেয়: "...অল্প কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, মোটের উপরে নবশিক্ষিত সমাজ আগেকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রত্যাখ্যানই করেছে" (সেনগুপ্ত, ২০২২: ১৯৪)।

### গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

এসব আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত বাংলা ভাষা এবং লোকসমাজের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আজও অমীমাংসিত। ভাষা যদি সমাজের দর্পণ হয়ে থাকে তাহলে উনিশ শতকে নির্মিত ভাষা-দর্পণে সমগ্র বাঙালি জাতির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েনি, খাঁটি বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংরক্ষিত রয়েছে লোকসাহিত্যের ভেতরে। একটি জাতির ভাষা কেবল বর্ণমালা ও ব্যাকরণ নয়; বরং ভাষিক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় সমাজ-পরিবেশ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমন্বয়ে যা সেই জাতির সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ও বহন করে। অতীত ঐতিহ্য এবং জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ভাষা প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে, শিকড়শূন্য উন্মূল ভাষা জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয়। লোকসাহিত্য ছিল একটি স্বতঃসিদ্ধ সাংস্কৃতিক জ্ঞানব্যবস্থা, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*র নান্দনিকতা, আধুনিকতা ও সমাজ-অভিজ্ঞতাকে আধুনিক সাহিত্যের বাইরে রাখার কারণটি তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক নয়। লোকসাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেকার সংযোগসূত্র এবং সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে দেশীয় আধুনিকতা (Indigenous modernity) বিকশিত হবার সম্ভাবনা চাপা পড়ায় ঔপনিবেশিক শাসনামলে সৃষ্ট ভাব ও ভাষা এবং সেই ভাব ও ভাষায় নির্মিত সাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য হিসেবে বৈধতা প্রদান করা হয়, এখানে ঔপনিবেশিক জ্ঞানরাজনীতি একটি বড়ো প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

### উপসংহার

লোকসাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের একমাত্র কারণ উপনিবেশ নয়, তবে প্রধান কারণ। বাকি কারণগুলোর পেছনেও প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে কলোনিয়াল পলিসি। উপযুক্ত মূল্যায়ন ও চর্চার অভাবে লোকসাহিত্য জনমানসের বৃহত্তর পরিসর ছেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানসমুক্তির জন্য প্রয়োজন ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রকৃত পাঠ, এই পাঠ ও চর্চার ভেতর দিয়ে উন্মুক্ত হতে পারে বিকল্প আধুনিকতা অর্থাৎ দেশীয় আধুনিকতা অনুসন্ধানের পথ। বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার স্বরূপ অনুসন্ধান, ইউরোপীয় সার্বজনীনতার পরিবর্তে আধুনিকতার বহুত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান পাথেয় হতে পারে লোকসাহিত্যের মতো ঐতিহ্যবাহী অতীত।

### তথ্য-নির্দেশ

#### মূলগ্রন্থ

*মৈমনসিংহ-গীতিকা*। (১৯৭৩)। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, বি.এ, ডি. লিট (সংকলক), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়: কলকাতা।

**সহায়ক গ্রন্থ**


আজম, মোহাম্মদ। (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ।* আদর্শঃ ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। (১৯৯১)। *বঙ্কিম রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড। সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.), কামিনী প্রকাশালয়ঃ কলকাতা।

চৌধুরী, প্রমথ। (১৯৫২)। *প্রবন্ধসংগ্রহ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগঃ কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। ষষ্ঠ খণ্ড। বিশ্বভারতীঃ কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (বৈশাখ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। পঞ্চবিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতীঃ কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (পৌষ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। ষড়বিংশ খণ্ড। বিশ্বভারতীঃ কলকাতা।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। (১৯৯৫)। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.)। *মধুসূদন: কাব্যসমগ্র*। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৯৬)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলকাতা।

সেনগুপ্ত, প্রসাদ। (২০২২)। *নবজাগরণের বঙ্গ ও বাঙালি*। সিগনেট প্রেসঃ কলকাতা।

হাকিম, আবদুল। (১৯৮৯)। রাজিয়া সুলতানা (সম্পা.)। *আব্দুল হাকিম রচনাবলী*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ঢাকা।

হালদার, গোপাল। (১৯৭৬)। *সংস্কৃতির রূপান্তর*। মুক্তধারাঃ ঢাকা।

Thiog'o Ngugi wa. (2007). *Decolonising the Mind.* Book Land Publishing Co.: Delhi.


**প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা**


শাহাদুজ্জামান। (২০২৩)। *আমার দীপেশ আবিষ্কার*। আহমেদ কামাল, নুসরাত সামিনা চৌধুরী, নাজমুল সুলতান ও অন্যান্য (সম্পা.), *সময়ের কুয়াশায়*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডঃ ঢাকা।

সিলি, বি ক্লিনটন। (৩০শে জুন, ২০২৫)। মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র। *প্রথম আলো*। প্রবেশ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, https://www.prothomalo.com

# মাতৃভাষার গুরুত্ব ও ভাষা আন্দোলনঃ ইসলামি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

**Abstract:** Language is the sounds that people use to express their thoughts. Without mother language, people cannot express their feelings satisfactorily. Mother language is an immense blessing from Almighty Allah. There are more than six thousand languages in the world. These languages are the mother language of each population. Allah Subhanahu Wa Ta`ala has sent numerous Prophets and Messengers (Alyhimus Salam) throughout the ages to guide mankind to the right path. The heavenly books that were revealed to them were in the language of the native people of those prophets and messengers. If the heavenly books sent to the prophets and messengers had not been revealed in their native languages, their nations and communities would not have been able to understand them. If the heavenly books had been revealed in a language other than the native tongues of the prophets and messengers, it would have been much more difficult for the prophets and messengers to call their communities to the light of religion. Therefore, it can be said that the importance of the mother language in Islam is immense.

**মূলশব্দ (Keyword):** ভাষা (Language), কুরআন (Quran), হাদিস (Hadith), বাংলা (Bangla), মাতৃভাষা (Mother Language) ও ইসলাম (Islam)

## ভূমিকা

ইসলাম মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে, দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম তথা হালাল-হারাম এবং কর্তব্য ও অধিকারের সীমা

---

* ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ইমেইল: shahidulmuhammad@gmail.com

নির্ধারণ করে মানবজীবনের লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছে। নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল, ভাষা বা জনগোষ্ঠীতে একে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণার জন্য ইসলামের প্রধান উৎস কুর'আন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের পর তা করা উচিত। যার যতটুকু ভাল আছে, তা গ্রহণ করা এবং মন্দটুকু বর্জন করা ইসলামের রীতি। প্রত্যেকের মাতৃভাষা সর্বস্তরে চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে এর উৎকর্ষ সাধন করার কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার। বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ই ফাল্গুন। যা আজ ৭০ বছর ধরে এ দেশ মাতৃকায় একুশে ফেব্রুয়ারি নামে ভাষা আন্দোলনের স্মরণ দিবস হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যের সাথে উদযাপিত হয়ে আসছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত একটি ভাষা। এই স্বীকৃতি আমরা পাই ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ঘোষণার মাধ্যমে। মাতৃভাষা ব্যবহার এবং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে। মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দীপ্ত শপথ নিয়ে বাংলার কিছু অকুতোভয় বীর সন্তান নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রচনা করে এক সূর্যস্নাত রক্তিম ইতিহাস। যা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আরো গভীরে নিয়ে গেছে। এখানে একটি প্রশ্ন প্রায়ই অনেকের মনে দোলা দেয়, একটি ভাষা নিয়ে সমাজ পরিবেশ এতো উত্তেজিত করা বা আন্দোলনে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু মানানসই? ইসলাম কি কোন ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য আন্দোলন চালাতে এসেছে? ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা কী? এ সম্পর্কেই আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

## গবেষণা সমস্যার বিবৃতি

মাতৃভাষায় কথা বলা প্রতিটি মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। এ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া ঐ জাতির উপর অন্যায়-জুলুমের নামান্তর। বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ই ফাল্গুন বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা উর্দু থেকে বাংলা করার জন্য যে আন্দোলন হয় সেটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন নামে খ্যাত। ভাষা আন্দোলনকে বাংলাদেশের ইসলামিক চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে মনে করে থাকেন। যা কিছুটা হলেও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণার জন্ম দেয়।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

ইসরাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একজন মুসলিম তার জীবনে যা কিছুই করুক না কেন তা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হলে তা অবশ্যই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশে মাতৃভাষা আন্দোলনকে নিয়ে অনেক কথা শুনা যায়। সে ধারণাকে স্পষ্ট করতে এবং মাতৃভাষা আন্দোলনের সাথে ইসলামের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে সেটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

## সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বিদ্যামান ভাষা আন্দোলনের উপর কুরআন-হাদিস ভিত্তিক কোনো গবেষণা একেবারে হয়নি বললেই চলে। কিছু কিছু ইসলামিক গবেষক দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় ছোটো ছোটো প্রবন্ধ লিখেছেন যা অতি সামান্য। তবে বাংলা ভাষা আন্দোলনের উপর শতাধিক গ্রন্থ প্রণিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম হলো আবুল কাসেম ফজলুল হক রচিত *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*, ১৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটি ২০২২ সালে জাগৃতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে; শেলী সেনগুপ্তা কর্তৃক বিরচিত *নারীর ভাষা আন্দোলন*, গ্রন্থটি ২০২৩ গ্রন্থ কুটির থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২; মোস্তাক আহ্‌মাদ রচিত *ভাষা আন্দোলন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি*, গ্রন্থটি গ্রন্থকুটির থেকে ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়; ১৯১৮ সালে জহিরুল হক বাপি রচিত *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তির সংগ্রাম*, গ্রন্থটি নবরাগ প্রকাশনী থেকে প্রাকশিত হয়; ফজলুল করিম রচিত অনুপম প্রকাশনী ২০১৪ সালে প্রকাশিত *বায়ান্ন'র কারাগার*, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮; অমল সাহা রচিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থটি ২০১৮ সালে শ্রাবণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়; ড. গুলশান আরা রচিত *ভাষা আন্দোলনের কথা*, গ্রন্থটি ২০১৯ সালে এশিয়া পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়; ইসমাইল হোসেন বকুল রচিত *ভাষা আন্দোলন ও রক্তঝরা একুশ*, এশিয়া পাবলিকেশন্স থেকে গ্রন্থটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়; এম আর আখতার মুকুল রচিত *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ৩০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত ২০১৪ সালে শিখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ইত্যাদি। এছাড়া কিছু জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়ও এ বিষয়ে অতি সামান্য কলাম প্রকাশিত হয়েছে।

## গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের জন্য কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর মৌলিক রচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। উদ্বৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে APA স্টাইল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

## ভাষা শব্দের অর্থ

প্রত্যেক প্রাণীর মনের ভাব প্রকাশের ভঙ্গিকেই ভাষা বলে। তা কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গর ইশারার মাধ্যমে হোক। ভাষার সংজ্ঞা প্রদানে ড. রামেশ্বর বলেন: "মানুষের বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলো ধ্বনিগত ভাব সংকেত বা প্রতীক সমষ্টির নাম" (রামেশ্বর, ১৩৯৯: ৮)।

এ প্রসঙ্গে Henry Sweet বলেন:

> Language is the expression of ideas by means of speech-sounds combined into words. Words are combined into sentences, this combination answering to that of ideas into thoughts (Encyclopedia of Britanica, 1980, P. 642).

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী Edgar. H. Sturtevant বলেন:

> A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group Co-operate and interect (Edger H. 1947; Chapter-1).

মানুষ সামজিক জীব। এজন্য তাকে অন্য মানুষের সাথে ভাব বিনিময় করতে হয়। এ ভাব বিনিময়ের জন্য যে সব সংকেত প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাই ভাষা, এভাবে বিশ্লেষণ করলে ভাষার চারটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়: ক. এ কতগুলি ধ্বনির সমষ্টি, খ. এ ধ্বনি কণ্ঠনিঃসৃত, গ. এটি একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা, ঘ. এ ধ্বনিগুলো বস্তু বা ভাবের প্রতীক (আউয়াল, ২০০০: ১১)।

মনজুর মোরশেদ বলেন,

> ভাষা হচ্ছে মানুষের ভাব বিনিময় ও প্রকাশের প্রতীকী প্রত্যয় বিশেষ। এটি ধ্বনি ও ইশারা ও ইঙ্গিত উভয়কেই অন্তর্ভূক্ত করে। তবে পারিভাষিক অর্থে কারো কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনিকেই ভাষা নামে অভিহিত করা হয় (মোরশেদ, ১৯৮৫: ১)।

### আন্দোলন শব্দের অর্থ

'আন্দোলন' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচার বা আলোচনা দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টিকরণকেই আন্দোলন বলে (শরীফ, ১৯৯২: ৪৫)। কাজেই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা কী? তা নির্ভর করে ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের উপর।

### বাংলাভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথমত মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা ব্যবহার এবং তার সার্বিক উৎকর্ষ সাধন ও চর্চা করার অধিকার আদায় করা। বাঙালি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল ধর্মের বুদ্ধিজীবীরা সে নিষেধাজ্ঞা এবং ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বাংলাভাষায় বিবিধ সাহিত্য রচনা করে এ ভাষার ভান্ডার বিবিধ রতনে সমৃদ্ধ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে চীন ও রাশিয়ার স্টাইলে ভাষাগত ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তোষণকারী অনুসারীরা উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল ভাষাতত্ত্বের এক ভুল ব্যাখ্যার ছত্রছায়ায়। তারই প্রতিবাদে বাংলাভাষা আন্দোলন নতুনরূপে বেগবান হয় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য (রহমান, ২০০১: ১৫)।

বাংলাভাষার জন্য আন্দোলনের অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে অফিস আদালতসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা, জাতীয় স্বকীয়তা ও পরিচিতি সারা বিশ্বে আরো উন্নত করা। এজন্য বাংলাভাষা আন্দোলনের অন্যতম শ্লোগান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' (ইসলাম, ২০০৪: ৫১)।

ভাষা আন্দোলনের অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করার জন্য ভাষা আন্দোলন। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা উপেক্ষা করে অন্য একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা চরম অন্যায়, তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি। এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে বাংলাভাষা আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে এটি বাংলাদেশের অবহেলিত জনতার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয়।

## ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা

মানুষ তার শৈশব থেকে কথা বলতে শিখলেই যে তার ভাষা শুদ্ধ হবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। কোনো ভাষায় শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে কথা বলতে হলে, সাহিত্য রচনা করতে হলে সে ভাষা চর্চা করতে হবে। এ জন্য পড়তে হবে, বিশেষ বিশেষ বক্তব্য আত্মস্থ করতে হবে, আবৃত্তি করতে হবে, ভাষাশৈলীর রহস্য জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। তা হলেই একজন মানুষ বাগ্মী ও পরিশীলিত বক্তব্যের অধিকারী হতে পারে। ইসলাম মানুষের ভাষাকে বিভিন্নভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছে। আর তা হলো, মানুষ জন্মলগ্ন থেকে যে ভাষায় কথা বলে, বড় হয়ে উঠে, সে ভাষায় কথা বলার অধিকার তার জন্মগত অধিকার ও সহজাত প্রবৃত্তি। আর স্বভাব ধর্ম ইসলাম মানুষের এ স্বাভাবিক আকর্ষণ সহজেই স্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

> فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
> ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

> অতএব (হে নবি), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে সঠিক দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখো, আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মনুষকে

> পয়দা করেছেন; (মনে রেখো) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ জীবনবিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না (আল-কুরআন, ৩০: ৩০)।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর প্রেরিত প্রত্যেক নবিকে স্বজাতির ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ ভাষাতেই কিতাবাদি নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

> আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (আল-কুরআন, ১৪: ৪)।

আর এ কারণেই আল-কুর'আন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে।

সকলেরই মাতৃভাষা চর্চা, একে উন্নত করার অধিকার রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করা কর্তব্যও বটে। মূল আরবি ভাষা এক হলেও আরবদের গোত্রভেদে উচ্চারণ ও পঠনরীতির মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। ইসলাম ভাষাগত আঞ্চলিকতা তথা মাতৃভাষার প্রতি এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, আল-কুর'আন আরবের বিভিন্ন পঠনরীতিতে পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এ জন্য কুর'আনের পাঠ সাত ক্বির'আত (পঠনরীতি) প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন:

> إن القرآن أنزل على سبعة حروف فاقرؤوا ما تيسر منه.

> নিশ্চয়ই কুর'আন সাত হরফে বা উপভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, এসকল ভাষার মধ্যে যে ভাষাটি (তোমাদের কাছে) সহজ হয়, সেভাষাতেই তোমরা তা পাঠ কর। (বুখারি, হাদিস নং-৪৭৫৪)

এতে সহজেই অনুধাবন হয় যে, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। উভয়টি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের অন্যতম উৎস। কেননা, মাতৃভাষা মানুষের পবিত্র এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এ ভাষার মধ্যে মানুষ অংকুরিত হয়। এ ভাষার মধ্যে মানুষ সর্বদা প্রবাহিত থাকে। উল্লেখ্য যে, ভাষা বিকৃতি করাও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, আহলে কিতাবগণ বিকৃত উচ্চারণ ও মুখ বাঁকিয়ে গ্রন্থ পাঠ করে ভাষাগত জটিলতা সৃষ্টি করত এবং তাদের অনুসারীদের ধোঁকা দিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভাষাগত বিকৃতি পছন্দ করেননি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে, অথচ তারা যা পাঠ করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে : এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল কৃত অথচ এসব আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়। তারা বলে: এটি আল্লাহর কথা, অথচ আল্লাহর কথা নয়; আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে (আল-কুরআন, ৩: ৭৮)।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

কোনো কোনো ইহুদি তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে: আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে: শোন না শোনার মত, মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শণের উদ্দেশ্যে বলে 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল), অথচ যদি তারা বলত : আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি (এবং যদি বলত), শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে সেই ছিল তাদের জন্য উত্তম, আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর কারণে। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ঈমান এনেছে (আল-কুরআন, ৪: ৪৬)।

সুতারাং উচ্চারণ বিকৃতি তথা ভাষা বিকৃতি ইসলামে নিষিদ্ধ। এ জন্য দেখা যায়, মূসা (আ.) স্বীয় ভাষায় উচ্চারণ বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي.

আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে (আল-কুরআন, ২০: ২৭-২৮)।

## ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা

ভাষা আন্দোলনের পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যের মাঝে এখানে মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকারের বিষয়টি আসে। এর ব্যাখ্যা করতে গেলে আল-কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে

দৃষ্টিপাত করলে মানুষের মাতৃভাষা ব্যবহার করা এবং এ ব্যবহারের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সম্পর্কে অনেকগুলো দিক পাওয়া যায়। যেমন:

ইসলাম ঘোষণা করেছে, মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের সৃষ্টিগত তথা জন্মগত অধিকার। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সাথে সাথে তাকে তার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.
>
> দয়াময় আল্লাহ। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে (আল-কুরআন, ৫৫: ১-৪)।

এ আয়াতে মানব সৃষ্টির সাথে ভাষা শিক্ষার বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। এটির কারণ হলো ভাষা মানুষ সৃষ্টির একটি অবিভাজ্য বিষয়। যে ভাষার মাধ্যমে পরস্পরে ভাব বিনিময় করবে, সে ভাষাই হবে পরস্পরের সম্পর্কের সেতুবন্ধন। মানুষের ভাষা মহান আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নি'আমত। আর মানুষের এ ভাষা কৌশল আল্লাহর ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আদম আ.কে সৃষ্টির সাথে সাথেই তাঁকে ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

> وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
> قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ.إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
> الْحَكِيمُ . قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
> أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.
>
> আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেই সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন : 'এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল: 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন: 'হে আদম! তাদেরকে এই সকল নাম বলে দাও। সে তাদেরকে এ সকলের নাম বলে দিলে তিনি বললেন: 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি? (আল-কুরআন, ২: ৩১-৩৩)।

আলোচ্য আয়াতের أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ অংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাষাকে বুঝানো হয়েছে (আলুসী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৬১) ।

মাতৃভাষার সাথে মানুষের আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃ ভাষা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের সত্ত্বাগত ও স্বভাবজাত তথা জন্মগত মৌলিক

অধিকার। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন অধিকার আদায়ের আন্দোলন। আর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে ইসলাম বিভিন্নভাবে মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। আর অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামে যুদ্ধের প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করে অধিকার আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

> যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম (আল-কুরআন, ২২: ৩৯)।

আর এ অধিকার আদায় করতে যেয়ে সংঘর্ষ হলে তাতে যদি কেউ ইন্তিকাল করে তাহলে তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে। কিয়ামতে যার প্রতিদান হবে জান্নাত। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন:

من قتل دون حقه فهو شهيد.

> কোনো নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত (মুসলিম) নিজের অধিকার তথা হক আদায়ে যুদ্ধ করে নিহত হলে সে শহিদ (আবূ ইয়া'লা, ১৪০৪, হাদিস নং-৬৭৭৫)।

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সত্যের পথে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করাই সর্বোত্তম জিহাদ। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ সা'ঈদ আল-খাদুরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন:

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . أو أمير جائر .

> অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক তথা সঠিক কথা বলা অর্থাৎ ন্যায় অধিকার প্রদান করার স্পষ্ট দাবি করাই শ্রেষ্ঠ জিহাদ (তিরমিযী, ১৪২১, হাদিস নং-২১৭৪)।

ইসলাম এমন কথা বলে না যে, যেহেতু আল-কুর'আন আরবি ভাষায় এবং শেষ নবি সারা বিশ্বের মানুষের নবি আরবি ভাষাভাষী, সেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের ভাষা হবে 'আরবি এবং তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করে শুধু 'আরবি ভাষায় কথা বলতে হবে। এর সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ কুর'আন ও হাদিসে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্রতাকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে, এ বৈচিত্রতা মানুষের হাতে গড়া নয়। এটি আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টিকুলে এক রহস্যময় নিদর্শন স্বরূপ। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ .

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম নিদর্শন হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণে বৈচিত্রতা। নিশ্চয়ই এতে পৃথিবীবাসীর জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন (আল-কুরআন, ৩০: ২২)।

কথা বলা বা ভাব প্রকাশের মাঝে একই রকম কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন কোকিলের সুরে যেমন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন মানুষের সুরে ভাষারও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি তথা আবহাওয়াজনিত কারণে বাক্য বিন্যাস বৈচিত্রতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে ভাষায় বিভিন্নতা অহরহ বৃদ্ধি পাচ্ছে (ইব্ন খালদূন, ১৯৭৯, খ. ১, পৃ. ৭১)।

বর্তমান বিশ্বে ভাষার সংখ্যা ২৭৯৬টি। ক্রমান্বয়ে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশেই বাংলা ভাষাতে বৈচিত্র লক্ষণীয়। তাই পৃথিবীর অসংখ্য ভাষাকে একটি ভাষায় রূপ দেয়া ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ সুন্দর পৃথিবীর মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রায় লক্ষাধিক নবি প্রেরণ করেছেন। এমনকি প্রত্যেক সম্প্রদায় তথা জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নবি পাঠিয়েছেন। কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর এমন কোনো জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি (আল-কুরআন, ৩৫: ২৪)।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হিন্দুস্থান, চীন, আরব, গ্রিক তথা সারা বিশ্বের ভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের ভাষা ছিল মাতৃভাষা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

এ পৃথিবীতে আমি যত নবি রাসূল পাঠিয়েছি, প্রত্যেককে তার মাতৃভাষা তথা স্বজাতির ভাষাভাষী করেই পাঠিয়েছি এজন্য যে, তারা যেন মানুষের নিকট আমার দেয়া দাওয়াত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারেন (আল-কুরআন, ১৪: ৪)।

এ আয়াতের মাধ্যমেও পৃথিবীর সকল ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আমরা যদি প্রাচীন নবি-রসুলদের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রসিদ্ধ আসমানি গ্রন্থগুলো বিভিন্ন ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন: তাওরাত হিব্রু ভাষায়, যাবুর গ্রিক ভাষায়, ইঞ্জিল সুরিয়ানি ভাষায় এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারিম 'আরবি ভাষায়। এটাও

ভাষা বৈচিত্র্য স্বীকৃতির জ্বলন্ত প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো-ভাষী নিয়োগ করতেন। সকল দেশের সকল ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবি (সা.) যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.)-কে বিদেশি ভাষা শিক্ষা করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বুঝে তাদের চিঠিপত্র পড়া, লিখা ও ভাব বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে কিছু কিছু এলাকার অধিবাসীরা তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছে, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মাতৃভাষা ব্যবহার করার জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন করছে। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট ভাষাভাষী জাতি তাদের পরিচিতি বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় একটা জাতীয় প্রতীক ধারণ করা ইসলাম বৈধ হিসেবে দেখে। বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতির সেই প্রতীকী স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তাকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়। আল-কুর'আনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء...

হে মানবজাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী।... (আল-কুরআন, ৪: ১)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি হতে পার। তবে তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক আল্লাহকে ভয় করে (আল-কুরআন, ৪৯: ১৩)।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে আদম ও তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবকুল ছড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) 'তা থেকেই তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন' এবং (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে' আয়াতাংশদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার থেকে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁদের উভয় থেকে

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভেদে পৃথিবীর সকল মানব-মানবিকে সৃষ্টি করেছেন। আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলার পরিকল্পনা ছিল তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা পাঠাবেন। এর অপরিহার্য অবলম্বন হিসেবেই তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে সৃষ্টিকর্মের এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয় পরিচয় মেনে নেয়া হয়েছে পরিচিতি তথা বিভিন্ন রকম বিনিময় ও সহযোগিতায় সুবিধার্থ। তবে এটাকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হিসেবে ধরা যাবে না। আলোচ্য আয়াতে এটাই বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণেও এ ঘোষণা দিয়েছিলেন:

عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال : يا أيها الناس أن ربكم واحد و إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي و لا لأحمر على أسود و لا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সা. আইয়্যামে তাশরীকের দিন বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন: হে মানুষের! তোমাদের প্রতিপালক একজন, তোমাদের পিতা একজন, সাবধান! অনারব লোকদের উপর আরবীয় লোকদের, আরবীয় লোকদের উপর অনারবের কোনো প্রাধান্য নেই, তেমনিভাবে লালের উপর কালো আবার কালোর উপর লাল বর্ণের লোকের কোনো প্রাধান্য নেই। তাদের মধ্যে সেই প্রাধান্য পাবে যে মুত্তাকী ও খোদাভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সম্মানিত যে বেশি আল্লাহকে ভয় করে” (বাইহাকী, ১৪১০, হাদিস নং-৫১৩৭)।

পূর্বে আমরা দেখতে পেয়েছি, মাতৃভাষা সম্পর্কে ইসলাম কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছে। কোনো রকম জাতীয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করলেই তা ইসলাম বিরোধী হবে, এমন ধারণা করা ঠিক নয়। নবিগণের জীবনে জাতীয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়।

মূসা (আ.) স্বীয় জাতি বনী ইসরাঈলদের স্বার্থে তথা ফির‘আউনের নিপীড়ন থেকে স্বজাতির মুক্তির জন্য ফির‘আউনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং ফির‘আউনের জাদুকরদের সাথে জাদু যুদ্ধের বিরোধীতা করে বিজয়ী লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুর’আনের ঘোষণা:

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ . وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ . قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.

ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সঙ্গে যেতে দাও₄ ফির'আউন বলল: 'যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তাহা পেশ কর₄ অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হল। আর সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। ফির'আউন-সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল: 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করতে চায়, এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও? তারা বললো, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও (আল-কুরআন, ৭: ১০৫-১১১)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল: 'আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ (আল-কুরআন, ২০: ৪৭)।

উল্লেখ্য যে, বনি ইসরাইলদের সব লোক কিন্তু মুসলমান ছিল না। তবুও মূসা আ. এরকম বক্তব্য ফির'আউনের নিকট উপস্থাপন করেছেন একমাত্র জাতীয় স্বার্থে।

জাতীয় স্বার্থে কাজ করা ইসলামের পরিপন্থি নয় যদি না সেটি ইসলামের মৌলিক আকিদা, বিশ্বাস, আচার-আচারণের সাথে দ্বান্দ্বিক হয়। যেমন ইসলামি দা'ওয়াতের পথে বাধা নিরসনের লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে হবে। এটি ইসলামের মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। এ সম্পর্কে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

বল: তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য-যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান -যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না (আল-কুরআন, ৯: ২৪)।

এ আয়াতে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের মৌলিক স্বার্থকে পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং এর পরিপন্থি কোন ভূমিকার ব্যাপারেও মানব সমাজকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে কোনো ভাষা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পেলে তার উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বৃদ্ধি পাবে। সে অর্থে জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হলে সেটি ইসলামের মূল্যবোধ ও জীবনবোধের পরিপন্থি হবে না। কোনো এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা উপেক্ষা করে অন্য ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা চরম অন্যায়। এ অন্যায় প্রতিরোধ করতে হবে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাভাষা আন্দোলনে তাই ঘটেছে। যে জন্য এটা অবশেষে এ অঞ্চলের অবহেলিত জনতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীকরণ তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয়। সুতরাং স্বাধিকার আদায়ের অর্থে ভাষা আন্দোলনের ব্যাখ্যা করা হোক, আর প্রেরণা গ্রহণ করা অর্থে হোক, তা ইসলামের পরিপন্থি নয়; বরং এ সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা সুস্পষ্ট। বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদিস রয়েছে এ ব্যাপারে। সবগুলোয় প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার প্রদান করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। এ স্বল্প পরিসরে সূরা নিসার একটা আয়াতই যথেষ্ট মনে করছি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (আল-কুরআন, ৪: ৫৮)।

ইসলাম মাতৃভাষার উপর পূর্ণ গুরুত্বারোপ করে থাকে, মাতৃভাষার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে তার সমৃদ্ধিতে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিভিন্ন ভাষার স্বীকৃতি দেয়, ভাষা বৈচিত্র্যকে সৃষ্টিকলার রহস্য মনে করে, বিভিন্ন ভাষায় ইসলামকে তুলে ধরার জন্য অনুপ্রাণিত করে। ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের ভাষার বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে না। কোনো মুসলমান যদি ভুলবশত এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, তবে সেটা তার নিজস্ব।

ইসলাম মানবজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে। দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম তথা হালাল-হারাম এবং কর্তব্য ও অধিকারের সীমা নির্ধারণ করার মাধ্যমে মানবজীবনের লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চল, ভাষা বা জনগোষ্ঠীতে একে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয়। ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণার জন্য ইসলামের প্রধান উৎস কুর'আন-সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনের পর তা করা উচিত। যার যতটুকু ভাল আছে, তা গ্রহণ করা এবং মন্দটুকু বর্জন করা ইসলামের রীতি। প্রত্যেকের মাতৃভাষা সর্বস্তরে চর্চা ও

অনুশীলনের মাধ্যমে এর উৎকর্ষ সাধন করার কাজে নিয়োজিত হওয়া দরকার। বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য বিশ্বের প্রতিটি ভাষারই চর্চা করা ইসলামি দা'ঈদের কর্তব্য। অতএব, প্রতিটি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য গড়ে তুলে মানব কল্যাণে কাজ করতে হবে। জাতীয়তার প্রেক্ষিতে যেমন ইসলামের সর্বজনীনতা সীমিত করা ঠিক নয়, তেমনি ইসলামের বিশ্বজনীনতার কথা তুলেও কোনো অঞ্চলের ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা বা তার গুরুত্ব উপেক্ষা করা অবৈধ।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের দিকে পথ দেখানোর জন্য এবং নবি ও রাসূলদের মূল কাজ ছিল দাওয়াত দেয়া। তাই দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ জন্য ভাষা চর্চা ও সমৃদ্ধির জন্য ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং ভাষা চর্চা বা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই পূণ্যের কাজ বলেই মনে হয়। কেননা কোনো জাতির নিকট দাওয়াত দিতে গেলে আগে ঐ জাতির ভাষা দাঈকে অবশ্যই জানতে হবে এবং তাদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। এজন্য মূসা আ. আল্লাহর নিকট তার ভাষা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর ভাইয়ের নবুওয়াতী দাবি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ.

> আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাষায় কথা বলতে পারে, সুতরাং আপনি তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন (আল-কুরআন, ২৮: ৩৪)।

কাজেই ইসলামি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

## ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা শহিদদের মূল্যায়ন ও আমাদের করণীয়

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ৮ই ফাল্গুন বাংলাভাষা আন্দোলন রক্তঝরা, অগ্নিঝরা এক মহান স্মৃতি বিজড়িত একটি দিনের নাম। যা যুগে যুগে সারা বিশ্বের মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। ইতিহাসের সে অধ্যায় রচিত হয়েছিল এ পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) কিছু অকুতোভয় যুবক সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতের মত আরো অনেক যুবকের তাজা রক্তের বিনিময়ে। মাতৃভাষা বাংলাভাষা, যে ভাষার সাথে এ দেশের মানুষের নাড়ির সম্পর্ক। সে ভাষায় কথা বলা তথা মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা নিজেদের মহামূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাদের এ আত্মদানকে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে, তারা শহিদ কি-না?

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একক সাবভৌমত্ব, শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও শেষ বিচারের দিনসহ পরকালীন অন্যান্য

বিষয়ের প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাদান এবং রিসালাতের মাধ্যমে মহানবি (সা.)-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহ প্রদত্ত মানবজীবনের বিধান সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নের সংগ্রামে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে মৃত্যু বরণ করাকেই শহিদ বলে।

মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের সৃষ্টিগত তথা জন্মগত অধিকার। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সাথে সাথে তাকে তার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

> দয়াময় আল্লাহ। তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ। তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে (আল-কুরআন, ৫৫: ১-৪)।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির সাথে ভাষার এক অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই মাতৃভাষা মানুষের একটি সৃষ্টিগত অধিকার। তাই কেউ যদি এ অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায় তার প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। আর এ প্রতিরোধে কেউ নিহত হলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে শহিদের মর্যাদা পাবে। তবে শর্ত হলো, তাদেরকে প্রকৃতভাবে এমন মুসলমান হতে হবে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহত হয়। এখানে আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় আর তা হলো, যারা নাস্তিক তারাও ভাষা আন্দোলনে নিহতদেরকে শহিদ বলে থাকেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ বলে মনে হয়। কেননা তারা তো আল্লাহ ও পরকালকেই বিশ্বাস করেন না। তাই শহিদ বলতে ইসলামের সেই শহিদ মনে করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের নিকট শহিদ অর্থ হলো স্মরণীয় অনুকরণীয় মডেল মনে করা। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে যেমন রয়েছে পারিভাষিক জটিলতা, তেমনি রয়েছে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অবস্থাগত অস্পষ্টতা। সুতরাং যিনি যে ধরনের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, তিনি সে অনুসারেই ভাষার জন্য শহিদ হওয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করবেন। আর এটাই হওয়া স্বাভাবিক (আন্ওয়ারী, ২০০৩: ১০৪)।

আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। আমরা আজ মাতৃভাষায় কথা বলি। এর পেছনে এ সকল শহিদদের অবদানই সর্বাগ্রে। কাজেই এ ভাষা শহিদদের প্রতি আমাদেরও কিছু করণীয় রয়েছে। তাই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় যেসকল অকুতভয় মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিল তারা যদি ইসলামি শাহাদাতের শর্তগুলো পূরণ করে থাকেন, কুর'আন-হাদিসের আলোকে তাদেরকে আমরা জান্নাতবাসীই বলব। তাদের নাজাতের ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। অন্যথায় তাদের ভিতর যদি সে রকম শর্তাবলি অনুপস্থিত থেকেও থাকে, তবুও তারা যেহেতু আমাদের অধিকার আদায়ের জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সুতরাং মুসলমান হিসেবে তাদের জন্য আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে মাগফিরাত তথা ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া। কেননা, এটি একটি সদকায়ে জারিয়ার মতো। আর

এ সম্পর্কে হাদিসের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যদি কেউ কোনো সদকায়ে জারিয়ার মত সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাহলে যত প্রাণী তা থেকে উপকৃত হবে, সে ঐ সকল মানুষের নেকীর একটি অংশ পেয়ে যাবে (মুসলিম, হাদিস নং-৪৩১০) ।

অবশ্য কোনো কোনো ধর্ম ও সমাজে গান বাজনার মাধ্যমে তাদের দেব-দেবীদেরকে স্মরণ করে থাকে এবং এর মাধ্যমে তারা তাদেরকে খুশি করার চেষ্টা করে। সেটা তাদের ধর্মীয় ব্যাপার। আমরা মুসলমান, আমাদের ধারণা মতে শহিদরা পরজগতে অবস্থান করছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো যে সকল কাজ-কর্ম তাদের উপকারে আসে সে সকল কাজই বেশি বেশি করা।

## গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

আলোচ্য গবেষণায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক জাতির জন্য তার মাতৃভাষায় কথা বলা ইসলামের বিধান। যা বিভিন্ন নবি-রাসূলগণের জীবনীতে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এটা কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট নস দ্বারা সাব্যস্ত। আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, মাতৃভাষা আন্দোলনে যদি কোনো মুসলিম নিহত হয় তাহলে তাকে শহিদের মর্যাদা দেওয়া হবে।

## উপসংহার

বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য বিশ্বের প্রতিটি ভাষারই চর্চা করা ইসলামি দা'ঈদের কর্তব্য। অতএব প্রতিটি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য গড়ে তুলে মানব কল্যাণে কাজ করতে হবে। জাতীয়তার প্রেক্ষিতে যেমন ইসলামের সর্বজনীনতা সীমিত করা ঠিক নয়, তেমনি ইসলামের বিশ্বজনীনতার কথা তুলেও কোনো অঞ্চলের ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা বা তার গুরুত্ব উপেক্ষা করা আদৌ উচিত নয়। ইসলাম ভাষাগত জাতীয়তার উর্ধ্বে। বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে সকল ভাষাই তার নিজস্ব। মানবসমাজের সকলের মাতৃভাষা চর্চা ও সমৃদ্ধি সাধনে সে অনুপ্রাণিত করে। এটা মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে মনে করে। এতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তার মূল উৎস কুর'আন সুন্নাহতে কী আছে সর্বপ্রথম তাই দেখা প্রয়োজন। পরিশেষে ভাষা আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে যার যতটুকু ভাল আছে তা গ্রহণ করে এবং মন্দটুকু বর্জন করে উদার মন নিয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

## তথ্য-নির্দেশ

আউয়াল, আ.। (২০০০ খ্রি.)। *ভাষাতত্ত্বের সহজকথা*। গতিধারা প্রকাশনী: ঢাকা।

আন্ওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান। (২০০৩ খ্রি.)। *মাতৃভাষা আন্দোলন ও ইসলাম*। মুহাম্মদ ব্রাদার্স: ঢাকা।

আবূ ইয়া'লা, আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মাছনা। (১৪০৪ হি.)। *আল-মুসনাদ*। দারুল মা'মূন লিত তুরাছ: দামিস্ক।

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আসআস আস-সিজিস্তানী। (তা. বি.)। *আস-সুনান*। দারুল ফিকর: বৈরূত।

আযীয, 'আব্দুল 'আযীয ইব্ন আব্দিস সালাম ইবনিল আবিল কাসিম ইবনুল হুসাইন। (তা. বি.)। *তাফসীরু ইব্ন আব্দিস সালাম*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ: বৈরুত।

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-হুসাইনী। (তা. বি.)। *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আজীম ওয়াস সাব'য়িল মাছানী*। দারুল ফিকর: বৈরূত।

ইব্ন খালদূন। (১৯৭৯ খ্রি.)। *আল-মুকাদ্দিমা*। দারুল ফিকর: বৈরূত।

ইব্নুল মুলাক্কীন, সিরাজুদ্দীন আবুল হাফস। (২০০৪ খ্রি.)। *আল-বদরুল মুনীর ফী তাখরীযিল আহাদীসি ওয়াল আছারুল ওয়াকি'আহ ফীশ শারহিল কাবীর*। দারুল হিজরাত: রিয়াদ।

ইবনে মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ। (তা. বি.)। *আস-সুনান*। দারুল্ কিতাবিল আরাবী: বৈরুত।

ইসলাম, রফিকুল। (২০০৪ খ্রি.)। *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। ঐতিহ্য প্রকাশনী: ঢাকা।

তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা। (১৪২১ হি.)। *আস-সুনান*। দারু ইহইয়ায়িত্-তুরাছিল আরাবী: বৈরুত।

বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আলী। (১৪১০ হি.)। *শু'আবুল ঈমান*। দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ: বৈরুত।

বুখারী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম। (১৪১৪ হি.)। *সহীহুল বুখারী*। দারু ইবন কাছীর : দামিস্ক।

মনজুর, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। (১৯৮৫ খ্রি.)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম হাজ্জাজ ইবনুল। (১৩৩৪ হি.)। *আস-সহীহ*। দারু তাবাআতুল আমিরাহ: তুরস্ক।

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর। (২০০১ খ্রি.)। *বাংলাদেশের তারিখ*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

রামেশ্বর, ড.। (১৩৯৯ বাং)। *সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলিকাতা।

শরীফ, প্রফেসর আহমাদ। (সম্পা.)। (১৯৯২ খ্রি.)। *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

Sturtevant, Edger H. (1947). *An introduction to languistic Science*. Yell University: New Haven.

# সম্রাট আকবরের শাসনামলে মুদ্রার ভাষা

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল*

**Abstract:** The Mughal Emperor Akbar (1556-1605) was a brilliant ruler. He introduced various reforms to strengthen his empire Politically, Socially and Economically. His monetary system was an important aspect of his reign. This system played an important role in the financial system and trade of the Mughal Empire. There is a linguistic diversity in the coins of the Mughal emperor Akbar. Initially, he used Arabic script on his coins. Later, he abandoned Arabic script and engraved Persian script on his coins. Akbar's coinage and monetary management were exceptional, advanced and precise. He established a single currency system for the Mughal Empire, which facilitated both domestic and international trade in the empire. Emperor Akbar's monetary system had several types of coins. Notable among these was the Rupee; which Emperor Akbar introduced as the first single currency. It was in use throughout his reign. The rupee was the main currency used during the emperor's reign and was popular throughout the Mughal Empire. Another currency introduced by Emperor Akbar was the Dinar. It was a gold coin; which was also used during the time of other Mughal rulers. Another gold coin called Ashrafi was also in use. Which was used especially for high-value transactions. He gave special importance to the quality of his existing currency. Through the quality of the currency, he strengthened his economic system and was able to create confidence among traders. The improvement of his monetary system was helpful in continuing the economic success of the Mughal Empire and it laid the outline for a more advanced monetary system in the future.

* মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সিনিয়র এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইলঃ mihkbd@office.du.ac.bd

**মূলশব্দ (Keyword):** মোগল সাম্রাজ্য (Mughal Empire), সম্রাট আকবর (Emperor Akbar), মুদ্রার ভাষা (Language of Currency), মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (Currency Management)

## ভূমিকা

মুদ্রা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইতিহাস চর্চায় সমকালীন মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। মুদ্রার মাধ্যমে সমসাময়িক শাসন পর্বের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ইতিহাসের সূত্র হিসেবে মুদ্রা একদিকে অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যকে নিশ্চিত করে এবং তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে কোনো সময়ের বা বিষয়ের ইতিহাস অন্বেষণে লিখিত বা প্রাসঙ্গিক সূত্রের অপ্রতুলতা দেখা দিলে মুদ্রা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে (হোসেন, ২০১৪)। অতীতের সমাজ ও সভ্যতার পুনর্গঠনে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়নে মুদ্রার সার্বিক বিশ্লেষণ ইতিহাসকোষে নতুন নতুন যেসব তথ্য সরবরাহ করে, তাকে পুঁজি করে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা দ্বারা ইতিহাসের পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। মুদ্রা প্রবর্তনের ব্যাপকতা এবং টাকশালের বিকেন্দ্রীকরণ দেশ ও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ইতিহাসের পূনর্গঠনের উপকরণ নিহিত থাকে। মুদ্রায় সন, তারিখ থাকার কারণে একজন শাসকের শাসনকাল এবং সম্রাটগণের ধারাবাহিক সাম্রাজ্য পরিচালনার চিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। মুদ্রা পুরাতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সার্বিকভাবে প্রাচীন শহর, নগর ও সাম্রাজ্যের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। মোগল সম্রাট মির্জা আব্দুল ফতেহ জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর শিল্পনৈপুণ্যে ও অলঙ্কার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুদ্রা প্রচলনের জন্য মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস খ্যাত একজন সম্রাট। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রায় ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা ভারসাম্য ও শিল্পকার্যের রূপায়নের জন্য উন্নত মানের ইউরোপীয় মুদ্রার সাথে তুলনা করা হয় এবং প্রাচ্যদেশীয় মুদ্রা হতে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় (আলী, ১৯৮৯)। অপরদিকে আকবের প্রচলিত মুদ্রার লেখ ও চিত্রের বিষয়বস্তু নানা বিতর্ক ও বিরোধপূর্ণ ছিলো। ফলে সমকালীন ইতিহাস পুনরুদ্ধারে তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা গবেষকদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য

মুদ্রা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বিষয়ে অন্যান্য ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় অনেক গবেষণা হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। বাংলা ভাষাভাষীদের মোগল আমলের তথা সম্রাট আকবরের শাসনামলে

প্রচলিত মুদ্রার ভাষা সমন্ধে সম্যক ধারণা প্রদান করাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যে। এ গবেষণার মাধ্যমে বঙ্গীয় অঞ্চলে সম্রাট আকবরের শাসনামলে মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহারকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। গবেষণার শিরোনাম 'মোগল সম্রাট আকবরের মুদ্রার ভাষা: একটি পর্যালোচনা'। তবে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় এখানে সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর পূর্বসূরিদের প্রচলিত মুদ্রা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মুদ্রার আলোচনার পাশাপাশি সচিত্র মুদ্রা উপস্থাপিত হয়েছে। এতে মুদ্রার মুখ্য ও গৌণ পিঠে উৎকীর্ণ ফারসি লিপি পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। আবার পাঠোদ্ধারকৃত ফারসি ভাষার বাংলা উচ্চারণসহ অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে সাধারণ পাঠকরা মুদ্রা সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করতে পারেন।

## গবেষণার যৌক্তিকতা

সম্রাট আকবর তাঁর শাসনামলে মুদ্রা নীতির ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন; যা ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিলো। তাঁর শাসনামল ছিলো মুদ্রানীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ যুগ। ফলে তাঁর আমলের মুদ্রা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় গবেষণার যৌক্তিকতা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃষ্টান্তমূলক। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় গবেষণা করলে তাঁর শাসনামলের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনায় আসবে। ফলে এটি শুধু আকবরের আমল নয়, বরং পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুদ্রার ভূমিকা ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর আরও গভীর বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

## গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিধায় এখানে ঐতিহাসিক-গবেষণামূলক (Historical Research Method) এবং বস্তুনিষ্ঠ-গুণগত (Qualitative & Descriptive Method) পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক আকারে রচনায় মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা (Mixed-methods Research) অনুসরণের ফলে গবেষণার গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর এবং ব্যাপক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে গবেষণা পদ্ধতির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত অভিধান অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি ব্যবহারের ক্ষেত্রে APA Style (7th edition) ব্যবহার করা হয়েছে।

## পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

বাংলা ভাষায় মুদ্রা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত বা গবেষণা হয়নি। যা হয়েছে সেগুলোতে মোগল আমল বা সম্রাট আকবরের সময়ের মুদ্রার কোনো বিশদ আলোচনা নেই। ইংরেজি ভাষায় মুদ্রা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো বহু পুরোনো হওয়ায় ভাষাগত দক্ষতার কারণে বাংলাভাষীদের জন্য সেকালের ইংরেজি ভাষা বোঝা দুষ্কর। মুদ্রা বিষয়ক বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি বইয়ের আলোচনা অর্থাৎ পূর্ব-গবেষণা সমীক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

*মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী বাংলা ভাষায় রচিত মুদ্রা বিষয়ক একটি অনবদ্য রচনা। এ গ্রন্থে তিনি সুলতানি আমলকেই প্রাধ্যান্য দিয়েছেন। গ্রন্থটি মুসলিম আমলের ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তবে মোগল আমল বা সম্রাট আকবরের সময়কার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এতে পাওয়া যায় না। যদিও তিনি আলোচনার তাগিদে একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন '*মুঘল মুদ্রা*'। কিন্তু অধ্যায়টিতে তিনি মোগল মুদ্রা বিষয়ে বিস্তারিত কোনো বিষয় আলোচনা করেননি। এতে শুধু সারমর্ম আকারে কিছু আলোচনা তুলে ধরেছেন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি আরও বেশ কিছু ভারতীয় উপমাহাদেশে মুসলিম শাসন বা এ সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন; যাতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি মুদ্রা বা মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।

*বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম* নলিনীকান্ত ভট্টাশালী রচিত একটি বিখ্যাত মুদ্রা বিষয়ক গ্রন্থ। ভট্টাশালী জাদুঘরের কর্মকর্তা ছিলেন। পাশাপাশি তিনি একজন বিখ্যাত প্রাচীন মুদ্রা গবেষক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থ থেকে তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তবে গ্রন্থটির পরিপূর্ণতার জন্য মোগল আমলের মুদ্রা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবিদার। কিন্তু এ গ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

*আদি ঐতিহাসিক মুদ্রার ইতিহাস* গ্রন্থটি মোশাররফ হোসেন রচিত প্রাচীনকালের মুদ্রা বিষয়ক। তিনি সমকালীন ইতিহাস, ঐহিত্যসহ বহুমাত্রিক বিষয়ের একজন স্বনামধন্য লেখক। তিনি এ গ্রন্থে বঙ্গীয় অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রার বিশদ আলোচনা করেছেন। অধ্যায় চার-এ বাংলাদেশের মুদ্রাতাত্ত্বিক ধারা নামে একটি অধ্যায় রয়েছে। যেহেতু গ্রন্থটিতে বঙ্গীয় অঞ্চল, বাংলাদেশের মুদ্রাতাত্ত্বিক ধারা বিশদ আলোচনা হয়েছে, সেহেতু এখানে মোগল আমলের মুদ্রার আলোচনা করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কেননা মোগল আমল ভারতীয় উপমহাদেশ, বঙ্গীয় অঞ্চল বা বাংলাদেশের বাইরে নয়। কিন্তু এ গ্রন্থে মোগল আমলের কোনো আলোচনা তিনি করেননি।

*সুলতানি বাংলার মুদ্রা ও টাকশাল* গ্রন্থটিতে হারুন-অর রশিদ সরকার রচিত গ্রন্থটিতে বাংলার ভৌগলিক পরিচয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাংলার সুলতানি আমলের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, প্রাক-মুসলিম বাংলার অর্থ ও মুদ্রাসহ টাকশালের বর্ণনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। বইটি মুদ্রা গবেষকদের নিকট সাদরে গৃহীত হয়েছে বলে আমি মনে করি। গ্রন্থটিতে বাংলার তথা বঙ্গীয় অঞ্চল সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা স্থান পেয়েছে। যদিও গ্রন্থটি সুলতানি বাংলার মুদ্রা ও টাকশাল বিষয়ক। তথাপিও মোগল আমলের মুদ্রা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হলে গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা পেতো।

*আবহমান বাংলার মুদ্রা* গ্রন্থটি ড. মো. রেজাউল করিম রচিত গ্রন্থটি একটি মুদ্রা বিষয়ক অনিন্দ্য গ্রন্থ। এতে লেখকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ অধ্যায়াকারে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে একটি অধ্যায় আবহমান বাংলার মুদ্রা। গ্রন্থকার গ্রন্থটি বা অধ্যায়টির নাম *আবহমান বাংলার মুদ্রা* নামকরণ করলেও মোগল মুদ্রার আলোচনা এখানে নেই বললেই চলে।

*কাউ টু কিপ্টেকারেন্সি (টাকার ইতিহাস)* গ্রন্থটি মো. আদনান আরিফ সালিম ও মো. আব্দুল হামিদ রচিত মুদ্রা বিষয়ক বেশ জনপ্রিয় গ্রন্থ। এটি মুদ্রা বিষয়ক একটি আধুনিক গ্রন্থ। এতে তারা বিনোদনের ছলে মুদ্রার আদি থেকে বর্তমান কারেন্সি পর্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে তারা মুদ্রার ছবি উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি পাঠক ও গবেষকদের নিকট ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে যথাক্রমে মুদ্রানির্ভর মধ্যযুগ ও উপনিবেশ থেকে বাংলাদেশ নামে দুটি অধ্যায় রয়েছে। এতে সামগ্রিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। মোগল আমলের দু-একটি মুদ্রার আলোচনা রয়েছে। যেহেতু ইতিহাসের দিক থেকে মোগল আমল মধ্যযুগের মধ্যে পড়ে আবার মোগল সাম্রাজ্য বাংলা তথা বঙ্গীয় অঞ্চলভুক্ত, তাই এ অধ্যায়গুলোতে মোগল আমলের মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরো একটু বিশদ আলোচনা থাকলে ভালো হতো। অল্প পরিসরের আলোচনায় মোগল আমলের মুদ্রা বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এ গ্রন্থে অনুপস্থিত।

এছাড়া মোগল আমলের ইতিহাস, বাংলার মুসলিম বা মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়াদিই প্রাধান্য পেয়েছে। এসব গ্রন্থে অর্থনৈতিক অবস্থার মোটামুটি আলোচনা রয়েছে। কিন্তু অর্থনীতি বা বিনিময়ের মুখ্য বিষয় হিসেবে মুদ্রার তেমন কোনো আলোচনা উপস্থাপিত হয়নি।

### সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোগল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট আকবর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর অমরকোটের রাজা রানা বীরশালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (মুখোপাধ্যায়, ২০০৭)। তাঁর পিতার নাম নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন এবং মাতার নাম হামিদা বানু। তাঁর পূর্ণনাম জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর। পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি দিল্লির সিংহাসনে

আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর ৪ মাস। নাবালক মোগল সম্রাটের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁর বাবা হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধু বৈরাম খাঁ*। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই দিল্লির জামে মসজিদে নিজের নামে খুতবা পাঠ করে "শাহানশাহ" উপাধি পান। অভিভাবক বৈরাম খাঁ প্রধানমন্ত্রী বা "উকিল-উল্-সালতানাত" রূপে নিযুক্ত হন। এ সময় সম্রাট আকবর তাকে "খান-ই-খানান" উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর অনন্য প্রতিভা, রাজকীয় মর্যাদা, সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কৃতিত্বের জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসকদের অন্যতম একজন বলে বিবেচনা করা হয়। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর হলেও মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি তিনি দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী নীতি নির্ধারণে সফল ভূমিকা পালন করেন। তিনি মোগল ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অনন্য, অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'মহামতি' (The Great) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে (শাহনেওয়াজ, ২০১৫)। সম্রাট আকবরকে ভারতবর্ষে মোগল যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। এডওয়ার্ডস ও ক্যারেট বলেন, তাঁর শাসনামলেই মোগলগণ একটি আক্রমণকারী সামরিক শক্তি হতে স্থায়ী ভারতীয় রাজবংশে পরিণত হয়। ড. ত্রিপাঠী বলেন, Akbar was the greatest king which historic India had ever had. He was at once the child and the father of his age. মোগল সাম্রাজ্যের এ মহান সম্রাট ২৭শে অক্টোবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে ফতেহপুর সিক্রিতে পরলোক গমন করেন (বিশ্বাস, ২০১৭)। পরে তাঁকে আগ্রার সিকান্দ্রা নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

### সম্রাট আকবরের মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সিংহাসনে আরোহণের পর সম্রাট আকবর মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর শাসনামলের প্রথমদিকে তিন ধরণের মুদ্রার প্রচলন ছিল। এগুলো হচ্ছে, স্বর্ণ মুদ্রা 'মোহর', রৌপ্য মুদ্রা 'রূপায়া' এবং তাম্র মুদ্রা 'দাম'। পরবর্তীতে তাঁর নেতৃত্বেই মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামো সুদৃঢ়করণে এবং মুদ্রার সংস্কারে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশীয় হিন্দু শক্তির সাথে এক আপোষী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান পরামর্শক টোডরমলের পরামর্শে শাসন কাঠামোতে এবং মুদ্রা লিপির ক্ষেত্রে আরবির পরিবর্তে ফারসি

---

* *বৈরাম খাঁ ছিলেন মোগল সম্রাট হুমায়ুন এবং আকবরের সেনাপতি এবং উপদেষ্টা এবং হুমায়ুনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সভাসদ। হুমায়ুন তাকে খান ই খানান-বৈরাম খান (রাজাধিরাজ বা রাজাদের রাজা) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।*

ভাষার প্রচলন করেন (আলী, ১৯৮৯)। তিনি প্রায় ৫০ বছর মোগল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর সময়ে নতুন নতুন অনেক এলাকা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ফলে এ সাম্রাজ্য বহুদূর প্রসারিত ও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু অববাহিকার বাইরের প্রান্ত, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং উত্তরে কাশ্মীর, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশের উচ্চভূমি, দক্ষিণে ভারতের ডেকান মালভূমির উপভূমি অর্থাৎ বর্তমান বাংলদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এ বিশাল ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে মুদ্রাকে জনগণের সহজলভ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করে টাকশালের বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তৎকালীন যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় সাম্রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যে পণ্য সরবরাহে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো (সরকার, ২০১৫)। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র বিনিময় মাধ্যম ছিল মুদ্রা। রাজধানী থেকে মুদ্রা মুদ্রণ করে বিস্তীর্ণ এলাকায় তা সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এ জন্যই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয়তার দিকে গুরুত্ব দিয়ে মোগল সম্রাট আকবর টাকশালের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। সম্রাট আকবর নববিজিত, সম্প্রসারিত অঞ্চলে চাহিদামত টাকশাল স্থাপন করতেন। সম্রাট আকবরের সময়ে সাম্রাজ্যে ৭২টি টাকশাল ছিলো (খান, ২০১৮)। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাকশালগুলো হচ্ছে, আগ্রা, লাহোর, দিল্লি, আহমদাবাদ, বুরহানপুর[*], পাটনা[**], কাবুল, মুলতান, এলাহাবাদ, থাট্টা[***], নারনল[****], গোয়ালিয়র[*****], বাইরাটা, সারাংপুর, মালপুর, দোগাম, জৌনপুর, উদয়পুর, সিরহিন্দ[******], সিতাপুর, ফতেহপুর, মাকসুসাবাদ প্রভৃতি।

উপরিউক্ত টাকশালের নামগুলোর মধ্যকার কিছু নাম শনাক্ত করা যায়নি। আবার কিছু টাকশালের নামের আগে গুণবাচক উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, দার আস-সালতানাহ, লাহোর (অর্থ: সম্রাজ্যের রাজধানী), দার আল-মুলক কাবুল (অর্থ: সাম্রাজ্যের রাজধানী), মুসতাকারর আল-খিলাফত, আগ্রা (অর্থ: খিলাফতের স্থায়ী নিবাস), দার আল-খিলাফত, দিল্লি (অর্থ: খিলাফতের প্রধান গৃহ), দার আয-যফর, বিজাপুর (অর্থ: বিজয়ের গৃহ), দার আল-খায়র, আজমীর (অর্থ: কল্যাণের আশ্রয়), দার আল-আমান, মুলতান (অর্থ: নিরাপত্তার আবাস) প্রভৃতি।

## আকবরের পূর্বসূরিদের মুদ্রা

---

* বুরহানপুর ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের একটি জেলা। বুরহানপুরই শহরটির জেলা সদর। জেলাটি ইন্দোরের বিভাগের অন্তর্গত।

** পাটনা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহর।

*** থাট্টা পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থাট্টা জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর।

**** নারনল ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের মেহন্দ্রগড় জেলার একটি শহর।

***** গোয়ালিয়র রাজ্য মধ্য ভারতে অবস্থিত মারাঠা কনফেডারেসির অন্তর্গত একটি রাজ্য ।

****** সিরহিন্দ-ফাতেগড় ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের একটি শহর।

দিল্লির সুলতান ইব্রাহীম লোদী*কে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে ১৫২৬ খ্রি. জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের স্বল্প সময়ে তিনি সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ফলে তিনি মুদ্রা ব্যবস্থারও কোনো পরিবর্তন করতে পারেননি (আলীম, ১৯৯৬)। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু তিনি শেরশাহ শুরির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে ভারত থেকে পারস্যে নির্বাসিত হন এবং প্রায় পনেরো বছর পারস্যে অতিবাহিত করেন। তিনি পুনরায় নিজ বাহিনী নতুনভাবে সজ্জিত করে শূরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবার তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন (আলী, ১৯৮৯)। কিন্তু কয়েক মাস রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারেননি। ভারতীয় উপমহাদেশের উপরিউক্ত দুই মোগল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালে তামার মুদ্রা ফালুস, রুপার মুদ্রা শাহরুখি বা দিরহাম এবং স্বর্ণমুদ্রা আশরাফি বা দিনার প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মুখ্য বিনিময়ের মাধ্যম ছিল সুলতানি আমলের খাদ মেশানো রুপার মুদ্রা। নাম ছিল 'টংকা'। নিম্নে সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ুনের মুদ্রার ছবিসহ উল্লেখ করা হলো:

মুখ্য পিঠ

بادشاه غازی ظهير الدين محمد بابر
سنه...

বৃত্তের মধ্যে: বাদশাহ গাজি জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর। সাল ও টাকশালের নাম অস্পষ্ট।
বৃত্তের বাইরে: লেখা অস্পষ্ট।

গৌণ পিঠ

**لا اله الا الله محمد الرسول الله**

বৃত্তের মধ্যে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ
বৃত্তের বাইরে: আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী।

**ছবি: সম্রাট বাবরের রৌপ্য মুদ্রা**

* ইব্রাহীম লোদি ছিলেন লোদি রাজবংশের শেষ সুলতান। ১৫১৭ সালে তার পিতা সিকান্দার লোদির মৃত্যুর পর তিনি সুলতান হন। পানিপথের যুদ্ধে তার পরাজয়ও নিহত হওয়ার ফলে লোদি রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। তিনি আফগান বা পাঠান বংশোদ্ভূত সর্বশেষ হিন্দো সম্রাট ছিলেন।

মুখ্য পিঠ

গৌণ পিঠ

ىزاغ نويامه دمحم مظعال ناطلسلا

আসসুলতানুল আযম মুহম্মদ হুমায়ুন গাজি

953 هنس ريمشك برض

টাকশাল: কাশ্মীর, ৯০৩ হিজরি/১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ

**ছবি: হুমায়ুনের রৌপ্য মুদ্রা**

## আকবরের প্রাথমিক যুগের মুদ্রা

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার পর তিনি মোগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন (খান, ২০১৮)। তাঁর শাসনামলের প্রথমদিকে তিন ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। এগুলো হচ্ছে, স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর', রৌপ্য মুদ্রা 'রূপায়া' এবং তাম্র মুদ্রা 'দাম'। আকবরের আমল থেকে ১ তোলার মান ছিল প্রায় ১২ গ্রাম। সাধারণভাবে মোহর ও রূপায়ার ওজন হতো ১ তোলার সামান্য কম। এ সময়ে রূপার মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল ১১.৫ গ্রাম এবং স্বর্ণ মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল ১১ গ্রাম। এ মুদ্রাগুলোর এক পিঠে রাজার নাম, উপাধি উৎকীর্ণ হতো। অপর পিঠে মুদ্রা প্রচলনের সাল ও টাকশালের উৎকীর্ণ করা হতো। এছাড়া শাসনামলের প্রথম তিন বছর তিনি শাহরুখি মুদ্রার প্রচলনও অব্যাহত রেখেছিলেন। তৈমুরিদ বাদশাহ শাহরুখের মধ্য এশীয় ও পারস্যে চালু করা শাহরুখি মুদ্রা এবং ট্রান্স অক্সিয়ানার সায়বানি শাসক*দের প্রচলিত মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা মুদ্রণ ও প্রচলন করেন (করিম, ২০১৬)। এ মুদ্রাগুলো ৭২ গ্রেন ওজনের পাতলা বড়ো ধরনের মুদ্রা ছিল; যেগুলোর অবভার্স বা মুখ্য পিঠের মধ্যস্থলে কালিমা সংস্থাপন করে চারপাশে চার খলিফার নাম এবং রিভার্স বা গৌণ পিঠে সম্রাটের নাম ও প্রান্ত দিকে তাঁর উপাধিসহ টাকশাল ও তারিখ অঙ্কিত হতো।

পরবর্তী কালে তাঁর নেতৃত্বেই মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি

* সায়বানি শাসক বলতে সৈয়দ শাসকদের বোঝানো হচ্ছে। যারা বংশ পরম্পরায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর বলে দাবি করে। 'সায়বানি' শব্দটি ফারসি শব্দ সৈয়দ থেকে এসেছে, যার অর্থ নেতা বা প্রধান। মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে যারা শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, এই শব্দটি সুপরিচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো সুদৃঢ়করণে এবং মুদ্রার সংস্কারে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দেশীয় হিন্দু শক্তির সাথে এক আপোষী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন (খান, ২০১৮)। তাঁর প্রধান পরামর্শক টোডরমলের পরামর্শে শাসন কাঠামোতে এবং মুদ্রা লিপির ক্ষেত্রে আরবির পরিবর্তে ফারসি লিপির প্রচলন করেন (আলী, ১৯৮৯)। তিনি মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কার করে স্বকীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন নামে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করেন। আকবর বর্গাকৃতি, মেহরাবি ও আয়তকার মুদ্রা প্রচলনের নির্দেশ দেন। তিনি দেশীয় হিন্দু মুদ্রার অনুকরণে স্থুল ও ভারী মুদ্রা প্রবর্তনে ব্রতী হন। প্রচলিত মুদ্রায় سلطان এবং خقان উপাধিদ্বয়ের পরিবর্তে ফারসি হরফে پادشاہ غازی/পাদশাহ গাযি উপাধি উৎকীর্ণ করেন। পূর্বের মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি ছিলالخقان المعظم السلطان الاعظم । আকবরের মুদ্রার মূখ্য পিঠের (Obverse) মধ্যস্থলে কালিমা এবং তা পরিবৃত করে খোলাফায়ে রাশেদিনের নাম উৎকীর্ণ করার প্রথা দ্বীন-ই-এলাহি প্রবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। এ সময় খোলাফায়ে রাশেদিনের নামের শেষে সম্মানসূচক বাক্য ‘দাল্লা আল্লাহ বিহিম’ অথবা ‘রাযিআল্লাহু আনহুম’ শব্দগুলো যুক্ত করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে আকবরের মুদ্রায় এগুলো বর্জিত হয়।

## আকবর কর্তৃক প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রাসমূহ

**শাহানশাহ:** সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত মুদ্রাগুলোর মধ্যে শাহানশাহ ছিল স্বর্ণের তৈরি। এটি ছিল গোলাকার। এ মুদ্রার ওজন ছিল ১০১ তোলা ৯ মাসা ৭ মুখ। এর মূল্যমান ছিল ১০০ লাল-ই-জালালি মোহরের সমান। এ মুদ্রার মুখ্য পিঠে সম্রাটের নাম খোদাই করা এবং আর গোলবৃত্তের প্রান্তে পাঁচ খিলানে উৎকীর্ণ নিম্নে উল্লিখিত লেখা থাকত:

السلطان الاعظم الخاقان المعظم خلد الله ملکه و سلطنه ضرب دارالخلافة اگرا

উচ্চারণ: আসসুলতানুল আজম আলখাকানুল মুয়াজ্জাম খাল্লাদ আল্লাহু মুলকুহু ওয়া সুলতান, যারবে দারুল খিলাফাত, আগ্রা।

অর্থাৎ মহান সুলতান, প্রসিদ্ধ সম্রাট, আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। আর যারব অর্থ টাকশাল বা যেখানে মুদ্রা তৈরি করা হয়। রাজধানী আগ্রায় মুদ্রিত। মুদ্রা গৌণ পিঠে লেখা থাকত:

لا اله الا الله محمد رسو الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ও পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত:

حساب الله يرزق من يشاء بغير

আল্লাহ ইয়ারজুকু মাই ইয়াশায়ু বিগাইরি হিসাব

অর্থাৎ যার প্রতি আল্লাহ প্রসন্ন হন তার প্রতি তাঁর দয়া অপরিসীম। আর এর চারপাশে আছে চার খলিফার নাম।

এ মুদ্রার প্রথমে খোদাইকারী ছিলেন মৌলানা মাকসুদ। পরে মোল্লা আলী আহমদ অতি নিপুণতার সাথে নিম্নলিখিত লেখা যোগ করেন (আলী: ১৯৮৯)।

এক পিঠে افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على اصحابه فى سبيل الله

আফজালু দিনারিন ইয়ানফুকুহ আররিজালু দিনারিন ইয়ানফুফুহ আলা আসহাবিহি ফি সাবিলিল্লাহ

অর্থাৎ মানুষ তখনই সর্বোত্তম মুদ্রা খরচ করে, যখন তা সে তার সমধর্মাবলম্বীদের জন্য আল্লাহর নামে খরচ করে।

আর বিপরীত দিকে লেখা ছিল,

السلطان العالى الخليفة المتعالى خلد الله تعالى ملكه و سلطانه و ابّد عبدالله و احسانه

আসসুলতানুল আলা আল খালিফাতুল মুতাআলি খালাদাল্লা তায়ালা মুলকুহু ওয়া সুলতানুহু ওয়া আব্বাদা আব্দুল্লাহ ওয়া এহসানুহ

অর্থাৎ সার্বভৌম সুলতান, মহিমান্বিত খলিফা, প্রার্থনা করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ও তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী করেন এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতাকে চিরস্থায়ী দান করেন।

অবশ্য পরে শাহানশাহ মুদ্রা থেকে উপরের সকল লেখা অপসারণ করা হয়। এগুলোর পরিবর্তে সম্রাট আকবরের সভাকবি ও দার্শনিক শেখ ফৈজি* রচিত দুটি চতুস্পদী কবিতা উৎকীর্ণ করা হয়। এসময় এ মুদ্রার একপিঠে উৎকীর্ণ হতো:

سنگ سيه از پرتو آن جوهر يافت — خرشيد كه هفت بحر از او گوهر يافت

و آن زر شرف از سكه شاه اكبر يافت — كن از نظر تربيت او زر يافت

| | |
|---|---|
| ছাঙ্গে সিয়াহ আয পারতো অন জওহার ইয়াফ্ত | খুরশিত কে হাফত বাহরে আয উ গোওহার ইয়াফ্ত |
| কুন আয নাজরে তারবিত উ যার ইয়াফ্ত | ওয়া অন যার সারফে আয সেক্কেহ শাহ আকবর ইয়াফ্ত |

**অর্থ:** সূর্য থেকেই সপ্ত সমুদ্র তাদের মুক্তা আহ্বান করে তার কিরণ থেকেই সৃষ্টি হয় কালো

* কবি ফৈজি ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের সভাকবি। তিনি বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফযল আল্লামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পাথরের উজ্জ্বল রত্ন খনি তার সোনা পায় তারই করুণা সম্পাতে আর সে সোনা মহিমান্বিত হয় আকবরের সিলমোহরে।

এ শাহানশাহ মুদ্রার মাঝখানে আল্লাহ্ আকবর জাল্লা জাল্লালাহ অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাঁর মহিমা চতুর্দিকে বিস্তৃত হোক, উৎকীর্ণ করা হতো।

শাহানশাহ মুদ্রা অপরপিঠে উৎকীর্ণ হতো:

با نقش دوام و نام جاوید بود    این سکه که پیرایهٔ امّید بود

یک ذره نظر کرده خورشید بود    سیمای سعدتش همین بس که بدهر

ইন সেককে কে পির'ইয়নে উমিদ বুদ    বা নাকসে দাভাম, ন'ামে যাভিদ বুদ

সিম'ায়ি সাওদাতাস হামিন ব'াস কে বাদহার নাজার    ইয়েক যরেহ কারদেহ খুরশিদ বুদ

**অর্থ:** এই মুদ্রা-যা আশার অলঙ্কার এতে অঙ্কিত আছে চিরস্থায়ী সিলমোহর, আর অক্ষর এক নাম এর সৌভাগ্য সূচনার প্রতীকরূপে, এই-ই যথেষ্ট যে একবার চিরকালের জন্যে সূর্য এর উপর নজর দিয়েছিল। এর মাঝখানে এলাহি সাল অনুযায়ী তারিখ লেখা থাকতো।

শাহানশাহ নাম ও আকৃতির আরও একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তিত ছিল। যার ওজন ছিল ১১ তোলা, ৮ মাসা ও এর মূল্যমান ছিল প্রতিটি ১১ মাসা ওজনের ১০০ গোল মোহরের সমান। এর উভয় পিঠে আগের মুদ্রাটার মতোই লেখা থাকতো (বিশ্বাস (অনূ.), ২০১৭)।

**রাহাস:** রাহাস হলো আগের দুটি মুদ্রার প্রত্যেকটিরই অর্ধেক। কখনও কখনও এটা চতুষ্কোণ করেও তৈরি করা হতো। এর একপিঠে শাহানশাহ মুদ্রার মতই লেখা আর ওপর পিঠে ফৈজির লিখিত নিম্নলিখিত চতুষ্পদী কবিতা উৎকীর্ণ হতো:

با کوکب اقبال کند همراهی    این نقد روان گنج شاهنشاهی

یابد ازشرف از سکه اکبر شاهی    خورشید به پرورش از آن رو که بدهر

ইন নাকদ-ই রাভান গানজে শাহানশাহি    ব'া কাউকাব ইকবাল কুনাদ হামর'াহি

খুরসিদ বে পারভারেস আয অন রো কে বাদহার    ইয়'াবাদ সারকে আয সেক্কেহ আকবরশাহী

**অর্থ:** সম্রাটের কোষাগারে এই চলতি মুদ্রা সৌভাগ্য তারার অনুসরণ করে হে সূর্য একে উৎসাহিত করে কারণ সর্বকালের জন্য এটা আকবরের সিলমোহর মহিমান্বিত।

**আতমাহ:** আতমাহ হলো গোলাকার ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এ ধরণের মুদ্রার মান ছিলো ২৫ মোহর। এ মুদ্রার কোনো কোনোটিতে রাহাস মুদ্রায় উল্লিখিত রুবায়ি উৎকীর্ণ হতো। আবার কোনো কোনোটিতে ফৈজির নিম্নোক্ত রুবায়ি বা চতুস্পর্দী কবিতা উৎকীর্ণ হত।

پیرایۂ نه سپهر و هفت اختر باد — این سکه که دست بخت را زیور باد

در دهر روان بنام شاه اکبر باد — زاین نقدیست کار از او چون زر باد

ইন সেক্কেহ কে দাস্ত বাখত র'া জিভার ব'াদ — পিইয়'ারানেহ সেপেহের ওয়া হাফত আখতার ব'াদ

যেইন নাগদিস্ত ক'ার আয উ চুর জার ব'াদ — দার দাহার রাভান বেন'ামে শাহ আকবর ব'াদ

**অর্থ:** এই মুদ্রা সৌভাগ্যের হস্ত অলংকৃত করুন এ যেন নয় স্বর্গের ও সাত তারকার অলংকারে পরিণত হয় ইহা প্রচলিত থেকে আকবর শাহের গৌরব প্রকাশ করে।

**বিনসাত:** বিনসাত মুদ্রার আকার ছিলো বর্গাকৃতি ও গোলাকার। এর মূল্যমান ছিলো শাহানশাহ মুদ্রার এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০ মোহর। এতে শাহানশাহ মুদ্রার আদলে একই লেখা উৎকীর্ণ হতো। শাহানশাহ মুদ্রার এক-অষ্টমাংশ, এক-দশমাংশ, এক-দ্বাদশাংশ এবং পঞ্চবিংশতি ভাগের এক ভাগ মূল্যের স্বর্ণমুদ্রাও বিনসাত নামে প্রচলিত ছিলো।

**চুগুল:** চুগুল ছিলো স্বর্ণমুদ্রা। এ মুদ্রার আকার ছিলো বর্গাকৃতি। এ মুদ্রা শাহানশাহ মুদ্রার ৫০ ভাগের এক ভাগ। এ মুদ্রার মূল্যমান ছিলো দুই মোহরের সমান।

**লাল-ই-জালালি:** লাল-ইজালালি মুদ্রা ছিলো গোলাকার। এটির মূল্যমান ছিলো দুই মোহর। এর একদিকে الله اکبر ও অপর দিকে یا معین (সাহায্যকারী) লেখা ছিলো।

**এলাহি:** এলাহি মুদ্রাটি ছিলো গোলাকার। এ মুদ্রাটির ওজন ছিলো ১২ মাসা। উপরে উল্লিখিত আফতাবি মুদ্রার মতোই এ মুদ্রাতেও লেখা ছিলো। তবে এ মুদ্রাটির দাম ছিলো ১০ রুপি।

**আফতাবি:** আফতাবি মুদ্রা ছিলো গোলাকৃতি। এ মুদ্রার ওজন ছিলো ১ তোলা ২ মাসা। এর মূল্যমান ছিলো ১২ রুপির সমান। এর একদিকে الله اکبر جلّ جلاله আল্লাহ আকবর, জাল্লা জালালুহ এবং অপরদিকে পবিত্র সালের মাসের নাম লেখা রয়েছে।

**চতুষ্কোণ লাল-ই জালালি:** লাল-ই-জালালি মুদ্রাটি ছিলো বর্গাকৃতি। আফতাবি মুদ্রার ন্যায় এটিরও মূল্যমান ছিলো ১২ রুপির সমান। ওজনও ছিলো একই অর্থাৎ ১ তোলা ২ মাসা। একই ওজনের একই মূল্যের। এর একদিকে الله اکبر আল্লাহ আকবর অপরদিকে جلّ جلاله জাল্লা জালালুহু লেখা ছিলো।

**আদলে গুতকে:** আদলে গুতকে মুদ্রাটি ছিলো গোলাকার। এ মুদ্রার ওজন ছিলো ১১ মাসা এবং মূল্যমান ছিলো নয় রুপির সমান। এর একদিকে الله اكبر ও অপর দিকে يا معين (সাহায্যকারী) লেখা ছিলো।

**মোহরে গারদ:** মোহরে গারদ মুদ্রার ওজন ছিলো ১১ মাসা। মূল্যমান ছিলো নয় রুপি। এ মুদ্রাটি ওজন ও মূল্যমানে আদলে গুতকার ন্যায় হলেও এর ছাপ ভিন্ন।

**মুঈনি:** মুঈনি মুদ্রার আকার ছিলো চতুষ্কোণ ও গোলাকার উভয় রকমের। ওজন ও দামে এ মুদ্রা লাল-ই-জালালির ন্যায় অর্থাৎ মূল্যমান ছিলো ২ মোহর। আর লেখা ছিলো يا معين অর্থাৎ সাহায্যকারী।

**চাহারগুসে:** চাহারগুস অর্থ চতুষ্কোণ। অর্থাৎ চাহারগুসে মুদ্রাটি ছিলো চতুষ্কোণ বা চারকোণা। এ মুদ্রাটি ওজনে ছিলো আফতাবি মুদ্রার সমান অর্থাৎ ১ তোলা ২ মাসা। এর মূল্যমানও ছিলো আফতাবি মুদ্রার ন্যায় অর্থ ১২ রুপির সমান। এর একদিকে الله اكبر جلّ جلاله আল্লাহ আকবর, জাল্লা জালালুহ এবং অপরদিকে পবিত্র সালের মাসের নাম লেখা ছিলো।

**গারদ:** গারদ মুদ্রাটি ওজন ও মূল্যমানে এলাহি মুদ্রার অর্ধেক অর্থাৎ ৬ মাসা। এ মুদ্রাটিতে ছাপও ছিলো এলাহি মুদ্রার ন্যায়।

**দাহান:** দাহান মুদ্রাটি ওজন ও মূল্যমানে লাল-ই-জালালি মুদ্রার অর্ধেক। এ মুদ্রাটিতে ছাপও ছিলো লাল-ই-জালালি মুদ্রার ন্যায়।

**সালিমি:** সালিমি মুদ্রাটি ওজন ও মূল্যমানে আদলে গুতকে মুদ্রার অর্ধেক ছিলো।

**রাবি:** রাবি মুদ্রাটি ওজন ও মূল্রমানে আফতাবি মুদ্রার চার ভাগের এক ভাগ ছিলো।

**মান:** মান মুদ্রাটি ওজনে এলাহি মুদ্রা ও লাল-ই-জালালি মুদ্রার এক-চতুর্থাংশ ছিলো।

**নেসফে সালিমি:** নেসফে সালিমি মুদ্রাটি আদলে গুতকে মুদ্রা এক-চতুর্থাংশ ছিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, নেসফ অর্থ অর্ধেক। সুতরাং এ মুদ্রাটিকে অর্ধ সালিমি মুদ্রাও বলা যেতে পারে।

**পান্জ:** পান্জ মুদ্রটি ছিলো এলাহি মুদ্রার এক-পঞ্চমাংশ।

**পানদাউ:** পানদাউ মুদ্রাটি লাল-ই-জালালি মুদ্রার এক-পঞ্চমাংশ ছিলো। এ মুদ্রাটির একপিঠে লিলি ও অপরপিঠে বন্য গোলাপের ছবি পরিলক্ষিত হয়।

**সামনি:** সামনি মুদ্রা এলাহি মুদ্রা আট ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক-অষ্টমাংশ ছিলো। এর একদিকে الله اكبر আল্লাহ আকবর অপরদিকে جلّ جلاله জাল্লা জালালুহু লেখা ছিলো।

**কালা:** কালা মুদ্রাটি এলাহি মুদ্রার ষোলো ভাগের এক ভাগ ছিলো। এ মুদ্রাটির উভয়দিকে

বন্য গোলাপ আঁকা ছিলো।

**জারাহঃ** জারাহ মুদ্রা ছিলো এলাহি মুদ্রার বত্রিশ ভাগের এক ভাগ এবং কালা মুদ্রার মতো একই ছাপের।

উল্লেখ্য যে, লাল-ই জালালি, দাহান ও মান এই তিন রকম স্বর্ণমুদ্রা একেক মাসে একেক মুদ্রা মুদ্রণ করার প্রথা রাজ

**রৌপ্য মুদ্রাঃ** সম্রাট আকবরের শাসনামলে স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি রৌপ্য মুদ্রাও চালু ছিলো। তাঁর প্রবর্তিত বিভিন্ন ধরণের রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে ছিলোঃ

**রূপাইয়াঃ** গোলাকৃতির এই মুদ্রার ওজন সাড়ে এগারো আনা। এটি শের শাহের* আমলে সর্বপ্রথম প্রচলিত মুদ্রা। সম্রাট আকবর একে নিখুঁত করেন। এতে নতুন ছাপ দেয়া হয়। এ মুদ্রার একপিঠে اکبر ا আল্লাহ আকবর অপরদিকে جلّ جلاله জাল্লা জালালুহু লেখা ছিলো। অপরপিঠে তারিখ খোদিত হতো। এর মূল্যমান চল্লিশ দামের কম-বেশি হতো। তবে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দাম নির্ধারিত ছিলো।

**জালালাঃ** চারকোণ বিশিষ্ট এ ধরণের মুদ্রা আকবরের রাজত্বকালে প্রচলন শুরু হয়। মূল্যমান ছিলো চল্লিশ দাম। এ মুদ্রার একপিঠে اکبر ا আল্লাহ আকবর অপরদিকে جلّ جلاله জাল্লা জালালুহু লেখা ছিলো। অপরপিঠে তারিখ খোদিত হতো।

**দার্‌বঃ** দার্‌ব মুদ্রার মূল্যমান ছিলো ২০ দাম।

**চার্নঃ** মূল্যমান ছিলো ১০ দাম।

**পানদাউঃ** পানদাউ নামে স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি রৌপ্য মুদ্রাও চালু ছিলো। এ মুদ্রার মূল্যমান ছিলো ৮ দাম।

**আশ্‌তঃ** মূল্যমান ছিলো ৫ দাম।
**দাশাঃ** মূল্যমান ছিলো ৪ দাম।
**কালাঃ** মূল্যমান ছিলো আড়াই দাম।
**সুকিঃ** মূল্যমান ২ দামের সমান।

এছাড়াও সম্রাট আকবর প্রবর্তিত গোলাকার রুপাইয়ার অনুরূপ আরোও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিলো।

**তাম্র মুদ্রাঃ** সম্রাট আকবরের শাসনামলে স্বর্ণ মুদ্রার আধিক্য ছিলো পাশাপাশি রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিলো। তবে তাম্র মুদ্রার প্রচলন খুবই সীমিত ছিলো। এ সম্রাটের প্রবর্তিত

---

* শের শাহ সুরি ন্যায়রায়ণ রাজা বলা হয় তিনি ছিলেন ভারতে সুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৯ থেকে ১৫৪০ সাল থেকে তিনি বিহারের শাসক এবং পরবর্তীতে ১৫৪০ সালে মোগল সাম্রাটকে পরাজিত করে সার্বভৌম শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

তাম্র মুদ্রাগুলো ছিলো:

**দাম:** দাম মুদ্রার ওজন ৫ তাক অর্থাৎ ১ তোলা, ৮ আনা, ৭ মুর্ক। এ মুদ্রার মূল্যমান ছিলো ১ দাম। প্রচলনের প্রথমদিকে এই মুদ্রার নাম ছিলো পাইসা আর বাহলুয়ি; পরবর্তীতে এ মুদ্রা নামকরণ করা হয় দাম। এ মুদ্রাটির একপিঠে মুদ্রিত স্থান বা টাকশালের নাম অপরপিঠে তারিখ ও মাস উৎকীর্ণ হতো। হিসাব রাখার সুবিধার্থে দাম ২৫ ভাগে বিভক্ত ছিলো এবং প্রত্যেক ভাগ জিতাল নামে পরিচিত ছিলো। এই কাল্পনিক ভাগ শুধু হিসাবরক্ষকগণ ব্যবহার করতেন।

**আধেলাহ:** আধেলাহ মুদ্রার মূল্যমান অর্ধ দাম অর্থাৎ দাম মুদ্রার অর্ধেক।

**পাওলা:** পাওলা মুদ্রার মূল্যমান ছিলো দাম মুদ্রার চার ভাগের এক ভাগ বা এক-চতুর্থাংশ।

**দামরি:** দামরি মুদ্রার মূল্যমান ছিলো দাম মুদ্রার আট ভাগের এক ভাগ বা এক-অষ্টমাংশ।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে মোগল সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেন সাধারণত গোলমোহর, রুপাইয়া ও দাম-এই তিনি মুদ্রার দ্বারাই সম্পন্ন হতো (খান, ২০১৮)। তবে কিছু অসাধু লোক মুদ্রা ঘষে বা অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করে মুদ্রার ক্ষয় সাধন করতো। এর ফলে মুদ্রার ওজন কমে যেতো। এ কারণে জাতীয় ক্ষতি সাধিত হতো। এ বিষয়ে সম্রাট আকবর অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেন এবং যুগের ভাবধারা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের ফলে এরূপ ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করার জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। এতে মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। সম্রাটের রাজত্বের প্রথমদিকের প্রায় ২৭ বছর শাসনভার রাজা টোডরমলের হাতে ন্যস্ত ছিল। এ সময় চার রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিলো। এগুলো হলো:

**লাল-ই জালালি:** এ মুদ্রায় সম্রাট আকবরের নাম উৎকীর্ণ ছিলো। এটির ওজন ছিলো ১ তোলার কিছু বেশি। এ মুদ্রা বিশুদ্ধ ছিলো। এটির মূল্যমান ৪০০ দাম।

সম্রাট আকবরের রাজত্বের শুরু থেকেই সম্রাটের নাম উৎকীর্ণ মোহর চালু ছিলো। এ মোহর স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন ধাতুতেই তৈরি করা হতো। এ মুদ্রার ধাতু বিশুদ্ধ ছিলো। এ মুদ্রাগুলোর ওজন ১১ মাসা হতো। এ মুদ্রাগুলোর মূল্যমান ৩৬০ দাম। এ মুদ্রাগুলো দীর্ঘদিন হাত বদলের ফলে ওজন কিছুটা হ্রাস পেলেও ৩৬০ দামের সমানই ধরা হতো। তবে এই মোহর ক্ষয় হতে হতে যখন চার থেকে ছয় দাম কম হতো তখন এর মূল্যমান ধরা হতো ৩৫৫ দাম। আবার এই মোহর যখন ছয় থেকে নয় দাম কম হতো তখন এর মূল্যমান ধরা হতো ৩৫০ দাম।

সম্রাট আকবরের শাসনামলের প্রথমদিকে তিন ধরণের রুপিয়া চালু ছিলো (খান, ২০১৮)। একটি ছিলো চতুষ্কোণ। এটি বিশুদ্ধ রুপার তৈরি ছিলো। এ মুদ্রাটির ওজন ছিলো

সাড়ে এগারো মাসা। মুদ্রাটি জালালা নামে পরিচিত ছিলো। এ মুদ্রার মূল্যমান ছিলো ৪০ দাম।

**গোল আকবরশাহী রুপিয়া:** এটির ওজন ছিলো ৪০ দাম। এ মুদ্রাটির পুরো ওজনের ২৩ বা এক মুর্ক হলে ধরা হতো ৩৯ দাম। আবার এই রুপিয়া যখন ওজনে দুই মুর্ক এর কম হতো তখন এর মূল্যমান ধরা হতো ৩৮ দাম। এর থেকে কম ওজনের রুপিয়া বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতো না। তখন এটি ধরা হতো ধাতু হিসেবে।

দ্বিতীয়ত সম্রাটের ২৯ বছর শাসনামলে ফারসি মেহের মাসের ১৮ তারিখে আসাদুদৌলা আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি* আমির হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়ে এক রাজকীয় পরোয়ানা জারি করেন যে, মোহরের ক্ষেত্রে তিন গ্রেন এবং রুপিয়ার ক্ষেত্রে ছয় গ্রেন পর্যন্ত কম হলেও সেগুলো পূর্ণ ওজনের হিসেবেই বিবেচিত হবে (করিম, ২০১৬)। আর যদি মোহরের ওজন এর চেয়েও কম হয় তবে যত দাম কম হবে তত দাম কম হিসেবেই মূল্যমান নির্ধারিত হবে।

আবার এই আদেশানুযায়ী এক মুর্ক কম ওজনের মোহরের মূল্য ধার্য করা হল ৩৫৫ দাম ও এক-ভগ্নাংশ। ফলে তারা এক মুর্ক ওজনের জন্য ৫ দাম বাদ দেয়া হতো। আর যদি মোহরের ওজন তিন গ্রেনের চেয়ে বেশি কম হতো এবং ১২ মুর্ক কম ওজনের জন্যে তিনি ১০ দাম কেটে নেয়া হবে। কমতিটা ১ দাম এর কিছু কম থাকলেও তা করা হতো। আসাদুদৌলার প্রচলিত নতুন বিধান অনুযায়ী মোহরের মূল্য ৬ দাম ও এক-ভগ্নাংশ কম করে ধার্য করা হয় এবং এর সোনার দাম ধার্য করা হয় ২৫৩ দাম ও এক-ভগ্নাংশ। যে বিধান অনুযায়ী গোল রুপিয়ার মূল্য তার বিশুদ্ধতা ও ওজন ঠিক থাকা সত্ত্বেও চতুষ্কোণ রুপিয়া থেকে এক দাম কমে ধার্য করা হয়, আসাদুদৌলা তা পরিবর্তন করে গোল রুপিয়ার মূল্য যখন তার পূর্ণ ওজন থাকবে বা এক মুর্ক পর্যন্ত কম হবে, ৪০ দাম ধার্য করেন। আবার আগে যেখানে দুই মুর্ক কম ওজনের জন্য দুই দাম কম মূল্য ধরা করা হতো সেখানে দাম পরিমাণ কম ওজনের জন্য এক দাম ও এক-ভগ্নাংশ কম মূল্য ধার্য করা হয় (আলী, ১৯৮৯)।

আমির আসাদুদৌলা যখন খান্দেশে যান তখন রাজা জালালি রুপিয়াতে যে মোহরের মূল্য নির্ধারণ করা হতো তা গোল মোহরে ধার্য করেন এবং একগুয়েমি স্বভাবের ফলে তিনি মোহর ও রুপিয়ার কম ওজনের জন্য মূল্যের হার পুনরায় পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারণ করেন (আলী, ১৯৮৯)।

---

* আসাদউদ্দৌলা আমির ফতেউল্লাহ সিরাজী একজন বিখ্যাত পারস্যের আলেম এবং বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি সম্রাট আকবরের দরবারে আমির হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মূলত বাংলা সনের প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। তাকে আকবরের 'নবরত্ন' সভার দশম রত্ন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

কুলিজ খান* সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে রাজার নিয়মানুযায়ী মোহরের মূল্য নির্ধারণ করার প্রথা প্রবর্তন করেন কিন্তু যেখানে মোহরের কম ওজনের জন্য রাজ্য পাঁচ দাম কম করতেন সেখানে তিনি দশ দাম কম ধার্য করেন। আর আগে যেখানে দশ দাম কম ধরা হত সেখানে তিনি বিশ দাম কম ধার্য করেন। আবার কোনো মোহর ওজনে দেড় মুর্কের কম হলেই তিনি সেটাকে তাল সোনা বলে ধরে নিতেন; এমনি করে যে রুপিয়ার ওজন এক মুর্কের বেশি কম তা তাল রূপা বলে ধরতেন (শাহনেওয়াজ: ১৯৯৯)। সবশেষে সম্রাট স্বয়ং নানাবিধ জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় তার পরামর্শদাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রথমে এই বিষয়ের বিশেষ নজর দিতে পারেননি। কিন্তু যখন এই ব্যাপারে নানাবিধ গণ্ডগোলের সংবাদ পেলেন তখন তিনি আর একটা আদেশ জারি করে রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি বাঁচিয়ে দিলেন এবং চতুর্দিকে সকলেই এই বিধানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পবিত্র সালের ৩৬ বছরের ২৬ বাহমান তারিখে (খিস্ট্রীয় ১৫৯২ সালে) যে দ্বিতীয় (আজুদি) প্রথা প্রয়োগ করলেন, শুধু একটি মাত্র ব্যতিক্রম হল, অর্থাৎ যদি কোনো মোহরের খাদ তিন মুর্কের কম না হয় এবং কোনো টাকার খাদ ছয় মুর্কের বেশি না হয় তাহলে সেগুলোকে খাঁটি বলে ধরে নিতে হবে। এই বিধান তিনি অনুমোদন করলেন না। আর এই বিধানটিই হলো অসাধু লোক প্রতারণামূলক কার্যাবলি বন্ধ করার একমাত্র কার্যকর বিধান। কারণ আগের বিধানগুলোতে টাকশালগুলোর কর্মচারীদের উপরোক্ত খাদ মিশানোর অথবা যখন খাজাঞ্চির নিখাদ মুদ্রাতে উপরোক্ত রূপ খাদ মিশাতো তা রোধকল্পে কোনো পথ ছিলো না। তাছাড়া নির্লজ্জ চোর প্রকৃতির লোকেরা কম ওজনের মুদ্রা তৈরি করতো এবং তিন গ্রেন খাদের মোহরকে ছয় গ্রেন খাদের মোহর বলে ধরতো। এইভাবে মুদ্রার খাদ বাড়ানো চলতে থাকার ফলে প্রচুর স্বর্ণ চুরি হতো এবং এই ক্ষতির কোনো পরিসীমা ছিল না (আলী, ১৯৮৯)। সম্রাটের আদেশে বাবাঘোরী গ্রেনের মাপ প্রচলন হয় এবং তাতে মাপ নেবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই একই দিন আরও কতিপয় কঠোর বিধান জারি করা হয়। যেমন খাঞ্চি ও তহশিলদারগণ খাজনাদাতাদের কাছ থেকে কোনো বিশেষ ধরনের মুদ্রা দাবি করতে পারবে না। তারা যে ধরণের মুদ্রা প্রদান করেন না কেন তা নিতে বাধ্য থাকবে এবং বর্তমান বিধান অনুযায়ী মুদ্রার মান নির্ধারণ করবে। সম্রাটের এ আদেশ অসাধু শোষকদের থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হলো।

সম্রাট আকবর দীর্ঘ সময় মোগল সাম্রাজ্য শাসন করেন। ফলে তাঁর নানা কর্মকাণ্ডে বিচিত্রতা লক্ষ করা যায়। মুদ্রা ব্যবস্থাও তার ব্যতিক্রম নয়। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করেন। ফলে মুদ্রা ব্যবস্থা এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রূপ নেয়। নিম্নে সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত কিছু মুদ্রার সচিত্র আলোচনা করা হলো:

---

* মুর্শিদকুলি খাঁ যিনি জমিন আলী কুলি নামেও পরিচিত এবং জন্মনাম সূর্যনারায়ণ মিশ্র, তিনি ছিলেন প্রথম বাংলার নবাব, যিনি ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার উপর মোগল সাম্রাজ্যের নামমাত্র আধিপত্য ছিল, সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলার নবাব ছিলেন।

**এলাহি মুদ্রাঃ** বিশ্ব মানবতাবাদের প্রতীক মোগল সম্রাট আকবর ছিলেন নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন একজন মুসলিম শাসক। যেসব গুণাবলির জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর ধর্মীয় উদারতা। মধ্যযুগের ইতিহাসে যখন ধর্মান্ধতা প্রকট রূপ ধারণ করেছিলো, ঠিক সেই সময়ে সম্রাট আকবরের ধর্মীয় উদারতা সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল। একজন সুফি মুসলমান হয়ে হয়ে জীবন শুরু করে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রজাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে উপলব্ধি করে ধর্মকে শাসনকার্যের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিকে থেকে সম্রাট আকবর একজন কৌতূহলী মানুষ ছিলেন। আকবরের জীবনের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ধর্ম সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে তোলে। রাজপুতদে*র সাথে সম্পর্কোন্নোয়নের সময় তিনি বেশ কিছু হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেন (খান, ২০১৮)। মোগল প্রাসাদেও তাদের নিজস্ব রীতিনীতিতে ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিলো। মূলত এই সময়েই তিনি হিন্দু ধর্মকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান এবং ধর্মটি সম্পর্কে তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। আবার রাজপুতনায় হিন্দুরা ছাড়াও জৈন ধর্মালম্বীরা বেশ শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। রাজপুতদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় তিনি এসব জৈনদের সংস্পর্শে আসেন, যা তাকে ধর্মটি সম্পকে কৌতূহলী করে তোলে (খান, ২০১৮)। অন্যদিকে গুজরাট অভিযানের সময় সুরাট বন্দরে তিনি প্রথ মবারের মতো খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের দেখা পান, যা তাকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে কৌতুহলী করে তোলে। মোটকথা, আকবর নিজের ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগুলো সম্পর্কেও মন থেকে জানতে চাইতেন। গুজরাটে সফল অভিযান শেষে করে ফিরে এসে আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার জন্য একটি ইবাদতখানা খোলেন। প্রথমদিকে মুসলিম মনীষীরা এসে আকবরের সাথে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। মাখদুম-উল-মুলক আব্দুল্লাহ সুলতানপুরি আর সদর-ই-সুদুর শেখ আবদুন নবীর নেতৃত্বে দুটি দল এসময় আকবরের সাথে আলোচনায় অংশ নিতেন। তবে সমস্যা হলো, তাদের ব্যক্তিজীবনে সম্পর্কের তিক্ততা থেকে নানা বিষয়েই তারা একে অপরের সাথে উত্তপ্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন। তুচ্ছ বিষয়ে তাদের এই তুমুল তর্কে আকবর প্রায়ই বিরক্ত হতেন। এমনকি ইসলামের নামে নানা দল-উপদলের অস্তিত্বেও আকবর বেশ বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে সব ধর্মের পণ্ডিতদের জন্যই তিনি ইবাদতখানার দরজা উন্মুক্ত করে দেন। আদর্শিক দিকের চেয়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মুসলিম মনীষীরা যে বিরাট ভুলটি করেছিলেন, তার খেসারত পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত দিতে হয়েছিলো। ইবাদতখানায় আসার সুযোগ পেয়ে সব ধর্মের পণ্ডিতরাই নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে সম্রাটের

* রাজপুত ভারতীয় উপমহাদেশের পিতৃগোত্রজ গোত্রসমূহের একটির সদস্য। তারা ইউরেশিয়া অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিলো। ৬ষ্ঠ শতকের পর থেকে তারা বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং বিশ শতাব্দীর মধ্যে রাজপুত শাসকেরা মধ্য এবং উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলে ও বর্তমান পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেতেন। এসময় এ পণ্ডিতরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টার পাশাপাশি অন্য ধর্মগুলোকে ভুল প্রমাণের চেষ্টা চালাতেন। আলোচনা কখনো কখনো যুক্তি বা প্রজ্ঞা ছেড়ে তর্ক পর্যন্ত গড়াত। সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী মনোভাব দেখাত পর্তুগিজ জেসুইট পাদ্রিরা। সম্রাটের সামনেই তারা ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কটুক্তি করতো। সম্রাট অবশ্য তাদের প্রতি সহনশীলতার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনার সময় সবাইকে সংযত হওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু এক ধর্মের প্রতি আরেক ধর্মের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বন্ধ হলো না। শেষ পর্যন্ত ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাধ্য হলেন ইবাদতখানার এই আলোচনা বন্ধ করে দিতে। তবে বিদ্বেষপূর্ণ সব কথাবার্তার মাঝেও বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের আলোচনা শুনতে শুনতে সম্রাট খেয়াল করলেন সবগুলো ধর্মই ভালো ভালো কথা বলে। পরে তিনি সবগুলো ধর্মের মূলভাব নিয়ে নতুন একটি ধর্ম প্রচলন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ ইচ্ছা থেকেই সম্রাট ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তার নতুন ধর্মমতটি প্রচার শুরু করলেন। তিনি এ ধর্মটির নাম দিলেন 'দীন-ই-এলাহি' বা 'স্রষ্টার ধর্ম' (আলী, ১৯৮৯)।

দীন-ই-এলাহি প্রবর্তনের আগে মোগল সাম্রাজ্যসহ অন্যান্য মুসলিম শাসনামলে টাকশাল থেকে জারিকৃত মুদ্রাগুলোয় ইসলামের ঘোষণা সম্বলিত বাণী কালেমা খোদাই করা থাকতো। পরবর্তীতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বর্গাকৃতি ও গোলায়িত রৌপ্য মুদ্রায় কালিমার স্থলে جلاله الله اکبر جل আল্লাহু আকবার জাল্লা জালাল্লাহু এবং মুদ্রার সাল তারিখ ও 'এলাহি' শব্দ উৎকীর্ণ করে এলাহি মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি আরবি চন্দ্র মাসের পরিবর্তে পারস্যে প্রচলিত সৌরমাস গণনার নিয়ম চালু করেন (রহমান)। এ সময় থেকে মুদ্রায় মুদ্রণের মাসের নাম আরবির পরিবর্তে ফারসিতে লেখার প্রচলন চালু করেন। এ মাসগুলো হলো ফারভারদিন, উরদিবেহেস্ত, খোরদাদ, ত্বির, মোরদাদ, শাহরিভার, মেহের, অবান, অযর, দেই, বাহমান এবং এসফান্দ। আকবরের এসব মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দ্বীন-ই-এলাহি মতের প্রচার ও প্রসার করা। সম্রাট আকবর টোডরমলে*র পরামর্শে মুদ্রা হতে কালিমা ও পূর্ব পুরুষদের প্রবর্তিত ট্রান্স অক্সিয়ানার লিপি বর্জন করেন। এমনিভাবে মুদ্রায় আরবির পরিবর্তে ফারসি ভাষা স্থান দখল করে। মুদ্রায় ফারসি ভাষার লিখন শৈলি ছিল নাস্তালিক। আকবরের এ সময়ে বিভিন্ন ডিজাইনের ও উচ্চ মূল্যমানের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা চালু হয়। এ সময় কোনো কোনো মুদ্রার মুখ্য পিঠে 'আল্লাহু আকবার' এবং গৌণ পিঠে 'জাল্লা জালালুহু' লিপি বিভক্তভাবে এলাহি মুদ্রায় উৎকীর্ণ করতেও দেখা যায়। এলাহি মুদ্রায় সম্রাটের নাম উৎকীর্ণ হয়নি। এলাহি মুদ্রা আকবরের রাজত্ব পর্যন্তই স্থায়ী ছিল। প্রথমদিকে এলাহি মুদ্রার ওজন ছিল ১৮৭ গ্রেন। পরবর্তী কালে মুদ্রিত এলাহি মুদ্রাগুলোর ওজন ছিল ১৬৮ গ্রেন। আকবরের এ সমস্ত মুদ্রা ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ

* টোডরমল ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী। তিনি সম্রাট আকবরের নবরত্ন অর্থাৎ নয়জন শ্রেষ্ঠ গুণীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

তথা ২১ বছর চালু ছিল। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এসব এলাহি মুদ্রা অবলুপ্ত হয় (আলী, ১৯৮৯)। তাঁর পরবর্তী কোনো উত্তরসূরিই এলাহি মুদ্রার অনুসরণ করেননি। তাই মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে বলা যায়, সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রবর্তিত দ্বীন-ই-এলাহি ও এলাহি মুদ্রার সমাপ্তি ঘটে। নিম্নে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি এলাহি মুদ্রা তুলে ধরা হলোঃ

**মুখ্য পিঠ**

مرداد ১ ،৫০ الهی

এলাহি ৫০, ১ মুরদাদ

এখানে এলাহি ৫০ মানে হচ্ছে আকবরের শাসনামলের ৫০ বছর, আর ১ মুরদাদ হচ্ছে ফারসি মুরদাদ মাসের ১ তারিখ

(অনেক গবেষক **الهی ৫০امرداد**،/এলাহি ৫০, আমরদাদ বলেছেন। তাঁরা আমরদাদকে ফারসি মাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলত আমরদাদ নামে ফারসি সনের কোনো মাস নেই।)

**গৌণ পিঠ**

এখানে সামনে তীর ধনুক হাতে রাম; তাঁর পেছনে সীতা, তাঁর দুই হাতে পদ্মের গোছা। তাঁদের মাথার উপরে দেবানগরি অক্ষরে রাম সীতা খোদাই করা।

**গোলাকার রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা**

সম্রাট আকবরের সময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুতে গোলাকার মুদ্রার বেশি প্রচলন ছিল। রুপার তৈরি গোল মুদ্রাকে বলা হতো 'রুপাইয়া' (খান, ২০১৮)। এ মুদ্রাগুলোর স্বাভাবিকভাবে ওজন হতো সাড়ে এগারো আনার সমান। এ ধরণের মুদ্রা শের শাহের আমলে সর্বপ্রথম প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে সম্রাট আকবরের নির্দেশে এ ধরণের মুদ্রাগুলো নিখুঁত করে মুদ্রণ করা হয়। এতে নুতন ছাপ দেয়া হয়। মুদ্রাগুলোর এক পিঠে আল্লাহু আকবার, জাল্লা জালালুহু অপর পিঠে মুদ্রণের তারিখ উৎকীর্ণ হতো। রুপার তৈরি এ মুদ্রাগুলো মান চল্লিশ দামের কম-বেশি হতো। তবে রাজকর্মচারীসহ অন্যান্যদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দাম নির্ধারিত ছিলো। আকবরের রাজত্বের ২৭তম বছরে তিন প্রকারের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয় (করিম, ২০০৭)। গোলায়িত রুপার তৈরি মুদ্রার নাম ছিলো 'আকবর শাহী'। এ মুদ্রার মান ছিল ঊনচল্লিশ দামের সমান। এছাড়াও মোগল আমলে এ সম্রাটের সময়ে আটত্রিশ দাম সমপরিমাণ রুপার তৈরি মুদ্রা চালু হয়। নিম্নে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রা উপস্থাপিত হলো:

**মুখ্য পিঠ**

الله اكبر جل جلا له

আল্লাহু আকবার জাল্লা জালালুহু

**গৌণ পিঠ**

تير الهى٥٤ ضرب لاهور

ত্বির ইলাহী ৪৫ যারব লাহোর

এখানে ত্বির হলো ফারসি বছরের মাস, ইলাহী ৪৫ হচ্ছে সম্রাটের শাসনকালের ৪৫ বছর, যারবে লাহোর হলো লাহোর টাকশাল।

সম্রাট আকবরের স্বর্ণ খচিত মুদ্রা ছিল স্থুল ও ভারী। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু শাসকগণের প্রবর্তিত মুদ্রার আদলে স্বর্ণ মুদ্রা চালু করার নির্দেশ দেন। তবে এগুলোর মান ও বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রচলিত মুদ্রায় سلطان এবং خقان উপাধিদ্বয়ের পরিবর্তে ফারসি হরফে پادشاه غازی/পাদশাহ গাযি উপাধি উৎকীর্ণ করেন। অন্যান্য মোগল সম্রাটের আমলে মুদ্রার পরিমাপ ওঠানামা করলেও সম্রাট আকবর মুদ্রার ওজনের সঠিকতা নিশ্চিত করেন। তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাপ ১৭০ গ্রেন পরিমাপের ছিল। দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে স্বর্ণ মুদ্রার ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বের আদর্শ পরিমাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মুদ্রায় দেখা যায়, সম্রাট আকবরের কিছু মুদ্রা ১৬৬ গ্রেন থেকে ১৬৯ গ্রেন ওজনের মধ্যে (Poole, 1892)। তবে কিছু কিছু মুদ্রা ১৫৭ গ্রেন ওজনেরও ছিল। নিম্নে সম্রাটের একটি স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থাপিত হলো:

**মুখ্য পিঠ**

جلال الدين محمد اكبر بادشاه غازى، سنه ٤٨٩

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজি, ৯৭৪ হিজরি/১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

**গৌণ পিঠ**

لا اله الا الله محمد الرسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, টাকশাল: আগ্রা

অন্য একটি স্বর্ণ মুদ্রা:

**মুখ্য পিঠ**

977 جلال الدين محمد اكبر بادشاه خلد الله سنه

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ খালাদ আল্লাহ ৯৭৭

**গৌণ পিঠ**

لا اله الا الله محمد الرسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

এ মুদ্রাটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। মুদ্রাটির ব্যাস ১৭ মি. মি., ওজন ৪.১৯ গ্রাম।

## বর্গাকৃতি মুদ্রা

সম্রাট আকবর প্রচলিত গোলাকার মুদ্রার সাথে বর্গাকৃতি বা চতুষ্কোণাকৃতি মুদ্রা চালু করেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে আকবর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ফতেহপুর সিক্রিতে স্বর্ণ ধাতবে বর্গাকৃতি মুদ্রা এবং রৌপ্য ধাতবে উক্ত আকৃতির মুদ্রা সিক্রি ছাড়াও লাহোরে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ টাকশাল হতে মুদ্রণ করা হতো। খাঁটি রুপার তৈরি এ ধরণের বর্গাকৃতি মুদ্রা মান ছিলো চল্লিশ দামের সমান। বর্গাকৃতির স্বর্ণ মুদ্রা স্বল্প সময় স্থায়ী ছিলো, অপরদিকে বর্গাকৃতি রৌপ্য মুদ্রা আকবরের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত চালু ছিলো (Chowdhury: 2001)। নিম্নে সম্রাট আকবরের একটি বর্গাকৃতি রৌপ্য মুদ্রা তুলে ধরা হলো:

**মুখ্য পিঠ**

1004 جلال الدين محمد اكبر ضرب بنگو سنه

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর, বঙ্গ টাকশাল, ১০০৪ হিজরি/১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ

**গৌণ পিঠ**

لا اله الا الله محمد الرسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ
আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী

নিম্নে সম্রাট আকবরের আমলে প্রচলিত একটি বর্গাকৃতির স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থাপন করা হলো:

**মুখ্য পিঠ**

خلد الله تعالی ملکه
بادشاه غازی جلال الدین محمد اکبر، الف

.......

খালাদ আল্লাহ তায়ালা মুলকুহ
বাদশাহ গাজি জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর, আলফ
জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর

**গৌণ পিঠ**

لا اله الا الله محمد الرسول الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

এ স্বর্ণ মুদ্রাটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। সংগ্রহ নং ০১.০১.০০৩.০০০০.০৪৩০১। এটি হিজরি ১০০০ সালের মুদ্রা। এর ব্যাস ১৭ মি. মি. এবং ওজন ৪.১৯ গ্রাম (Haque: 2023)।

## মিহরাবি মুদ্রা

বর্গাকৃতি মুদ্রা প্রবর্তনের পূর্বে সম্রাট আকবর আয়তকার মুদ্রার লম্বমান দুদিকে লজেন্স আকৃতির কিবলা প্রাচীরে অবস্থিত মিহরাব সদৃশ মুদ্রা মুদ্রণ করেন। এটি মিহরাবি মুদ্রা বলে পরিচিত ছিলো। বর্গাকৃতি বা মিহরাবি মুদ্রা গোলাকার মুদ্রার চেয়ে লিপির সংরক্ষণে অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ এ ধরণের মুদ্রার চারপাশে কিছু অংশ খালি রেখে সুবিধামত লিপি উৎকীর্ণ করা যায়। এসব মুদ্রার লিপিসমূহ সুন্দর ও সুষমভাবে ফারসি অক্ষরে নাসতালিক* লিখন পদ্ধতিতে খোদাই করা হয়েছে (Rizvi, 1975)। আকবরের এ ধরণের মিহরাবি মুদ্রা পরবর্তী কোনো মোগল সম্রাটকে অনূসরণ করতে দেখা যায়নি।

**মুখ্য পিঠ**

جلال الدين محمد اكبر بادشاه غازى خلد الله، ضرب بلدک اگرا

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজি, খালাদ আল্লাহ যারব (টাকশাল)
বালদাক আগ্রা

* নাস্তালিক লিপি ইসলামি হস্তলিপিশিল্পের একটি প্রধান ধারা। এটি ১৪শ ও ১৫শ শতকে ইরানে উদ্ভাবিত হয়। এটি কখনও কখনও আরবি লিখতে ব্যবহৃত হলেও ফারসি, তুর্কি, উর্দু এবং দক্ষিণ এশীয় লেখাতেই এর প্রয়োগ সবসময় বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

**গৌণ পিঠ**

لا اله الا الله محمد الرسول الله، ابو بکر، عمر، عثمان، علی

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী

## প্রতিকৃতি মুদ্রা

মোগল সম্রাট আকবরের পূর্বে কোনো মুসলিম শাসক উপমহাদেশে মুদ্রায় কোনো ধরণের প্রতিকৃতি ব্যবহার করেননি। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাণীর প্রতিকৃতির উপস্থাপন ধর্মবিরুদ্ধ গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর এসব প্রথা ভেঙ্গে দীন-ই-এলাহি প্রবর্তনের পর মুদ্রায় প্রাণীর প্রতিকৃতি উপস্থাপন করেন। আসিরগড় টাকশাল থেকে মুদ্রিত মুদ্রায় রাজপাখির প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে। এ মুদ্রায় বাজপাখিকে বিজয়ীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সম্রাট আকবরের বিজয়ী বাহিনীর আসিরগড় শহর অবরোধের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এ ধরনের প্রতিকৃতি মুদ্রার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় (আলী, ১৯৮৯)। যেমনঃ

**মুখ্য পিঠ**

ضرب اسیر 44 الله اکبر اسفند از الهی

আল্লাহু আকবার, এসফান্দ, এলাহি ৪৪, যারবে আসিড়

**গৌণ পিঠ**

সাধারণত আমাদের সমাজে পাতিহাঁসকে শান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সম্রাট আকবর সম্ভবত শান্তির প্রতীক হিসেবে পাতিহাঁসকে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর মুদ্রায় পাতিহাঁসের উপস্থাপন করেছেন। এ রকম একটি মুদ্রার বর্ণনা করা হলো। এতে লেখা রয়েছে:

**মুখ্য পিঠ**

**গৌণ পিঠ**

الله اکبر خوردد الهی ٥٠ ضرب اکره

আল্লাহু আকবার, খোরদাদ, এলাহি ৫০, যারবে আকরা

অর্থাৎ আল্লাহ মহান, খোরদাদ ফারসি সৌরমাসের নাম, এলাহি ৫০ মানে সম্রাটের রাজত্বের ৫০তম বছর, যারবে আকরা মানে আগ্রা টাকশাল থেকে মুদ্রাটি মুদ্রিত।

সম্রাট আকবর স্বর্ণ মুদ্রায়ও প্রতিকৃতির ব্যবহার করেছেন। তাঁর সময়ের একটি স্বর্ণ মুদ্রায় রাজমুকুট পরিহিত একজন তীর চালনাকারী ব্যক্তির পেছনে এক অবগুণ্ঠিত নারীর প্রতিকৃতি দেখা যায়। মুদ্রা বিশেষজ্ঞদের মতে, এ মুদ্রাটি বিজাপুরের শাসকের আত্মসমর্পনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে মুদ্রাটি মুদ্রিত হয়েছে (আলী, ১৯৮৯)। এ মুদ্রায় টাকশালের নাম উল্লেখ নেই। তবে এ মুদ্রাটি ১০১৩ হিজরি মোতাবেক ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুদ্রিত। আবার কোনো কোনো বিশ্লেষক বলেছেন, সম্রাট আকবরের এক পুত্রের নাম ছিল দানিয়েল। বিজাপুরের শাসক তাঁর কন্যাকে দানিয়েলের নিকট বিবাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্রাট আকবরের নিকট প্রেরণ করেন। এ মুদ্রায় তীর চালনাকারী ব্যক্তি হচ্ছে

শাহজাদা দানিয়েল এবং পর্দানশীল নারী হচ্ছে বিজাপুর শাসকের কন্যা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিকৃতি মুদ্রাগুলো সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। এগুলো বিশেষ দিবস উদযাপন, উপহার, পদকসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো।

## তাম্র মুদ্রা

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের প্রথমদিকে সম্রাটের গৌরব প্রকাশের জন্য সাম্রাজ্যের সকল টাকশাল থেকে শুধুমাত্র স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত হত। কেননা, মুদ্রায় ধাতুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের অর্থনৈতিক আভাস পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মানের মুদ্রা শাসকদের আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। আমরা জানি, স্বর্ণ একটি মূল্যবান ধাতু। এটি সবকালেই মূল্যবান ছিল। অধিক স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন শাসকের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত শক্তিশালী ছিলো বলে ধরে নেয়া হয়। অপরদিকে, কেবলমাত্র তাম্র বা সিসার মুদ্রার আধিক্য অথবা স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের হ্রাস রাজ্যের আর্থিক সংকটের পরিচায়ক। পরবর্তীতে সম্রাটের নির্দেশে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার মুদ্রণও চালু হয়। তবে তাঁর সময়ে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহারের আধিক্যতা থাকলেও তাম্র মুদ্রার প্রচলন ছিলো অতি নগণ্য। নিম্নে একটি তাম্র মুদ্রার ছবি তুলে ধরছি:

**মুখ্য পিঠ**

سکه اکبر شاهی، ضرب احمدآباد

সেক্কেহ আকবর শাহি, যারব আহমেদাবাদ

অর্থাৎ আকবর শাহি মুদ্রা, টাকশাল আহমেদাবাদ থেকে মুদ্রাটি মুদ্রিত হয়েছে।

**গৌণ পিঠ**

بهمن1 ،44 الهی

এলাহি ৪৪, ১ বাহমান

অর্থাৎ এলাহি ৪৪ হচ্ছে সম্রাট আকবরের শাসনামলের ৪৪ বছর, ১ বাহমান হলো ফারসি বাহমান মাসের ১ তারিখ।

## মুদ্রার কারিগর

টাকশালে মুদ্রা মুদ্রিত হয়। মুদ্রার উপরই জিনিসপত্রের দামের সমন্বয় সাধন নির্ভর করে। আবার সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি হলো মুদ্রা। ফলে ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আকবর মুদ্রার প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। তিনি মুদ্রা নিখুঁতভাবে তৈরি ও ব্যবস্থাপনার দিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি টাকশালে ন্যায়বান, অভিজ্ঞ, কর্মক্ষম ও বুদ্ধিমান কারিগর নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। কারণ, সম্রাট জানেন মুদ্রার কারিগরদের যত্ন ও মনোযোগের উপরই মুদ্রার অলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও নিপুণতা নির্ভর করে। আবুল ফজল আল্লামী* রচিত 'আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> যেভাবে সম্রাটের (আকবরের) তীক্ষ্মদৃষ্টির ফলে সোনা ও রূপার বিশুদ্ধতার মান সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, তেমনি সাম্রাজ্যের মুদ্রা ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়েছে। মুদ্রাসমূহ বর্তমান কোষাগারের অলঙ্কার স্বরূপ এবং জনসাধারণের অতি প্রিয়। (বিশ্বাস (অনূ.), ২০০৩)

যিনি মুদ্রার বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করেন, তাঁকে বলা হয় সায়রাফি। সম্রাটের নির্দেশে প্রতিটি টাকশালে অভিজ্ঞ সায়রাফি নিয়োগ প্রদান করা হয়। তাঁরা স্বর্ণের রং এবং উজ্জ্বলতা দেখে এর বিশুদ্ধতার মান বলে দিতে পারেন। প্রতিটি টাকাশালের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বাধাহীন দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে সতর্ক, বুদ্ধিমান, উদারপন্থি, সৎ দারোগা নিয়োগ দেয়া হয়। দারোগার কাজ ছিল কারিগরদের কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা।

## মুদ্রার সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক

মুদ্রা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যম নয়; এটি একটি সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। ইতিহাস জুড়ে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীক, রাজনৈতিক আদর্শের বাহক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নির্দেশক হিসেবে। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুদ্রার ভাষা ও নকশায় এ বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্রাট আকবরের মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা ছিলো প্রধানত ফারসি ও আরবি (Poole, 1892)। ফারসি ছিলো তৎকালীন মোগল দরবারের প্রশাসনিক ভাষা এবং উচ্চশ্রেণির

* শেখ আবুল ফজল ইবন মুবারক ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী। তিনি আবুল-ফজল, আবুল ফদল ও আবুল ফদল আল্লামি নামেও পরিচিত। তিনি তিন খণ্ডে রচিত আকবরের রাজত্বকালের সরকারি ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামা ও উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড আইন-ই-আকবরি-এর রচয়িতা এবং বাইবেলের একটি ফারসি অনুবাদের অনুবাদক।

সংস্কৃতির বাহন। ফারসি ভাষার মাধ্যমে মুদ্রায় শাসকের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়, উপাধি, রাজ্যনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতিবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। আরবি ব্যবহৃত হয়েছে ধর্মীয় বৈধতা ও ইসলামি ভাবধারার প্রতীক হিসেবে, বিশেষ করে কালেমা বা কুরআনিক আয়াতের মাধ্যমে। মুদ্রার ভাষায় সংস্কৃতির প্রভাব দুইভাবে লক্ষণীয়; প্রথমত, ভাষার ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সমাজের চিন্তাধারার পরিচায়ক। আকবরের যুগে ফারসি ভাষার প্রাধান্য ছিলো ইরানি সভ্যতার অনুকরণ ও উৎকর্ষের প্রতীক। ফলে মুদ্রায় ফারসি শিলালিপি ছিল সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশলগত অংশ। দ্বিতীয়ত, আকবরের 'দীন-ই-এলাহি' মতবাদের প্রতিফলন তার মুদ্রার ভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষ উপস্থাপনায় ফুটে ওঠে। যেমন কিছু মুদ্রায় আরবি কালেমার পরিবর্তে সূর্য বা রাম-সীতার প্রতীক দেখা যায়; যা এক সাংস্কৃতিক সংলাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া, মুদ্রার অলঙ্করণ, ক্যালিগ্রাফি এবং বর্ণমালার রূপও একটি বিশেষ শিল্পধারার প্রতীক। আকবরের মুদ্রায় ব্যবহৃত নকশা ও হস্তলিখন ঐতিহ্যবাহী ইরানি-পারস্য ক্যালিগ্রাফির ধারাবাহিকতা বহন করে, যা ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া সম্রাট আকবর 'দীন-ই-এলাহি প্রবর্তনের পর কিছু মুদ্রায় সংস্কৃত ভাষা ও দেবানগরী লিপি ব্যবহার করেছেন (Chattopadhyay, 1955)। সুতরাং, বলা যায় সম্রাট আকবরের মুদ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। আকবরের যুগে মুদ্রা কেবল লেনদেনের উপকরণ নয়; বরং তা ছিলো রাষ্ট্রীয় আদর্শ, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং বহুজাতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন।

**গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল**

আকবরের মুদ্রানীতি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ ছিলো না। এটি ছিলো এক পরিপূর্ণ রাষ্ট্রদর্শনের অংশ। যেখানে ধর্মীয় সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, প্রশাসনিক ন্যায়পরায়ণতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিলো। মুদ্রা ছিলো একপ্রকার 'রাজনৈতিক বার্তা', যা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তার চিন্তা ও দর্শনের একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রতিফলন। এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলগুলো হচ্ছে,

- সম্রাট আকবরের শাসনামলে মুদ্রা ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণ এবং তার প্রশাসনিক কাঠামোর ফলে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। এতে করে মুদ্রার মান যেমন, ধাতু, ওজন, বিশুদ্ধতা এবং নিয়মিততা নিশ্চিত হয়;
- আকবরের মুদ্রায় ইসলামি কালেমা বাদ দিয়ে 'এলাহি ধর্ম' বা 'দীন-ই-এলাহি'-র আদর্শ তুলে ধরেছেন। ফলে ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তাঁর সময়ে মুদ্রায় আরবি লিপির স্থলে ফারসি লিপি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে বহুসাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে। তবে আকবরের এলাহি মুদ্রা সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। কারণ, মুসলিম আলেম সমাজ 'দীন-ই-এলাহি'কে ইসলাম বিরোধী বলে উল্লেখ করেছিলেন;
- আকবরের মুদ্রানীতির ফলে বাজারে স্থিতিশীলতা আসে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য

সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। তাঁর উন্নত মুদ্রা ব্যবস্থার কারণে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আস্থা বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়ীরা মোগল মুদ্রাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করতো;

- সম্রাট আকবরের প্রচলিত মুদ্রায় নকশায় শিল্পরুচি, শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং ধর্মীয় সহনশীলতার চিত্র ফুটে ওঠে। এ কারণে ক্যালিগ্রাফি ও মুদ্রা-শিল্পের বিকাশ ঘটে। তবে মুদ্রায় মানুষ, প্রাণীর ছবি থাকায় মুসলমান সমাজে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারণ, ইসলাম ধর্মমতে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা বা প্রচার করা ধর্মসম্মত নয়;
- সম্রাট আকবরের মুদ্রার ভাষা ছিলো আরবি ও ফারসি। মুসলমানদের মধ্যে আরবি পবিত্র কুরআন ও আল্লাহর ভাষা। ফলে এ ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু মুদ্রা যত্রযত্র ব্যবহৃত হয়। ফলে সবসময় এটির পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন। আবার মুদ্রা সকল ধর্মের মানুষের জন্য। ফলে তৎকালীন মুসলমান আলেম সমাজ মুদ্রায় আরবি লিপির ব্যবহারে বিরোধীতা করেছিলেন।
- সম্রাট আকবর সর্বমত ধর্ম তথা দীন-ই-এলাহি' প্রবর্তনের পর মুদ্রায় রাম-সীতা মূর্তি ব্যবহার করেছিলেন। এতে তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায় তাঁদের পবিত্র ধর্মের অবতারদের অবমাননা উল্লেখ করে এটির বিরোধিতা করেন।
- আকবরের প্রচলিত মুদ্রায় রাজাধিকার, দার্শনিক চিন্তা ও আধুনিকতার সমন্বয় পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে তাঁর রাজ্য পরিচালনার দর্শনের প্রতিফলনের চিত্র ফুটে ওঠে।

সর্বোপরি, এ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের মুদ্রা ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। তিনি মুদ্রাকে কেবল লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং রাজশক্তি, ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

## সুপারিশমালা

মুদ্রা গবেষণা একটি জটিল গবেষণা। এ গবেষণা করতে বহুভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো,

আকবরের শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রাগুলোর সংরক্ষণ ও ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি করে জাদুঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

- আকবরের মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার সাথে সমসাময়িক বিশ্ব শক্তিগুলো (যেমন: অটোমান, সাফাভি, ইউরোপীয় সাম্রাজ্য) সঙ্গে তুলনা করলে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক

ইতিহাসে মোগল ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট হবে;

- আকবরের মুদ্রা ব্যবস্থার আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য আরো গবেষণা প্রয়োজন;
- ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আকবরের মুদ্রা প্রচলনের বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা করে সেই সময়কার অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব চিহ্নিত করা যেতে পারে;
- মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা ও লিপি নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় উন্মোচিত হবে;
- আকবরের মুদ্রায় ব্যবহৃত ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীক ও ক্যালিগ্রাফিক নকশার ব্যাখ্যার জন্য একটি আন্তবিষয়ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন;
- সকল আবিষ্কৃত আকবরি মুদ্রার উচ্চমানের ছবি, ওজন, ধাতব গঠন ও অবস্থান সংরক্ষণ করে একটি উন্মুক্ত অ্যাক্সেসযোগ্য ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলা;
- আকবরের দরবারের অর্থনৈতিক রেকর্ড, বাদশাহনামা, আইন-ই-আকবরি ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস ব্যবহারে গবেষকদের উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

**উপসংহার**

মোগল সম্রাট আকবরের মুদ্রার ভাষা বৈচিত্র্য ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ছিলো মোগল সাম্রাজ্যের এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। তাঁর শাসনামলে মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল। এ কারণে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী ও সুসংহত হয়েছিল। আকবর তাঁর মুদ্রা ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনেন; যা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের জনগণের জন্য উপযুক্ত ছিল। এছাড়া মুদ্রার মান ও একক নির্ধারণের মাধ্যমে তিনি বাণিজ্যিক লেনদেনকে সহজ ও কার্যকর করে তোলেন। তাঁর মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাম্রাজের শক্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মুদ্রায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর শাসনকালকে ঐতিহ্যপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। সর্বোপরি সম্রাট আকবরের প্রচলিত মুদ্রা ও তাঁর ব্যবস্থাপনা এক অবিস্মরণীয় বিষয়; যা শুধু মোগল সাম্রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামোই নয় বরং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায়ও এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল।

## তথ্য-নির্দেশ


আলী, এ কে এম ইয়াকুব। (১৯৮৯)। *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*। বুক চয়েজ: ঢাকা।

আলী, কে। (২০০১)। *মুসলিম বাংলার ইতিহাস*। আজিজিয়া বুক ডিপো: ঢাকা।

আলীম, এ. কে. এম. আবদুল। (১৯৯৬)। *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

আল্লামী, আবুল ফজল। (২০০৩)। *আইন-ই-আকবরী*। আহমদ ফজলুর রহমান (অনু.)। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

করিম, মোঃ রেজাউল। (২০১৬)। *আবহমান বাংলার মুদ্রা*। জার্নিম্যান বুকস্: ঢাকা।

করিম, আবদুল। (২০০১)। *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*। বড়াল প্রকাশনী: ঢাকা।

খান, কে এম সাইফুল ইসলাম (সম্পা.)। (২০২২)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি বিভাগ ও বাংলাদেশে ফারসি চর্চা*। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খান, ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান। (২০১৮)। *মুঘল ভারতের ইতিহাস*। ইতিবৃত্ত প্রকাশন: ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (১৩২২)। *প্রাচীন মুদ্রা*। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস: কলিকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। (১৯১০)। *প্রাচীন মুদ্রা উৎসের সন্ধানে*। কমন: কলকাতা।

বিশ্বাস, অনিবার্ণ। (২০১১)। *বাংলা ও ভারতে কড়ি*। সুবর্ণরেখা: কলকাতা।

বিশ্বাস, মুহম্মদ জালাল উদ্দিন। (২০১৭)। *আকবর দ্য গ্রেট*। ঐতিহ্য: ঢাকা।

ভট্টশালী, নলিনীকান্ত। (২০১৭)। *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*। মোঃ রেজাউল করিম (অনু.)। জার্নিম্যান বুকস্: ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, স্বপন। (২০০৭)। *সম্রাট আকবর*। গ্রন্থতীর্থ: কলকাতা ।

শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম.। (১৯৯৯)। *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমী: ঢাকা।

শাহনেওয়াজ, এ কে এম। (২০১৫)। *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ: মোগল পর্ব)*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

সরকার, হারুন-অর রশিদ। (২০১৫)। *সুলতানি বাংলার মুদ্রা ও টাকশাল*। অন্বেষা প্রকাশন: ঢাকা।

সালিম, মোঃ আদনান আরিফ ও হামিদ, মোঃ আব্দুল। (২০২০)। *কাউ টু কিপ্টোকারেন্সি*। অন্যধারা: ঢাকা।

সবুর, শাকির। (২০২০)। *সমকালীন ইরানের কবি ও কবিতা*। শোভা প্রকাশ: ঢাকা।

হোসেন, মোহা. মোশররফ। (২০১৪)। *আদি ঐতিহাসিক মুদ্রার ইতিহাস*। দিব্যপ্রকাশ: ঢাকা।

Benton, Willian. (1966). *Encyclopaedia Britannica*. Vol. XVI. Chicago: USA.

Chattopadhyay, K. (1955). *The Origin and Development of Mughal Coins.* Numismatic Society of India: Calcutta.

Chowdhury, A. M. (2001). *History of Medieval Bengal.* Asiatic Society of Bangladesh: Dhaka.

Dale, Stephen Frederic (2008). *The Garden of the Eight Paradises*: Babur and the Culture of Empire in Central Asia. London.

Hoque, Muhammad Manirul. (2023). *Gold Coin in the National Museum.* Bangladesh National Museum: Dhaka.

Lathem, Lee. (1997). *Investor word Dictionary.* Investor Publications: USA.

Mad Money. (March, 2019). *Curious Coins of Ancient India.* The Indian express.

Poole, Stanley Lane. (1892). *The Coins of the MOGHUL EMPERORS OF HINDUSTAN*. Order of the Trustees: London.

Percy, Gardner. (1975). *A History of Ancient Coinage*. Oriental Book Corporation: New Delhi.

Rahman, Siddoque Mahmudur. (2011). *Cowri to Taka.* Triune Monitor publications: Dhaka.

Rizvi, S. A. A. (1975). *The Religious and Cultural History of Akbar's Reign.* Munshiram Manoharlal: Delhi.

S. J. Bourdillion, *The Partition of Bengle Throughts the Ages.* London.

Valentine, W.H.. (1914). *The Copper Coins of India*. Low Price Publications: Dehli. https://en.wikipedia.org/wiki/Coin#: viewed on 6 April, 2025https://irabotee.com/in-coin/: viewed on 6 April, 2025

# লিঙ্গভেদে বিদেশি ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতির তারতম্য: তুলনামূলক আলোচনা

আমিনুল ইসলাম* বিপুল চন্দ্র দেবনাথ**

**Abstract:** Gender disparity in foreign language learning is a significant and widely discussed argument that reflects the psychological, social and cultural dimensions of language education. According to the discoveries of linguistics and biology, there is no biological difference between men and women in terms of language learning. As a result, both males and females are born with the same potential for language acquisition. However, various studies have showed the differences in the pace, strategies and success rates of learning between male and female students. Among Bangladeshi students, it is observed that female learners generally outperform their male counterparts in listening, speaking and reading skills. Gender studies have previously conducted much research on the cognitive differences between men and women across various domains. However, research on the disparity in language learning dynamics between genders remains limited. Therefore, the primary focus of this qualitative research was to find out which gender learns foreign languages more quickly and effectively for which reasons. Additionally, this study highlighted the necessity of adopting gender-sensitive strategies in language education to make the learning experience more inclusive and effective for all students, regardless of gender. This study also proposed some recommendations based on the results found from the data analyzed.

* আমিনুল ইসলাম, প্রভাষক, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেইল: aminul98@du.ac.bd

** বিপুল চন্দ্র দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**মূলশব্দ (Keyword):** লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য (Gender Difference), মনোভাব (Attitude), সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব (Socio-cultural Influence), ভাষাশিখন কৌশল (Learning Strategies), ভাষার ব্যবহার (Langauge Usage)

## ভূমিকা

বিদেশি ভাষা শেখা খুবই কঠিন কাজ। তবে একজন শিক্ষার্থীর ইতিবাচক মনোভাব ভাষা শেখার মতো কঠিন কাজকে সহজ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে তার শিখনগতি ত্বরান্বিত হয়। ইতিবাচক মনোভাব যেকোনো কাজ সহজে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে পঠিত বিষয়ের গুরুত্ব, শিক্ষার্থীদের প্রেষণা ও মনোভাবের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীভেদে এ নিয়ামকগুলোর মধ্যে তারতম্য লক্ষ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইউ (২০২৫) বলেন যে, পরিসংখ্যানগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে আচরণগত, জ্ঞানীয় এবং মানসিক মনোভাবের তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও, গবেষণা উপাত্তে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীরা পুরুষ শিক্ষার্থীদের তুলনায় অধিক ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে।

বিদেশি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য একটি দীর্ঘদিনের আলোচিত বিষয়, যা ভাষা শিক্ষার মনস্তত্ত্ব, সামাজিক কাঠামো এবং শিক্ষণ কৌশলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের ভাষা শেখার পদ্ধতি, মনোভাব এবং সাফল্যের হার ভিন্ন হতে পারে, যা শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। সামাজিকভাবে ভাষা শিক্ষাকে অনেক সময় “নারীসুলভ” দক্ষতা হিসেবে দেখা হয়, যা পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। চীনভিত্তিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, নারী শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষা শেখায় পুরুষদের তুলনায় বেশি উৎসাহী এবং তাদের মধ্যে উপভোগ ও আত্মবিশ্বাসের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল (লি ও অন্যান্য, ২০২৫)। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, লিঙ্গভিত্তিক দৃঢ়বদ্ধতা শিক্ষার্থীদের প্রেষণা ও আবেগের মাধ্যমে শেখার আগ্রহকে প্রভাবিত করে।

পোল্যান্ডে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ফলাফল করে থাকে। তারা নতুন ভাষার গঠন ও ব্যবহার শেখায় বেশি আগ্রহী এবং ভুল সংশোধনে বেশি দক্ষ (গ্লউকা, ২০১৪)। তবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা ছিল কম, যা শিক্ষণ কৌশলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও আগ্রহ সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতি

অবলম্বন করতে পারবেন, যা শিখনগতিকে ত্বরন্বিত করবে। ফলে ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষণ কৌশল অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, ডাচ ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ৮৮টি দেশের সাতাশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর উপর একটি বৃহৎ গবেষণা পরিচালনা করে ভেন ডার স্লিক ও অন্যান্যরা (২০১৫) দেখেন যে, নারী শিক্ষার্থীরা ভাষা বাচন ও লিখন দক্ষতায় পুরুষদের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে ভালো করে যদিও পঠন ও শ্রবণ দক্ষতায় তেমন পার্থক্য দেখা যায়নি। এই গবেষণায় প্রস্তাব করা হয় যে, নারীরা উচ্চশিক্ষা থেকে বেশি উপকৃত হয় এবং তাদের ভাষা শেখার দক্ষতা জেনেটিক ও পরিবেশগত উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। পরিবেশগত উপাদান বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে তার অতীতের ফলাফল। অর্থাৎ যেকোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক জ্ঞান, তার পরবর্তী শিখনগতিকে প্রভাবিত করে।

এইসব গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য শুধুমাত্র জৈবিক নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত প্রভাবের ফলাফল। ফলে এই পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে নিরূপণ করার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল গ্রহণ করা জরুরি, যাতে উভয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। এ কারণেই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সেসব পার্থক্য নিরূপণ করা, যেগুলো লিঙ্গভেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণগতির তারতম্যে ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণা লিঙ্গভেদে বিদেশি ভাষা শিক্ষার গতিপ্রকৃতির তারতম্য বিশ্লেষণ এবং কীভাবে সমাজের গতানুগতিক ধারণা, প্রেষণা, আবেগ এবং শিক্ষণ পরিবেশ এই পার্থক্যকে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করা হয়েছে।

### গবেষণা সমস্যার বিবৃতি

বিশ্বব্যাপী বিদেশি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে শেখার গতি, পদ্ধতি এবং সাফল্যের হারে ভিন্নতা দেখা যায়। সাধারণভাবে, বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহ ও ভালো ফলাফল দেখিয়ে থাকে। কিন্তু এর পেছনে কাজ করা সুনির্দিষ্ট কারণগুলো প্রায়শই অস্পষ্ট থেকে যায়। এই বৈষম্যের কারণ হিসেবে শুধুমাত্র জৈবিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণই নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও জড়িত থাকতে পারে। এই গবেষণায় এই নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো চিহ্নিত এবং তাদের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সমস্যাটি আরও জটিল আকার ধারণ করে, যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার ভিন্নতা ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, নারীদের ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রায়শই উচ্চশিক্ষা বা ব্যক্তিগত আগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি কর্মজীবন বা পেশাগত উন্নয়নের

সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক সূক্ষ্ম পার্থক্য, শিক্ষকদের মনোভাব এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে লিঙ্গভেদে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ধরনেও ভিন্নতা দেখা যায়। এছাড়াও কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের গঠন এবং হরমোনের প্রভাবের কারণে ভাষা প্রক্রিয়াকরণে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। অর্থনৈতিক ও পারিবারিক চাপও এই তারতম্যের একটি বড় কারণ হতে পারে, কারণ পুরুষদের ওপর কর্মজীবনে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চাপ থাকে, যা তাদের ভাষা শিখনে বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগায়।

তাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তার কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই বৈষম্যের পেছনে থাকা বিভিন্ন কারণ, যেমন: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপ, মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং অনুপ্রেরণার ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করা।

### গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিদেশি ভাষা শিখনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্যের কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে:

**ক. লিঙ্গভেদে ভাষা শিখনের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার ভিন্নতা চিহ্নিত করা:** পুরুষ ও নারীদের বিদেশি ভাষা শিখনের পেছনে কী ধরনের ভিন্ন উদ্দেশ্য (যেমন: উচ্চশিক্ষা, কর্মজীবন, ব্যক্তিগত আগ্রহ) কাজ করে, তা খুঁজে বের করা।

**খ. সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জৈবিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা:** ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক যে তারতম্য দেখা যায়, তার পেছনে থাকা সামাজিক চাপ, সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা, আত্মবিশ্বাস, মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং মস্তিষ্কের গঠন ও হরমোনের প্রভাবের মতো জৈবিক কারণগুলোর ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করা।

**গ. শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন করা:** বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষকদের মনোভাব এবং ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি লিঙ্গভেদে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনের গতি ও ফলাফলের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে, তা মূল্যায়ন করা।

**ঘ. একটি তুলনামূলক মডেল তৈরি করা:** প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের বিদেশি ভাষা শিখনের প্রক্রিয়া, চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যের কারণগুলো নিয়ে একটি তুলনামূলক মডেল বা কাঠামো তৈরি করা, যা ভবিষ্যতের শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

**পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ**

বিদেশি ভাষা শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কারণগুলোর মধ্যে লিঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা নিয়ে শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে আসছেন। ভাষা শিখার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের কোনো পার্থক্য আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। পূর্বের গবেষণার ফলাফল বলে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের শিখনগতি একদমই ভিন্ন। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের থেকে ভালো করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভালো করে। চ্যান (২০২১) বলেন যে, নারীরা সাধারণত বেশি ইতিবাচক মনোভাব ও প্রেরণা দেখায়, তবে পার্থক্য সবসময় জৈবিক নয়; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ বড় ভূমিকা রাখে।

**ক. মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত কারণ**

হেডেরিক মার্তিনেজ ও অন্যান্যের (২০১৮) মতে, ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ, অনুপ্রেরণা এবং শেখার কৌশল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া কুটুক (২০২৫) বলেন যে, সামাজিক প্রত্যাশা ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নারী-পুরুষের শেখার অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। নারীরা বেশি দায়িত্বশীল ও অধ্যবসায়ী, পুরুষরা সামাজিক চাপের কারণে কম সক্রিয়।

**অনুপ্রেরণা এবং মনোভাবঃ** সাধারণত, নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভাষা শিখতে বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং বিদেশি ভাষার প্রতি তাদের মনোভাব ইতিবাচক থাকে (এলিস, ১৯৯৭; ভান ও অন্যান্য, ২০১৫)। লুদভিগ (১৯৮৩) বলেন,

> নারীরা সামাজিক যোগাযোগের জন্য ভাষা শিখতে বেশি আগ্রহী হন, যা তাদের মধ্যে এক ধরনের একীভূত অনুপ্রেরণা (integrative motivation) তৈরি করে। অন্যদিকে, পুরুষরা কর্মজীবনের উন্নতি বা উচ্চশিক্ষার মতো ব্যবহারিক ও উপকরণগত অনুপ্রেরণা (instrumental motivation) দ্বারা বেশি চালিত হন।

**শিক্ষণ কৌশলঃ** অক্সফোর্ড (১৯৯৩) এর মতে, নারীরা ভাষা শিখনের জন্য বিভিন্ন কৌশল (Learning Strategies) ব্যবহারে বেশি দক্ষ । হোমস্ (২০০১) বলেন যে, নারী ও পুরুষের ভাষাগতির মাধে ন্যূনতম ২টা কারণ দায়ীঃ একটি কারণ মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নারীরা মুখস্থ করা, শব্দভাণ্ডার অনুশীলন এবং সামাজিক আলোচনার মতো কৌশলগুলো বেশি ব্যবহার করে। বিপরীতে, পুরুষরা প্রায়শই সমস্যার সমাধান এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ-ভিত্তিক কৌশলগুলো বেছে নেয়

(আমিন ও অন্যান্য, ২০২০)। এই কৌশলের ভিন্নতা তাদের ভাষা শিখনের গতি ও ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে।

### খ. জৈবিক ও স্নায়ু-সম্পর্কিত কারণ

লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যের পেছনে জৈবিক কারণও একটি বিতর্কিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক।

**মস্তিষ্কের গঠন:** কিছু স্নায়ুবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের ভাষা প্রক্রিয়াকরণ অংশে ভিন্নতা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বার্মান ও অন্যান্য (২০০৮) বলেন যে, ইংরেজি ভাষা শেখার সময় মেয়েদের মস্তিষ্কের ভাষা-সম্পর্কিত অঞ্চলগুলো ছেলেদের তুলনায় বেশি সক্রিয় থাকে। এটি নির্দেশ করে যে নারীদের মস্তিষ্ক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বেশি কার্যকরী হতে পারে।

**হরমোনের প্রভাব:** টেস্টোস্টেরন বা ইস্ট্রোজেন হরমোন মস্তিষ্কের কিছু অংশের গঠন ও কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। হান ও অন্যান্য (২০১৬) বলেন যে, উচ্চ মাত্রার টেস্টোস্টেরন নারীদের মস্তিষ্কের ভাষা-সম্পর্কিত অঞ্চলে গ্রে ম্যাটার কমায়, ফলে নারীদের ভাষাগত দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে। অন্যদিকে নুনিয়েস (২০১৯) বলেন যে, ইস্ট্রোজেন নারীদের কথা বলার দক্ষতা উন্নত করে, আর টেস্টোস্টেরন পুরুষদের গাণিতিক দক্ষতা বাড়ায়।

### গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বা জৈবিক কারণ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটও ভাষা শিখনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**সামাজিক প্রত্যাশা:** নারীরা প্রায়শই সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের জন্য বেশি চাপ অনুভব করে (লেকফ, ১৯৭৫)। অন্যদিকে পুরুষদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়, যা তাদের ভাষা শিখন কিছুটা শিথিল করে দিতে পারে। এই সামাজিক প্রত্যাশাগুলো ভাষা শেখার আগ্রহ ও ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে।

**বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:** বাংলাদেশের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকাগুলো বিদেশি ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

**ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য:** বাংলাদেশে নারীদের বিদেশি ভাষা শেখার প্রধান কারণ হতে পারে উচ্চশিক্ষা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা পারিবারিক যোগাযোগ। অন্যদিকে, পুরুষদের জন্য বিদেশি ভাষা শেখা প্রায়শই উন্নত চাকরি, বিদেশে অভিবাসন বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের সাথে জড়িত থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য তাদের শেখার আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে (সুলতানা, ২০১৬)।

**শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ:** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে যে, অনেক সময় পুরুষ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় বেশি সক্রিয় থাকে, যা তাদের মৌখিক দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হয়। এর বিপরীতে, নারীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশে দ্বিধাবোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিকভাবেই নারীদের মধ্যে যে লজ্জাবোধ কাজ করে, তার জন্য নারীরা মত প্রকাশে দ্বিধাবোধ করে থাকে। তবে চৌধুরী ও অন্যান্য (২০১৭) বলেন যে, যদিও ভাষা দক্ষতার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য নেই, নারীরা ভাষা শেখার কৌশল ব্যবহারে বেশি দক্ষ। আর দক্ষতার সঙ্গে সঠিক কৌশল অবলম্বন করলে ভাষাগত দক্ষতা দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

### গবেষণার যৌক্তিকতা

এই গবেষণাটি একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলাফল শিখন ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। এই গবেষণাটি যৌক্তিক হওয়ার পেছনে কিছু কারণ নিচে তুলে ধরা হলো:

ক. **শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন:** যদি এই গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, লিঙ্গভেদে ভাষা শিখনের গতি ও পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে, তাহলে এটি শিক্ষাবিদদের জন্য নতুন শিক্ষণ কৌশল ও পাঠ্যক্রম তৈরির পথ খুলে দেবে। বর্তমানে প্রচলিত বেশিরভাগ শিক্ষণ পদ্ধতি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, যা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে। এই গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে আরও কার্যকরী, লিঙ্গ-সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা সম্ভব হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি আরও ফলপ্রসূ হবে।

খ. **সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর গভীর বিশ্লেষণ:** এই গবেষণাটি শুধুমাত্র জৈবিক কারণের ওপর নির্ভর না করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোও বিশ্লেষণ করে। এটি প্রমাণ করবে যে ভাষা শেখার সাফল্য কেবল মেধার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সমাজের প্রত্যাশা, পারিবারিক চাপ এবং ব্যক্তিগত আগ্রহের মতো বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি বিশেষত প্রাসঙ্গিক, কারণ এখানে সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো ভাষা শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

গ. **নীতি নির্ধারণে সহায়তা:** এই গবেষণার ফলাফল শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করবে। নীতিনির্ধারকরা এই তথ্য ব্যবহার করে এমন কিছু পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন, যা নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে এবং তাদের ভাষা শিক্ষার আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা বাড়াতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে, শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় তুলনামূলক দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

ঘ. **গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার:** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে বিদেশি ভাষা শিখন এবং লিঙ্গভিত্তিক তারতম্য নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এই গবেষণাটি সেই শূন্যস্থান পূরণে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এটি শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ক গবেষণার জন্য নতুন পথ খুলে দেবে। এছাড়াও এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে লিঙ্গভিত্তিক আরও গবেষণা হতে পারে। ফলে এসব গবেষণার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ ও শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

**গবেষণা-প্রশ্ন**

১. বিদেশি ভাষা শিখনে নারীদের কেন বেশি আগ্রহ, অনুপ্রেরণা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখা যায়?

২. এর পেছনে কী ধরনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে?

৩. লিঙ্গভিত্তিক স্নায়বিক ও হরমোনজনিত পার্থক্য শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?

**গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো**

এই গবেষণাটি একাধিক শিক্ষণ, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। লিঙ্গভেদে বিদেশি ভাষা শিখনের তারতম্যকে কেবল একটিমাত্র তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কারণ এটি একটি বহুমুখী ঘটনা। তাই, এই গবেষণার জন্য যে তাত্ত্বিক কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে, তাতে তিনটি প্রধান তাত্ত্বিক ধারাকে সমন্বিত করা হয়েছে: ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্ব।

**ক. ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব: দ্বিতীয় ভাষা অর্জন (Second Language Acquisition - SLA) তত্ত্ব**

দ্বিতীয় ভাষা অর্জনের তত্ত্বগুলো ব্যাখ্যা করে কীভাবে একজন ব্যক্তি তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি ভাষা শেখে। এই তত্ত্বগুলো বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়।দ এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট তত্ত্ব, যা স্টিফেন ক্রাশেন দ্বারা প্রস্তাবিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন শিক্ষার্থী তখনই একটি ভাষা ভালোভাবে শেখে যখন সে এমন কিছু শোনে বা পড়ে যা তার বর্তমান দক্ষতার স্তরের চেয়ে সামান্য বেশি। এই ইনপুট ভাষা শিখনের জন্য জরুরি।

**এই গবেষণায়, দ্বিতীয় ভাষা অর্জন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা হলো:**

**ইনপুট গ্রহণ:** এই গবেষণায় দেখা হয়েছে, লিঙ্গভেদে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ধরনের ইনপুট

গ্রহণ করে কি না। এছাড়া, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের ভাষাভিত্তিক ইনপুটের মুখোমুখি হয় কি না, যা তাদের শিখনে প্রভাব ফেলে।

**উৎপাদন (Output):** মাইকেল লং এর মতে, উৎপাদন বা কথা বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষাগত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং তা ঠিক করার চেষ্টা করে। এই গবেষণাটি দেখার চেষ্টা করেছে যে, শ্রেণিকক্ষ বা সামাজিক পরিবেশে নারী ও পুরুষদের ভাষাগত উৎপাদনের (যেমনঃ কথা বলা, রচনা লেখা বা বিতর্ক) পরিমাণে কোনো পার্থক্য আছে কি না, যা তাদের শিখনের গতিকে প্রভাবিত করে।

**খ. মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বঃ স্ব-সঙ্কল্পন তত্ত্ব (Self-Determination Theory - SDT)**

এডওয়ার্ড ডেসি এবং রিচার্ড রায়ান কর্তৃক প্রস্তাবিত স্ব-সঙ্কল্পন তত্ত্বটি অনুপ্রেরণা (Motivation) নিয়ে কাজ করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের মধ্যে তিনটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা আছেঃ স্বায়ত্তশাসন, সামর্থ্য এবং সম্পর্ক। যখন এই চাহিদাগুলো পূরণ হয়, তখন মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বা অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা (Intrinsic Motivation) তৈরি হয়।

**এই গবেষণায়, স্ব-সঙ্কল্পন তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা হলোঃ**

**অনুপ্রেরণার উৎসঃ** এই তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যাবে কেন নারী ও পুরুষ ভাষা শিখনের জন্য ভিন্ন ধরনের অনুপ্রেরণা অনুভব করে। নারীরা সামাজিক সম্পর্ক গড়ার জন্য ভাষা শিখতে বেশি আগ্রহী হতে পারে (যা সম্পর্ক-সম্পর্কিত), যেখানে পুরুষরা হয়তো কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিখতে পারে (যা সামর্থ্য-সম্পর্কিত)।

**স্বায়ত্তশাসনঃ** ভাষা শেখার প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সেটি কি লিঙ্গভেদে ভিন্ন? আসওয়াদ (২০২২) বলেন যে, নারী শিক্ষার্থীরা বেশি অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা প্রকাশ করে। তারা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও অন্যের সাথে যোগাযোগের প্রশ্নে ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়। এছাড়া তাদের ইতিবাচক মনোভাব পুরুষদের তুলনায় বেশি লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, ডোয়াইগ সে ও অন্যান্য (২০২২) বলেন যে, পুরুষরা একক কাজ বা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে, যা তাদের স্বায়ত্তশাসনের চাহিদা পূরণ করে।

**গ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বঃ লিঙ্গ ভূমিকা তত্ত্ব (Gender-Role Theory)**

এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে যে, সমাজে নারী ও পুরুষের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা বা আচরণগত প্রত্যাশাগুলো কীভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব, আচরণ এবং পছন্দকে প্রভাবিত করে। সমাজে কোন কাজ "পুরুষসুলভ" বা "নারীর" জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তা এই তত্ত্বের মূল বিষয়।

**এই গবেষণায়, লিঙ্গ ভূমিকা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা হলো:**

**সামাজিক প্রত্যাশা:** বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের সমাজে, বিদেশি ভাষা শেখার পেছনে লিঙ্গভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষদের বিদেশি ভাষা শেখা তাদের কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য একটি অপরিহার্য দক্ষতা হিসেবে দেখা হতে পারে। অন্যদিকে, নারীদের বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

**ভাষা ব্যবহারের ধরন:** এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যায়, সমাজে নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারের ধরনে ভিন্নতা দেখা যায়। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীরা সাধারণত আবেগ প্রকাশে বেশি দক্ষ হয় এবং এই দক্ষতা তাদের ভাষা শিখনেও সাহায্য করতে পারে। পুরুষরা সম্ভবত যৌক্তিক বা কার্যগত উদ্দেশ্যে ভাষা ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী হয়।

## গবেষণা-পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত একটি বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং গুণগত (Qualitative) গবেষণা। গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো বিদেশি ভাষা শিখনে লিঙ্গভেদে যে তারতম্য দেখা যায়, তার কারণগুলো অনুসন্ধান করা। এই কারণে, কেবল পরিমাণগত (Quantitative) তথ্য নয়, বরং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, মনোভাব এবং অনুভূতির মতো গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা অপরিহার্য।

### ক. গবেষণার ধরন ও পদ্ধতি

এই গবেষণার ধরন হলো গুণগত কেস স্টাডি (Qualitative Case Studz)। এতে একাধিক কেস (শিক্ষার্থী) নিয়ে তাদের পরীক্ষার ফলাফল এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এই পদ্ধতিতে, একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে (বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা) একটি নির্দিষ্ট বিষয় (লিঙ্গভেদে ভাষা শিখন) সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যার ফলে এটি গবেষককে শুধু “কী” ঘটেছে তা নয়, বরং “কেন” ঘটেছে তার কারণগুলোও বুঝতে সাহায্য করে।

### খ. তথ্য সংগ্রহ

**গবেষণার জন্য প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:**

**নথি বিশ্লেষণ:** এই ধাপে, ফরাসি ভাষা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ২০০ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাদের নাম গোপন রাখা হয়েছে এবং এগুলো শুধুমাত্র গবেষণা কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। খাতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা বাছাইকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের খাতাগুলো বাছাই করা হয়েছে, যেখানে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর

খাতা রয়েছে। তাছাড়া চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগত ধাপের (প্রাথমিক, প্রাক-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর) শিক্ষার্থীদের সমান সংখ্যক অর্থাৎ প্রতি ধাপ থেকে ৫০টি করে খাতা বাছাই করা হয়েছে। তারপর বাছাইকৃত খাতাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যগুলো পরিমাণগত হলেও, সেগুলোকে গুণগতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন:

**ভুলের ধরন:** ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের খাতা থেকে প্রাপ্ত ভুলের ধরনগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোন ধরনের ব্যাকরণগত ভুল (যেমন: ক্রিয়া) বা শব্দগত ভুল তাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

**লেখার ধরন:** লেখার ধরন, যেমন: বাক্য গঠন, প্রকাশভঙ্গী এবং যুক্তির গভীরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা লিঙ্গভেদে ভিন্ন হতে পারে।

**প্রাপ্ত নম্বর:** শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা তাদের ভাষা দক্ষতার একটি প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

**ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার:** শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণের পর, প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ছেলে ও মেয়েদের দুটি পৃথক গ্রুপে বিভক্ত করে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্যমূলক নমুনা বাছাইকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতি ভাষাগত ধাপ থেকে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী শিক্ষার্থী বাছাই করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা হয়, যেখানে প্রতি ধাপের দুজন পুরুষ বা নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনের ফলাফল অনেক ভালো এবং আরেকজনের ফলাফল তুলনামূলক কম ভালো। পরবর্তী কালে এই দলগুলোর পৃথকভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারগুলোই গবেষণার মূল গুণগত তথ্য সরবরাহ করে।

**গোষ্ঠী গঠন:** শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর এবং ভুলের ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি গ্রুপ থেকে কিছু শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

**প্রশ্নাবলি:** সাক্ষাৎকারের জন্য একটি অর্ধ-গঠিত (semi-structured) প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয়েছে, যা তাদের অনুপ্রেরণা, শিক্ষণ কৌশল, সামাজিক চাপ, আত্মবিশ্বাস এবং ভাষা শিক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

**সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া:** প্রতিটি সাক্ষাৎকার পৃথকভাবে নেওয়া হয়েছে এবং অডিও রেকর্ড করা হয়েছে (শিক্ষার্থীর অনুমতি সাপেক্ষে)। এতে করে শিক্ষার্থীদের উত্তর, তাদের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের গভীরতা বোঝা সম্ভব হয়েছে।

**গ. তথ্য বিশ্লেষণ**

সংগৃহীত গুণগত তথ্যগুলো বিশ্লেষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে:

১. সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো লিখিত আকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

২. লিখিত তথ্যগুলো বারবার পড়ে প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু বা থিম খুঁজে বের করা হয়েছে। যেমন: "অনুপ্রেরণার ভিন্নতা", "শিক্ষকের প্রভাব", "সামাজিক চাপ" ইত্যাদি।

৩. এই থিমগুলোকে লিঙ্গভেদে তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা খুঁজে বের করা হয়েছে।

৪. পরীক্ষার খাতার বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোও এই থিমগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, যাতে একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।

## গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার নমুনা বাছাইকরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতা বাছাই ও দলগত আলোচনার সদস্য বাছাই উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক নমুনা বাছাইকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এখানে চেষ্টা করা হয়েছে যতটা নির্ভূলভাবে বাছাইকরণের কাজটি সম্পন্ন করা যায়, তবুও কাজটি অনেক কঠিন ছিল। বাংলাদেশে পূর্বে এ ধরনের গবেষণা খুবই কম হয়েছে। ফলে দেশীয় রেফারেন্স খুবই কম পাওয়া গেছে, বিশেষকরে ইংরেজি ব্যতিত অন্যান্য বিদেশি ভাষা বিষয়ক তেমন কোনো গবেষণা পাওয়া যায়নি।

## গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা

### ক. পরীক্ষার ফলাফলে লিঙ্গভিত্তিক তারতম্য

গবেষণার প্রাথমিক ধাপে, ২০০ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সামগ্রিকভাবে মেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল ছেলেদের তুলনায় কিছুটা ভালো। এটি শুধু প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রেই নয়, বরং লেখার গুণগত মান, বাক্য গঠন এবং শব্দভান্ডারের ব্যবহারেও দেখা গেছে। এই ফলাফলটি কিছু পূর্ববর্তী গবেষণার (এলিস, ১৯৯৭; চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০১৭) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে নারীদের ভাষা শিক্ষায় ভালো করার প্রবণতা দেখা গেছে।

এই ফলাফলকে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন (SLA) তত্ত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এর আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। সম্ভবত, নারীরা ভাষা শেখার জন্য অধিক কার্যকরী কৌশল (যেমন: বারবার অনুশীলন, শব্দভান্ডার মুখস্থ করা) ব্যবহার করে, যা তাদের লেখায় ভুল কম করতে সাহায্য করে। তাছাড়া নারীদের পরিবার থেকে চাকরি বা কোনো পেশাগত কাজ করার কোনো চাপ থাকে না। ফলে তারা চাইলেই চাকরির পিছনে না ছুটে শুধু শেখার জন্য ভাষা শিক্ষা অর্জন করতে পারে। এই বিষয়ে যদি বিদেশি ভাষায় স্নাতক পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করা যায় তবে দেখা যাবে নারী শিক্ষার্থীরা উক্ত ভাষা বিষয়ে

ভালো ফলাফল করছে। তার কারণ হচ্ছে তারা সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত ভিন্ন কোনো চাকরির জন্য পড়াশোনা না করে ভাষা বিভাগের বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনা বেশি করছে। তাই তাদের ফলাফলও ভালো থাকে। কিন্তু পুরুষ শিক্ষার্থীদের নানা চাপের মুখে চাকরির পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়, যা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ফলে নিজ বিভাগের ভাষা ভিত্তিক পড়াশোনায় তারা কম মনোযোগী থাকে।

### খ. মনস্তাত্ত্বিক ও অনুপ্রেরণাগত ভিন্নতা

সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ছেলে ও মেয়েদের বিদেশি ভাষা শেখার পেছনে অনুপ্রেরণার উৎস ভিন্ন।

**মেয়েদের অনুপ্রেরণাঃ** বেশিরভাগ মেয়ে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত আগ্রহ, উচ্চশিক্ষা এবং সামাজিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে বিদেশি ভাষা শিখার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে। তাদের মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা (Intrinsic Motivation) কাজ করে, যা তাদের শিখনে দীর্ঘমেয়াদী মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও দেখা গেছে, যা স্ব-সঙ্কল্পন তত্ত্ব (SDT) অনুযায়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণার কারণ।

**ছেলেদের অনুপ্রেরণাঃ** অন্যদিকে, ছেলেদের মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশি ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়েছে কর্মজীবনের সুযোগ, ভালো চাকরি এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার মতো ব্যবহারিক বা উপকরণগত অনুপ্রেরণার (Instrumental Motivation) কারণে। তাদের কাছে ভাষা শেখা মূলত একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। এই ভিন্নতা তাদের অধ্যবসায় এবং শেখার পদ্ধতিতে ভিন্নতা সৃষ্টি করে।

### গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা লিঙ্গভেদে ভাষা শিখনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়ঃ

**সামাজিক প্রত্যাশার চাপঃ** সাক্ষাৎকারে অনেক ছেলে শিক্ষার্থী স্বীকার করেছে যে, তাদের ওপর ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বিদেশি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের এক ধরনের সামাজিক বা পারিবারিক চাপ রয়েছে। এই চাপ তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করে।

**সামাজিক শিখন ও ভূমিকাঃ** সামাজিক শিখন তত্ত্ব (Social Learning Theory) অনুযায়ী, ছেলে শিক্ষার্থীরা তাদের রোল মডেল হিসেবে এমন কাউকে দেখে যারা বিদেশি ভাষায় পারদর্শী

এবং পেশাগতভাবে সফল। এর বিপরীতে, মেয়েরা তাদের রোল মডেল হিসেবে দেখে এমন কাউকে যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত বা শিক্ষাক্ষেত্রে সফল। এই ভিন্ন রোল মডেলগুলো তাদের ভাষা ব্যবহারের ধরন ও উদ্দেশ্যকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

**সাংস্কৃতিক মূলধন:** সাংস্কৃতিক মূলধন তত্ত্ব (Cultural Capital Theory) এই ধারণাকে সমর্থন করে যে, বিদেশি ভাষায় দক্ষতা সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদা দেয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু শিক্ষার্থীর পরিবারে ইতিমধ্যেই বিদেশি ভাষা ব্যবহারের চল আছে, যা তাদের জন্য ভাষা শেখার পথ সহজ করে দিয়েছে।

### ঘ. শিক্ষণ পরিবেশের প্রভাব

সাক্ষাৎকার থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, তা হলো শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ লিঙ্গভেদে ভাষা শিখনের ওপর প্রভাব ফেলে। কিছু শিক্ষার্থী জানিয়েছে যে, শ্রেণিকক্ষে পুরুষ শিক্ষার্থীরা মৌখিক বিতর্কে বেশি সক্রিয় থাকে, যা তাদের কথা বলার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর বিপরীতে, অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় কম অংশ নেয়, যা তাদের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বিকাশে বাধা দেয়। তবে এ বিষয়ে আরেকটি তথ্য হলো, পূর্ব লিখিত বা প্রস্তুতকৃত কোনো বিষয়ে হলে নারী শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা বেশি লক্ষণীয় হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতার ফলাফলের মতোই নারী শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল লক্ষ করা যায়।

## গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

গবেষণায় ব্যবহৃত পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচালিত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যায়:

**ক. পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনের পার্থক্য:** নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতি ভিন্নতর। পুরুষ শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাকরণ নিয়ে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, নারী শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের চেয়ে ভাষার প্রায়োগিক দিকে বেশি গুরুত্বারোপ করে। ফলে তাদের ভাষা শেখার গতিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। পুরুষ শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ ব্যবহার করে কঠিন কঠিন বাক্য গঠনে পারদর্শী হয়। তারা সবকিছুর পূর্বে ব্যাকরণগুলো শেখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। যার ফলে তারা ব্যাকরণে সীমাবদ্ধ হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। একইসাথে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের কাঠিন্যের কারণে তাদের কাছে ভাষা শেখা কঠিনতর মনে হয়। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে মোটিভেশন বা প্রেষণার অভাব লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে, নারী শিক্ষার্থীরা যেহেতু ভাষার ব্যবহারিক দিকটায় বেশি গুরুত্বারোপ করে, তারা তুলনামূলক সহজেই ভাষা ব্যবহার করতে পারে। আর ভাষা ব্যবহার করতে

পারায় তাদের সার্বিক ভাষা শিখনের গতি বৃদ্ধি পায়। তাদের ভাষা শেখার ভীতি দূর হয়। নারীরা ভাষাকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, অর্থাৎ তারা সমাজে ভাষার ব্যবহার, যোগাযোগের ধরন ইত্যাদিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আর পুরুষরা বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান অর্জন করে থাকে। যার ফলে এদের মধ্যকার শিখনগতির পার্থক্য হয়।

গবেষণায় ব্যবহৃত পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের লেখার মান ও ধরন যাচাইপূর্বক দেখা যায় যে, কোনো সৃজনশীল অনুচ্ছেদ লিখার ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষার্থীরা যথাসম্ভব উচ্চতর ব্যাকরণের ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ও প্রচলিত ব্যাকরণ ব্যবহার করেই তাদের অনুচ্ছেদ লিখেছে। আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, নারীদের লেখাগুলো বেশ গোছালো হলেও সেগুলোতে ছোটো ছোটো ব্যাকরণগত ভুল লক্ষণীয়। ব্যাকরণগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের বাক্যগুলো অর্থবহ ও প্রাঞ্জল মনে হয়েছে। তবে কিছু কিছু নারী শিক্ষার্থীর লেখা কথ্য ভাষার মতো, অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে যে ধরনের সাধারণ ও সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয় ঠিক তেমন।

**খ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব:** সমাজে লিঙ্গভেদে মানুষের বিভিন্ন বয়সে সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণেই ভাষাগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এলনেস ও অন্যান্য (২০২৪) বলেন যে, মেয়েরা তিন বছর বয়স থেকেই শব্দভান্ডার ও ভাষা প্রকাশে ছেলেদের তুলনায় বেশি স্কোর করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আরও শক্তিশালী হয়। আবার লিপার ও অন্যান্য (২০১৭) বলেন যে, সব বয়সে মেয়েরা ভাষাগত দক্ষতায় এগিয়ে থাকে। যদিও বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নরকম। মাতৃভাষায় কথা আয়ত্তীকরণ করার ক্ষেত্রে একটি শিশু তার চারপাশের মানুষের কথা বলা শুনতে শুনতে বলতে শিখে। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়না। তবে বিদেশি ভাষা যেহেতু ভিন্ন একটি পরিবেশে শেখা হয় যেখানে সকলে সেই ভাষায় কথা বলে না, তাই এক্ষেত্রে শুনে শুনে বলতে পারার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয় না। ব্যাকরণ, শব্দভান্ডারের মাধ্যেমেই ভাষা শিখতে হয়। তাই এক্ষেত্রে নারীদের সাথে পুরুষদের ভাষা শিখনের গতির খুব একটা পার্থক্য হওয়ার কথা না। তবে গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরা সাধারণত বিদেশি ভাষা শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় বেশি সফল হয় (গ্লউকা, ২০১৪; চ্যান, ২০২১)। একইসাথে, নারীরা নতুন ভাষাগত ফর্ম, ভুল সংশোধন, শব্দভান্ডার ও বাক্যগঠন দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে (গ্লউকা, ২০১৪; চ্যান, ২০২১; লি ও অন্যান্য, ২০২৫)। ফলে, তারা যেহেতু শব্দভান্ডার ও বাক্যগঠন দ্রুত আয়ত্ত করে এবং ভুল সংশোধনে বেশি মনোযোগী হয়, সেহেতু নিজ ভাষার মতো বিদেশি ভাষাও তারা ছেলেদের তুলনায় দ্রুত শেখে। তাদের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করেও একই ফলাফল পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল পুরুষ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো।

**গ. ভাষার প্রয়োগে পার্থক্য:** লিঙ্গভেদে ভাষার প্রয়োগে ও ব্যবহারে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষরা প্রযুক্তিগত ভাষার প্রতি বেশি আগ্রহী থাকে। ফলে তারা প্রযুক্তিগত শব্দভান্ডার ভালো জানে এবং তা ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানে। কেড্রিক ও অন্যান্য (২০২২) বলেন যে, পুরুষদের লেখায় বেশি তথ্যগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তথ্য, উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত বিষয়কে গুরুত্ব দেয় এবং নারীরা সংশ্লিষ্টতার বৈশিষ্ট্য থাকে, যা সম্পর্ক, আবেগ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে দেখা যায় নারীরা সাহিত্য পড়ে এবং সাহিত্য ভালো বুঝে। তেইবোয়েই (২০২৪) বলেন যে, নারীরা সামাজিক সম্পর্ক ও আবেগ প্রকাশে বেশি জড়িত থাকায় তারা রূপক বা ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ (Figurative Language) বোঝায় বেশি পারদর্শী। ফলে, সামাজিক যোগাযোগেও তারা এগিয়ে থাকে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এসকল বিষয় লক্ষ করা যায়। পুরুষদের ভাষার ব্যবহার কিছুটা সোজাসাপ্টা। অন্যদিকে নারীদের ভাষার ব্যবহার কিছুটা গদ্যময়। খুব সামান্য পরিমানে হলেও নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের লেখায় বা ভাষায় প্রয়োগে এ ধরনের কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত শিক্ষার্থীদের খাতা বিশ্লেষণ করে কিছু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রযুক্তি বিষয়ক একটি ছোটো প্রশ্ন, যেখানে কিছু শব্দের সাথে সেগুলোর সংজ্ঞা মিলিয়ে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে ছয়টি শব্দ ও ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সংজ্ঞাগুলো উপযুক্ত শব্দের পাশে লিখতে হবে। এই প্রশ্নে অধিকাংশ ছেলেরা ৫০ ভাগের উপর সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, অধিকাংশ মেয়েরাই ৫০ ভাগ সঠিক উত্তরও দিতে পারে নি। আরেকটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, পুরুষ শিক্ষার্থীরা নারী শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি প্রযুক্তিগত শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করে অনুচ্ছেদটি লিখেছে। যদিও উভয় পক্ষের লেখায়ই উল্লেখযোগ্য ভুল পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে বা সাহিত্য বিষয়ক কোনো লেখায় নারীদের যেই ফলাফল পাওয়া যায়, প্রযুক্তিগত বিষয়ে তা পাওয়া যায়নি।

**ঘ. ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নতি:** একজন শিক্ষার্থীর ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নতি তার ভাষা শিখন পদ্ধতি, ভাষা শিক্ষার পেছনে অতিবাহিত সময়, ভাষার প্রয়োগ ও দৈনন্দিন জীবনে সেটার ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এটি অনেক সময় একজন শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপরও নির্ভর করে। কারণ কোনো শিক্ষার্থী যদি আগে থেকেই কোনো বিদেশি ভাষা জানে, সেক্ষেত্রে সে জানে কীভাবে এবং কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করলে একটি ভাষা দ্রুত শেখা যায়। ফলে তার ভাষা শেখার গতি নতুন একজন শিক্ষার্থী, যার পূর্বে কোনো ভাষা শেখার অভিজ্ঞতা নেই তার থেকে ভিন্ন হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব কিছু শিখন পদ্ধতি থাকে এবং সে তার প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় ভাষা শেখার পিছনে ব্যয় করে। ভাষা শিক্ষায় ব্যয়িত সময় ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নতির পিছনে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই গবেষণায় একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যে সকল শিক্ষার্থী এক বছর ধরে ভাষা শিখছে তাদের লেখা ও যারা দুই বা ততোধিক বছর যাবৎ ভাষা শিখছে তাদের লেখার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য হয় সময়ের জন্য। যে যত বেশি সময় ধরে ভাষা শিখছে তার ভাষার ব্যবহার তত বেশি বিশুদ্ধ হয়। যেমন: প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী ফরাসি ক্রিয়ারূপ লিখতে গিয়ে অনেক ভুল করছে। বিশেষকরে অতীতকাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আবার দ্বিতীয় বর্ষের একজন ওই ভুলগুলো করছে না। যদিও উভয়ের জন্য বিষয়বস্তু একই ছিল। দুটি গ্রুপেই ফরাসি ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল। এরকম আরও অনেক বিষয় লক্ষণীয় হয়, যা শুধু ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত সময়ের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের খাতায়। এক্ষেত্রেও উভয় গ্রুপের ভুলের ধরন ভিন্নরকম। দ্বিতীয় বর্ষের অনেক শিক্ষার্থীরা নিত্যবৃত্ত অতীত ব্যবহারে ভুল করেছে। কিন্তু এই একই নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে তৃতীয় বর্ষের খাতায়। এমনিভাবে, কেউ কেউ সাবজাঙ্কটিভে (Subjunctive), কেই আবার বচনে, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিখার বিভিন্ন ধাপে ভুল করেছে। এসকল বিষয় বিশ্লেষণ করে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, একজন শিক্ষার্থী বিদেশি একটি নতুন ভাষার ব্যকরণ বা কোনো শব্দের ব্যবহার প্রথম শেখার দিন থেকে যত সময় অতিবাহিত হবে, দিন দিন সে বিষয়ে সে তত বেশি পারদর্শী হবে। এক্ষেত্রে শব্দভান্ডার মনে রাখা বা তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের ফলাফল পুরুষদের তুলনায় ভালো। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে কারিকুলাম সাজালে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখন দক্ষতা ও ভাষাগত উন্নয়ণ তরান্বিত হবে।

## সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাপত্রটি বিদেশি ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য কিছু সুপারিশমালা প্রদান করছে। এই সুপারিশগুলো শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, এবং অভিভাবকদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

### ক. শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমের সংস্কার

১. **লিঙ্গ-সংবেদনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি (Gender-Sensitive Pedagogy):** শিক্ষণ পদ্ধতি এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে তা নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে, শিক্ষকরা

মৌখিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছেলেদের এবং লিখিত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মেয়েদের বিশেষ সহায়তা দিতে পারেন।

২. **শিক্ষণ কৌশলের বৈচিত্র্য:** শুধু ব্যাকরণ ও লেখার ওপর জোর না দিয়ে, শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক, গ্রুপ ডিসকাশন, রোল-প্লে এবং প্রেজেন্টেশনের মতো কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে অব্শ্যই শিক্ষার্থী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধি বাছাই করে জোড়া বা দল গঠন করতে হবে। ফলে, এগুলো ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

৩. **স্ব-শিক্ষণ কৌশল (Self-Learning Strategies) শেখানো:** শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব শেখার ধরন (learning style) চিহ্নিত করতে এবং সে অনুযায়ী কৌশল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। এটি তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে শেখার আগ্রহ তৈরি করবে। ফলে, শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শ্রেনি কার্যক্রমের উপর এককভাবে নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারবে।

**খ. অনুপ্রেরণা ও মানসিকতার উন্নয়ন:**

১. **অনুপ্রেরণার উৎস চিহ্নিতকরণ:** শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার উৎস (যেমন: ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত আগ্রহ, সামাজিক যোগাযোগ) চিহ্নিত করা এবং সে অনুযায়ী তাদের উৎসাহিত করা। এটি তাদের শেখার আগ্রহকে দীর্ঘস্থায়ী করবে।

২. **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি:** শিক্ষকদের এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই নির্ভয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে এবং প্রশ্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জন্যেই মৌখিক যোগাযোগের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বিশেষ অনুশীলন করানো যেতে পারে।

৩. **রোল মডেল উপস্থাপন:** শিক্ষার্থীদের সামনে এমন সফল ব্যক্তিদের উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে যারা বিদেশি ভাষায় দক্ষ এবং নিজেদের কর্মজীবনে সফল। এতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের রোল মডেল দেখে অনুপ্রাণিত হবে এবং নিজেদের ওই অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পড়াশোনা করবে।

**গ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা**

১. **পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** অভিভাবকদের বোঝানো উচিত যে বিদেশি ভাষা শেখা কেবল একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের জন্য নয়, বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য একটি অপরিহার্য দক্ষতা।

২. **সামাজিক চাপ হ্রাস:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে এমন একটি বার্তা দেওয়া উচিত যে, ভাষা শেখা কেবল কর্মজীবনের সাফল্যের জন্য নয়, বরং জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্যও জরুরি। বিদেশি ভাষার গুরুত্ব সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালানো যেতে পারে। এতে করে অপ্রয়োজনীয় সামাজিক চাপ কমবে।

**ঘ. গবেষণার সম্প্রসারণ**

১. **বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা:** ভবিষ্যতে এই গবেষণাটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরও বড়ো পরিসরে পরিচালিত হতে পারে, যাতে প্রাপ্ত ফলাফল আরও নির্ভরযোগ্য হয়।

২. **দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা:** ভাষা শিখনের প্রভাব একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই, শিক্ষার্থীদের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণমূলক (Longitudinal) গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে, যাতে তাদের শিখনের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন বোঝা যায়।

**উপসংহার**

এই গবেষণাটি লিঙ্গভেদে বিদেশি ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতির তারতম্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে। প্রাপ্ত ফলাফলগুলো থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা কেবল জৈবিক বা মনস্তাত্ত্বিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলোর একটি সম্মিলিত ফলাফল।

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীরা সাধারণত ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সামাজিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে বিদেশি ভাষা শিখতে বেশি অনুপ্রাণিত হয়, যেখানে পুরুষদের প্রধান অনুপ্রেরণা হলো কর্মজীবনের সাফল্য। এই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য তাদের শেখার কৌশল এবং ধারাবাহিকতায় প্রভাব ফেলে। নারীরা লিখিত এবং ব্যাকরণগত দক্ষতা অর্জনে তুলনামূলকভাবে বেশি পারদর্শী, অন্যদিকে পুরুষরা মৌখিক যোগাযোগে অধিক আত্মবিশ্বাসী। নারী শিক্ষার্থীদের লেখা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের লেখা ব্যাকরণনির্ভর ও তুলনামূলক জটিল।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সামাজিক প্রত্যাশা ও সাংস্কৃতিক মূলধনের ধারণা এই তারতম্যকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। সমাজ প্রায়শই পুরুষদের ওপর একটি নির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতা অর্জনের চাপ তৈরি করে, যেখানে নারীদের ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। এর ফলে, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও শিক্ষকের মনোভাবও শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনের গতিপ্রকৃতিতে প্রভাব ফেলে।

এই গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে লিঙ্গ-সংবেদনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরি। শুধু পরীক্ষার নম্বর বা মুখস্থ করার ওপর জোর না দিয়ে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষণ কৌশলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই বিষয়গুলোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একটি সমতাপূর্ণ এবং কার্যকর ভাষা শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা যায়।

## তথ্য-নির্দেশ


Amin, B., Rafiq, R., & Mehmood, N. (2020). The impact of social media in English language learning. *Journal of Critical Reviews,* 7(10), 3126-3135.

Aswad, M. (2022). The Impact of Gender on Language Learning Motivation and Attitudes. *Transformational Language Literature and Technology Overview in Learning* (Transtool), 1 (3), 30-36.

Burman, D. D., Bitan, T., & Booth, J. R. (2008). Sex differences in neural processing of language among children. *Neuropsychologia*, 46 (5), 1349-1362.

Chan, V. (2021). Nature or nurture? A critical analysis of gender differences in second and foreign language learning. *Social Sciences and Education Research Review,* 8 (1), 26-41.

Chowdhury, R. A., & Kabir, S. H. (2017). Gender Differences in Language Learning Strategies and Motivation of Bangladeshi EFL Learners. *International Journal of Language Education,* 1 (2), 1-15.

Ellis, R. (1997). *SLA research and language teaching.* Oxford University Press.

Elnes, M., Hansen, J. E., Lervåg, A., Hatlevik, O. E., & Reikerås, E. K. L. (2024). Verbal and non-verbal skills in early childhood: *Dimensionality, developmental trajectories, and gender differences. Frontiers in Psychology,* 15, Article 1330334. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1330334

Główka, D. (2014). The impact of gender on attainment in learning English as a foreign language. *Studies in Second Language Learning and Teaching,* 4(4), 617. https://doi.org/10.14746/ssllt.2014.4.4.3

Hederich-Martínez, C., Camargo-Uribe, A., & López-Vargas, O. (2018). Motivation and use of learning strategies in students, men and women. *Journal of Psychological and Educational Research,* 26 (1), 121-146.

Kedrick, K., Levitskaya, E., & Funk, R. J. (2022). *Investigating writing style as a contributor to gender gaps in science and technology.* arXiv.

https://arxiv.org/pdf/2204.13805v2

Kutuk, G. (2025). *Understanding gender stereotypes in foreign language learning. TESOL Quarterly.* https://doi.org/10.1002/tesq.3267

Lakoff, R. (1975). Linguistic theory and the real world 1. *Language Learning,* 25(2), 309-338.

Lakoff, R. T. (1975). *Language and woman's place.* Harper and Row.

Leaper, C., & Smith, T. E. (2017). Gender differences in children's language: A meta-analysis. *Early Childhood Research Quarterly,* 42, 1-14.

Li, J., Wang, C., & Shen, Z. (2025). Gender Stereotypes as Related to Language Learning Engagement: Mediating Roles of Motivational Beliefs and Emotional Factors. *The Asia-Pacific Education Researcher,* 34(3), 909–920. https://doi.org/10.1007/s40299-024-00907-5

Ludwig, J. (1983). Attitudes and expectations: A profile of female and male students of college French, German, and Spanish. *The Modern Language Journal,* 67(3), 216-227.

Oxford, R. (1993). Language learning strategies: What every teacher should know. Heinle & Heinle.

Sultana, L. (2016). Bangladeshi Female EFL Learners' Motivation and Attitude towards English Language Learning. *Journal of Education and Social Sciences,* 3(1), 89-98.

Teibowei, M. T. (2024). Sociolinguistic variations and gender differences in language usage. *International Journal of English Language and Communication Studies,* 9(1), 95–101.

Tse, D. C. K., Lay, J. C., & Nakamura, J. (2022). Autonomy matters: Experiential and individual differences in chosen and unchosen solitary activities from three experience sampling studies. *Social Psychological and Personality Science,* 13 (5), 946–956. https://doi.org/10.1177/19485506211048066

Van, der Slik, F. W. P., van Hout, R. W. N. M., & Schepens, J. J. (2015). The Effect of Gender on Second Language Acquisition. *Language Learning,* 65 (3), 517-548.

Yu, X. (2025). Gender Differences in Students' Attitudes Toward English Language Learning. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media,* 94, 122-127.

# "খোয়াবনামা" উপন্যাসে কালের দহন: ভাষা বিশ্লেষণ

মুনিয়া সরকার*

**Abstract:** This research examines the linguistic representation of temporal turmoil, or ÔBurning of TimeÕ (kaler dohan), in Akhtaruzzaman EliasÕs seminal novel Khoabnama (1996). Situated in post-Tebhaga movement rural North Bengal, the novel intricately weaves social, political, and cultural unrest into its narrative. Elias employs regional vocabulary, metaphoric imagery, dialogues imbued with suppressed anger, and political slogans to convey historical realities and temporal anxiety. The language of Khoabnama is distinctive for its deep connection to the Barendra region; its dialogues are written in rich colloquial speech, giving voice to rural characters in a way that feels authentic and grounded. The studz explores how these linguistic strategies embodz social realism and symbolism, situating Khoabnama as both a literary and historical document. Comparative discussion with EliasÕs Chilekothar Sepai highlights his stylistic evolution and the continuous interplay of language, history, and society in his fiction. This paper contributes to Bangladeshi literary criticism by analyzing the subtle mechanisms through which language reflects socio-political temporality.

**মূলশব্দ (Keyword):** কালের দহন (Temporal Burn), ভাষাগত বিশ্লেষণ (Linguistic Analysis), সমাজবাস্তববাদ (Social Realism), প্রতীকবাদ (Szmbolism), মিথ (Myth), পুরাণ (Mythology), রাজনৈতিক অস্থিরতা (Political Instability), লোকবিশ্বাস (Folk Beliefs).

* মুনিয়া সরকার, প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইল: munia.sarker@seu.edu.bd

## ভূমিকা

স্বল্পপ্রজ লেখক মূলশব্দ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্বাতন্ত্র্যের অসাধারণ শক্তি নিয়ে আর্বিভূত হন সাহিত্যের আঙ্গিনায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বাংলা সাহিত্যের একজন বিশেষ স্থান অধিকারী কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাস *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তী গ্রামীণ বাস্তবতা এবং কৃষক সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা উপস্থাপন করে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো কালের দহন, যা চরিত্র এবং সমাজের মানসিক ও বাস্তব অস্থিরতার প্রতীক। তিনি দুটি মাত্র উপন্যাস এবং আটাশটি গল্প লিখেছেন। বাস্তবতার নিপুণ চিত্রণ, ইতিহাস ও রাজনৈতিক জ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও কৌতুকবোধ তাঁর রচনাকে দিয়েছে ব্যতিক্রমী সুষমা। তাঁকে সমাজবাস্তবতার অনন্য সাধারণ রূপকার বলা যায়। তাঁর রচনাশৈলী স্বকীয় ও সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার বাংলা কথাশিল্পে তাঁকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। প্রথমত, তাঁর লেখা পড়ার সময়ই মনে হয়, নতুন কিছু পড়ছি। তাঁর এই নতুনত্ব প্রকাশভঙ্গির মধ্যে, যার উপাদান ভাষা, উপমা, প্রতীক ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের জীবন-যাপনের জগতটির মধ্যেই যে আরও নানান উপলব্ধির দিক আছে তা নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে তিনি ইচ্ছে মতো সমাবেশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন ধাঁচের মানুষের। নিজের মনের মতো করে অনেকটা সময় ও স্থান জুড়ে তাদের নির্মাণ করেছেন। দুটো উপন্যাসেই তিনি উপজীব্য করেন এ দেশের দুই ক্রান্তিকালীন ঘটনা। *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা। *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত ইতিহাস নির্ভর ও গণসম্পৃক্ত উপন্যাসের উদাহরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনজনিত ক্ষমতার হাতবদল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্থাপনা ও জৈব মানবীয় সংগঠনে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয় তার চাপ ও তাপ থেকে কোনও বিবেকসম্পন্ন মানুষই মুক্ত থাকতে পারেন না। অতিসংবেদনশীল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও সময়ের এই দাহ ও দহনকে এড়াতে পারেননি, কথাসাহিত্যে উপজীব্য করেছেন। স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এই লেখকের শিল্পীসত্তার মাহাত্ম্য হল তাঁর জীবনবোধ ও জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রখরতায়। দুটি উপন্যাসে যে জীবন তিনি রচনা করতে চেয়েছেন, সে জীবন ন্যায় কিংবা অন্যায়ের নয়, শুভ কিংবা অশুভের নয়, সুন্দর কিংবা অসুন্দরের নয়, এমনকি সত্য কিংবা মিথ্যারও নয়, সে জীবন তার সফল মাত্রা ও মাত্রান্তর নিয়েই পরিপূর্ণ এক জীবন। ফলে উপন্যাসে রাজনীতি, প্রেম, যৌনতা, দারিদ্র্য, হিংসা, লোভ, সরলতা ও কুটিলতাসহ জীবনের সমস্ত মাত্রাই স্থান পেয়েছে।

### গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নির্মিতির মধ্যে অনিবার্য নিয়ামক হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষা। বহুস্বরিতার যে ধারা বাখতিনের উপন্যাস বিচারের মানদণ্ড, ইলিয়াসের জীবনবোধে সেই বহুস্বর আশ্চর্য এক ভাষিক ন্যায়পরায়ণতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) অন্যতম একটি মাইলফলক। বাস্তব, স্বপ্ন, কল্পনা, মায়া আর অপূর্ব কথনশৈলীতে তিনি তাঁর গদ্য সৃষ্টিকে নিয়ে চলেন এমন এক জায়গায় যেখানে বাংলা ভাষার সাহিত্য একটি দৃঢ় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস বিদেশি ভাষার সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন অনেকখানি। সমাজ, মানুষ ও জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে তার হতাশা, গ্লানি, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ঘোরলাগা তন্দ্রাচ্ছন্নতাকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে শৈলীতে গেঁথেছিলেন তাঁকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশক বলা যেতে পারে। *খোয়াবনামা*র ভাষা ও রচনারীতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও তাৎপর্যমুখর। বক্তব্য ও বাগভঙ্গির চমৎকার সমন্বয় রয়েছে এতে। উপন্যাসটি তিনি লেখেন উত্তরবঙ্গ বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলের জনগণের মুখের একদম কাছাকাছি ভাষায়। সংলাপে নিয়ে আসেন সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা। আঞ্চলিক শব্দের দুর্বোধ্যতায় মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো উপন্যাসে কালের দহন কীভাবে ভাষার ভেতর রূপ নিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। ইলিয়াসের ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয়; এটি ইতিহাস, সমাজ এবং চরিত্রের অভিজ্ঞতার একটি শক্তিশালী বাহন। আঞ্চলিক শব্দ, কথ্যভাষা, প্রবাদ, রাজনৈতিক স্লোগান এবং রূপক চিত্রসমূহ একত্রে এমন এক ভাষাগত বুনন তৈরি করে যা সমাজের বাস্তবতা, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থা পাঠকের কাছে প্রাঞ্জলভাবে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও, এই গবেষণাটি খোয়াবনামা-কে সমাজবাস্তবতাবাদ, প্রতীকবাদ এবং ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা তার ভাষা ও শৈল্পিক বিবর্তন এবং সময়ের অনুভূতির সঙ্গে তার সংযোগকে আরও স্পষ্ট করে।

### গবেষণার যৌক্তিকতা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা  উপন্যাসে ভাষার ব্যবহার শুধু চরিত্র ও পরিবেশ নির্মাণে নয়, বরং ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনেও অনন্য। গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সাহিত্যিক সমালোচনা এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে একত্রিত করে দেখায়, বাংলা সাহিত্য কীভাবে ইতিহাস, ভাষা এবং সংস্কৃতির মিলন ঘটাতে সক্ষম। গবেষণাটি প্রমাণ করে যে, ইলিয়াসের ভাষাগত কৌশল শুধু সময়ের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে না, বরং তার সাহিত্যিক নান্দনিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধকেও গঠিত করে।

## গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, যেখানে খোয়াবনামা উপন্যাসের কাল ও ভাষা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা, কথ্য রীতি, প্রতীক ও ব্যঙ্গাত্মক উপাদানের ব্যবহার খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সাহিত্যতত্ত্ব ও পূর্ববর্তী গবেষণাকে সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

## পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ

'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা: কালের দহনের ভাষিক রূপ' শীর্ষক রচনায় গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত নেয়া হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার এক অনন্য পরিচয় বহন করে। বিশেষত খোয়াবনামা তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাষাগত সতর্কতার কারণে সমালোচকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষক এবং সাহিত্য সমালোচক এই উপন্যাসকে ইতিহাস, সমাজ এবং ভাষার মিলনের উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাস নিয়ে ইতঃপূর্বে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক বিশেষ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় আমি ও আমার সময় প্রবন্ধে সমকালকে ধারণ করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ওয়াকিল আহমেদ সম্পাদিত সমকালীন বাংলা সাহিত্যে লেখকের সাহিত্যিক শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনিসুজ্জামান (২০০৮) উল্লেখ করেছেন যে ইলিয়াসের ভাষা গ্রামীণ বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, খোয়াবনামা-র সংলাপ, আঞ্চলিক শব্দ ও রূপক প্রতীক সমাজবাস্তবতাকে পাঠকের সামনে জীবন্ত করে তুলে। আশরাফ সাদেক (২০১২) তার সমালোচনায় লিখেছেন যে, উপন্যাসের ভাষা রাজনৈতিক উত্তেজনা, সামাজিক বিভাজন এবং কৃষকের আশা-নিরাশার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই উপন্যাসের ভাষা শুধু কথ্য বা বর্ণনামূলক নয়, এটি ঐতিহাসিক সচেতনতার বাহন। মোহাম্মদ রহমান (২০১৫) বলেছেন, আঞ্চলিক ভাষা ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ইলিয়াস যে সময় এবং স্থানের প্রামাণ্যতা তৈরি করেছেন তা সমালোচকরা বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। এই গবেষণা ও সমালোচনাগুলো দেখিয়েছে যে, খোয়াবনামার ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার এক বহুমাত্রিক দলিল। তবে অধিকাংশ গবেষণা মূলত সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ নিয়েছে; ভাষার গভীর বিশ্লেষণ ও কালের দহনকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। পূর্ববর্তী গবেষণা ও সমালোচনা দেখায় যে খোয়াবনামা তার ভাষার মাধ্যমে গ্রামীণ বাস্তবতা, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সামাজিক বিভাজনকে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছে। এই

গবেষণার উদ্দেশ্য হলো এই ভাষাগত কৌশলসমূহের গভীর বিশ্লেষণ করা এবং দেখানো যে কীভাবে কালের দহন উপন্যাসের প্রতিটি স্তরে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

## গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা

উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম। *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) থেকে *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) একেবারেই ভিন্ন মেজাজের। কারণ তিনি গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য-রচনা করতে চাননি। 'খোয়াব' শব্দের অর্থ স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কল্পনা বা স্বপ্ন নিয়েই মানুষ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটে বেড়ায়। বিপন্ন মানুষের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। ইলিয়াসের খোয়াবনামায় তেভাগা আন্দোলন, দেশবিভাগ, পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলন-সংগ্রাম ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বগুড়ার কাৎলাহার ও এর আশপাশের মানুষের কাহিনি রূপলাভ করেছে খোয়াবনামা উপন্যাসে। কাৎলাহার বিল ও তার পাশের গ্রাম গিরিরডাঙা, নিজগিরির ডাঙ্গা ও গোলাবাড়ি হাট প্রভৃতি স্থানের লোকায়ত চেতন-অবচেতন জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনা উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন অভিনবত্ব। ১৯৮৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন-

> শিল্প-সংস্কৃতির এই পানসে ও রক্তশূন্য সময়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার যে, সাধারণ মানুষের কথা ও ভাবনা আমাদেরও কতোটা সাহায্য করতে পারে। সাধারণ নিম্নবিত্তের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিতে সমগ্র দেশের মুক্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু কেবল এই কারণেই দেশবাসীকে জানতে হবে, তা নয়। বরং লেখক শিল্পীরা যদি জড়তা থেকে রক্তশূন্যতা থেকে নিজেদের শিল্পসৃষ্টিকে উদ্ধার করতে চান তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের জীবন্তসংস্কৃতির কাছে না গিয়ে আর কোন উপায় নেই। শিল্পসাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আজ ব্যক্তিসর্বস্বতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের মধ্যে। চিনুয়া আকিবি, মার্কুইজ প্রমুখ।

তাঁর সাহিত্য জীবন যে সময় পর্বে অতিবাহিত হয়েছে সেই সময় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল টালমাটাল, জনজীবন ছিল বিধ্বস্ত, তাই সেই সময়ের সমাজ বাস্তবতা সাহিত্যে আসতে বাধ্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আমি ও আমার সময় প্রবন্ধে নিজের সময়কে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

> আমার সময়ের দেওয়ালের ভেতর আমি শুধু হাঁসফাঁস করি। এভাবে বাঁচা মুশকিল। তাই কোনো বড়ো কিছু করার জন্যে নয়, এমনি বাঁচার তাগিদে, নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দেওয়ালের ওপারটা দেখার চেষ্টা করি। ওপারে কি? আমার জন্ম-মৃত্যুর বাইরে, বিশাল ও অনন্ত সময়। যতো দূর দেখা যায়, আমার

এই +২ ও -৩ পাওয়ারের বাইফোকল চশমা-চাপা যতোটা পারি দেখে নিই। দেখতে দেখতে বুক কাঁপে। আরে, সেখানেও আমি। অতীতের যতোটা চোখে পড়ে ততোটা জায়গা জুড়ে আমার বসবাস। দেখতে দেখতে দিব্যি চলে যাই সেই আদিম সময়ে, বোধ হয় তারো ওপারে, যেখানে বিশাল জলরাশির ভেতর প্রাণের একটি বিন্দু হয়ে বুদবুদ করে ভাসছি। তারপর দেখি আরো কতো জনের সঙ্গে আমি, হ্যাঁ এই ভীতু ও মন খারাপ করা আমি, ডাঙ্গায় ওঠার জন্যে তীরের মাটি ধরার চেষ্টায় একনিষ্ঠ ভাবে মগ্ন।

দুর্ভিক্ষের সময় জন্ম, সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এবং পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি একের পর এক গণআন্দোলনের পথ পেরিয়ে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে ওসমান সেই অস্বস্তিকর ভাবটারই মূর্তরূপ। পরবর্তী উপন্যাস খোয়াবনামা তে বাস্তব রাজনীতি ও সমাজের সেই অস্থিরতাকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে গেছেন আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে। *খোয়াবনামা* উপন্যাসে তমিজ, তমিজের বাপ, তমিজের মেয়ে, বৈকুণ্ঠ, কুলসুম আর তাদের স্বপ্ন প্রত্যাশা কল্পনা সবকিছু নিয়ে তৈরি হয় বহুস্তরীয় এক আখ্যান। খোয়াবনামা উপন্যাসটি এমনভাবেই বাংলা সাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অবাধ প্রান্তরে।

তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ পাঠ করার পথ মসৃণ নয়। তাঁর গল্প, উপন্যাস ভাবতে ভাবতে থেমে থেমে পড়তে হয়, কেমন যেন খেই হারিয়ে যায়। চিলেকোঠার সেপাই থেকে খোয়াবনামা একেবারেই স্বতন্ত্র মেজাজের। কারণ, তিনি নিজের ব্যবহৃত, পরিচিত ও পরীক্ষিত রীতির বাইরে যেতে চাইতেন। 'খোয়াব' অর্থ স্বপ্ন, এই রূঢ় সমাজে 'খোয়াব' অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা ছাড়া পথ নেই। এই রূঢ় সমাজে অনেক কিছুই প্রাপ্তির বাইরে থাকে। বিপন্ন মানুষ তা আশা বা স্বপ্নে পেয়ে আশ্বস্ত হয়। ইলিয়াস এই উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলন এবং ভারতভাগের ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অতীতের পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলন। বগুড়ার কাছাকাছি কাৎলাহার ও তার আশেপাশের মানুষদের নিয়ে খোয়াবনামার কাহিনি রূপ লাভ করেছে। উপন্যাসটির সময়কাল পাকিস্তানের উন্মেষলগ্ন। তমিজ, তমিজের বাপ, কুলসুম, ফুলজান সবাই ইতিহাসের অন্ধিসন্ধি থেকে উত্থিত। মন্বন্তর, অর্থনৈতিক মন্দা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, যাপিত জীবন ভাবনায় ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব, অস্তিত্বের সংকট ভিন্ন প্রতিধ্বনি শোনায় এই উপন্যাসে। তমিজ সেজন্য হুরমতুল্লার বিরুদ্ধে নালিশ করে মন্ডলের মন যোগাতে চায়, হুরমতুল্লা আজিজের টমটমে ফেরা দেখলে এর কারণ খুঁজতে তৎপর হয়। তাছাড়াও সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণভেদ, জাতিভেদ আছে। সেজন্য একসময় যে তমিজ ছিল মাঝি, সে

রূপান্তরিত হয় চাষায়, কালাম মাঝির সামাজিক মূল্যায়ন তৈরি হয়, তমিজ মাঝির বংশ হলেও ফুলজানের বিয়ে চাষি হুরমতুল্লা মেনে নেয়। দেশ বিভক্তির ফলে বৈকুণ্ঠ, নায়েব, যুধিষ্ঠির, নীরেন লাহিড়ী যেমন মানসিক বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়েছে, তেমনি ওপার বাংলার হামিদা বিবির ভাই আহসানউল্লাহর মতো অনেকের মৃত্যুও ডেকে এনেছে। কামারপাড়ার যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু পরবর্তীতে প্রতিশোধ হিসেবে আফসারের মৃত্যু মানসিক বোধবৃত্তির প্রশ্নকে শাণিত দৃষ্টিতে উন্মোচিত করেন লেখক। এখানে দ্বন্দ্বমুখর সমাজ বাস্তবতায় সবাই দ্বান্দ্বিক। খোয়াবনামার ইতিহাস আধুনিক সময়ের প্রশ্নকে উন্মোচনের ইতিহাস। বাংলাদেশের বর্গাভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক ও মাঝি সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা বজায় রাখতে যে শ্রেণি সংগ্রামের সম্মুখীন হয় তার প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে এই উপন্যাসটিকে। আর এই সংগ্রামের সম্মুখভাগে থাকে তমিজের মত সমাজের একেবারে নিম্নবিত্ত অংশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা। বৃহত্তর সমাজ, শ্রেণি সংঘাত ও দারিদ্র্যের কাছে হেরে যেয়েও কীভাবে স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, তাই এ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। উপন্যাসটি তিনি লেখেন বরেন্দ্র অঞ্চলের জনগণের মুখের একদম কাছাকাছি ভাষায়। শুধু তাই নয়, সংলাপে পুরোপুরি নিয়ে আসেন সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা। উপন্যাসের গাঁথুনিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুখপাঠ্য করার কৃত্রিম প্রবণতা নেই। বাক্যগুলো অবিরাম স্রোতের মতো প্রবহমান। আঞ্চলিক শব্দের দুর্বোধ্যতায় মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। গল্পে বিশাল আবহ সৃষ্টি করে টুইস্ট আনা হয়নি। বিশেষ করে ট্র্যাজিক মুহূর্তের বর্ণনায় লেখক ছিলেন সংবেদনশীল। উপন্যাসের ট্র্যাজিক মুহূর্তগুলো চিত্রিত হয়েছে সমারোহহীন, স্বাভাবিক ছন্দে, মাঝে মাঝে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে। এই উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও পরিধি সমস্ত বাঙালি জাতির মর্মমূলকে স্পর্শ করেছে। বিস্তৃত পরিসরে ইতিহাস, রাজনীতি- সমাজ ও লোকসংস্কৃতি এতে প্রাতিস্বিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর লেখার 'কথাবস্তু' ও 'রূপ' সম্পর্কে বলেন-

> কথাবস্তু যখন আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় তখন তা একটি রূপের মধ্যে দিয়েই আসে। বস্তুটি যদি আরোপিত না হয়, সৌখিন না হয় কিংবা কেতাবী থিওরির আদেশজাত না হয় তাহলে উপযুক্ত রূপ আমি লাভ করবোই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষা ও রচনারীতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> ভাষারীতি উপন্যাসের সমগ্ররীতি বা বিষয়বস্তু থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয় এবং এটা একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি ও সমাজচেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তার ভাষারীতির আঁধারে ধরে রাখেন।

ইলিয়াসের উপন্যাসের ভাষা স্বতন্ত্র। বক্তব্য ও বাগভঙ্গির অনন্য সমন্বয় রয়েছে খোয়াবনামা  উপন্যাসে। ইলিয়াস তার ভাষা ব্যবহারে নানা বৃত্তির মানুষকে অবলোকন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিবর্তনশীল সোশ্যাল রিয়ালিটিকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেছেন-

> বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় এখন ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। নির্বাচন, পার্লামেন্ট, বিচার ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় সব ভাঙ্গছে। মধ্যবিত্ত মৌলবাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, মিলিটারিকে শাসক মেনেছে, অথচ ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া উত্থানের সময় ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, মিলিটারি শুধু সীমান্তরক্ষী। সমাজের ভাঙ্গনের সময় উপন্যাসের ফর্ম ভাঙ্গে ছিমছাম বাঁধুনিতে, বুর্জোয়া Rationality-র বুননে প্রচলিত ফর্মে সমাজ বাস্তবতা আর ধরা যাবে না। আর কাহিনি এবং অবিকল জীবনচিত্র রচনা করে লাভ কী?

সমাজবাস্তবতাবাদ সাহিত্যকে সমাজের সত্য প্রতিফলনের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখায়। খোয়াবনামাতে আঞ্চলিক ভাষা, সংলাপ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত সবই সমাজবাস্তবতাবাদের অন্তর্ভুক্ত। চরিত্রদের কথোপকথন এবং তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশ করে। ইলিয়াসের ভাষায় প্রকৃতি, সময়, বস্তু এবং স্থান প্রায়শই প্রতীক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, শুকিয়ে যাওয়া নদী, কুয়াশা ঢাকা মাঠ, ভাঙা ঘাট- এসব রূপক কেবল প্রাকৃতিক চিত্র নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উত্তাপের প্রতীক। প্রতীকবাদিক দৃষ্টিকোণ ভাষার বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা তুলে ধরে। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব উপন্যাসের আঞ্চলিক শব্দ, প্রবাদ, কথ্যভাষা এবং রাজনৈতিক পরিভাষা বিশ্লেষণে সাহায্য করে। খোয়াবনামাতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা নির্দিষ্ট সময় এবং অঞ্চলের ইতিহাসের সঠিক প্রতিফলন। এটি ভাষাকে একটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিণত করে। খোয়াবনামা ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হলেও এর সময়কাল ১৯৪৬-১৯৫০-এর তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তী গ্রামীণ উত্তরবঙ্গ। এই আন্দোলন মূলত কৃষকদের অধিকার, জমি ভাগাভাগি এবং মালিক-শ্রমিকের বৈষম্য নিরসনের জন্য সংগঠিত হয়েছিল। ইলিয়াসের উপন্যাসে সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তাপ স্পষ্ট। জমির মালিকানা, কর্পোরেট বা জমিদারী ব্যবস্থা, কৃষক ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কঠোর বাস্তবতা ভাষার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। আনিসুজ্জামান Akhtaruzzaman Elias: The Language of Social Reality নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয় বরং গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তিনি বলেন, খোয়াবনামার সংলাপ, আঞ্চলিক শব্দচয়ন এবং রূপক প্রতীকসমূহ সমাজের দৈনন্দিন জীবন, শোষণ, দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র পাঠকের সামনে জীবন্তভাবে তুলে ধরে। আনিসুজ্জামান বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে, ইলিয়াসের ভাষা ঐতিহাসিক

সচেতনতার বাহক হিসেবে কাজ করে, যা গ্রামের কৃষক ও নিম্নবর্গের মানুষের আশা-নিরাশা, প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। ফলে, খোয়াবনামার ভাষা কেবল সাহিত্যিক অলঙ্কার নয় বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার এক বহুমাত্রিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।৬ আশরাফ সাদেক (২০১২) তার সমালোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, ইলিয়াসের উপন্যাসের ভাষা কেবল কথ্য বা বর্ণনামূলক নয়। তিনি বলেন, উপন্যাসের ভাষা রাজনৈতিক উত্তেজনা, সামাজিক বিভাজন এবং কৃষকের আশা-নিরাশার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই উপন্যাসের ভাষা শুধু কথ্য বা বর্ণনামূলক নয়, এটি ঐতিহাসিক সচেতনতার বাহন।

ভাষা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হয়ে উপন্যাসের গল্পকে গভীর অর্থ প্রদান করে। কৃষক ও সাধারণ মানুষের আশা, দুঃখ এবং প্রতিক্রিয়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথন, শাসক ও জমিদারের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব এবং আন্দোলনের সময়কালের রাজনৈতিক উত্তেজনা- এসব ভাষার মাধ্যমে সামনে আসে। ইলিয়াস স্থান ও সময়ের প্রামাণ্যতা বজায় রাখতে স্থানীয় উচ্চারণ, আঞ্চলিক শব্দ, প্রবাদ এবং কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দ যেমন: 'দাওয়ায় বসা', 'আছিস?' বা 'ধান ভাগের সময়' বা 'মাঠে যাওন'। এই আঞ্চলিকতা শুধু পরিবেশের স্বাদ আনে না, বরং চরিত্রদের সামাজিক পরিচয় এবং রাজনৈতিক অবস্থানও প্রকাশ করে। তমিজ, কুলসুম, ফুলজান, হুরমতুল্লা, কালাম মাঝি এরা সবাই উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে-

> আরে হামার বর্গাচাষা হামার জমির ধান লিয়া গেলো নিজের ঘরত, আবার শুনি ওই চাষা বলে হামারই পার্টির মানুষ। মানুষ হাসে, ইগলান কী পার্টি করো গো? -আক্কেলপুর ইস্টিশনত ট্রেন লেট করায়া তমিজুদ্দিন খান সাহেবকে দিয়া লেকচার দেওয়ালাম। গাঁয়ের মধ্যে থাকা মানুষ লিয়া আসিছি। কতো ওয়ার্কারেক চিঁড়াগুড় খিলালাম! এখন ওই নেমকহারামরাই হামার বর্গাদেরকে উস্কানি দেয়।

এখানে তিন হাজার বিঘা জমির মালিকের সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সবাই চিন্তিত। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একজন কৃষক বরাবরই বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। একজন কৃষকের জাতিগত সত্তা, ধর্মীয় সত্তা ও তার সামাজিক সত্তা তা যাই থাকুক না কেন, কৃষক বরাবরই নিপীড়িত ও বঞ্চিত। অন্যদিকে জমিদার জোতদারদের মধ্যেও জাতিগত সত্তা নিয়ে বা ধর্মীয় সত্তায় তাদের মধ্যে বিভাজন থাকলেও শোষণ ফর্মুলায় এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। আধিয়ারদের শোষণ করে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কথ্যভাষার সরলতা এবং সরাসরি অভিব্যক্তি কালের দহন বা

সময়ের উত্তাপকে পাঠকের কাছে প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরে। মোহাম্মদ রহমান (২০১৫) তার সমালোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, আঞ্চলিক ভাষা ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ইলিয়াস যে সময় ও স্থানের প্রামাণ্যতা তৈরি করেছেন তা সমালোচকরা বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, খোয়াবনামার ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয়, বরং সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার এক বহুমাত্রিক দলিল।

উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা ও প্রতীক পাঠককে স্থানীয় জীবনের সাথে পরিচয় করায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভাজন, কৃষকের আশা-নিরাশা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, উপন্যাসের ভাষা গল্প বলার চেয়ে বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক সচেতনতার বাহক হিসেবে কাজ করে। ইলিয়াস প্রকৃতি ও দৈনন্দিন বস্তুর মাধ্যমে সময়ের উত্তাপের প্রতীক ব্যবহার করেছেন-

ক. শুকিয়ে যাওয়া নদী: অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থবিরতার চিহ্ন।

খ. কুয়াশা ঢাকা মাঠ: রাজনৈতিক ও ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার প্রতীক।

গ. ভাঙা ঘাট: সামাজিক বিভাজন ও মনস্তাত্ত্বিক চাপের প্রতীক।

এই রূপকগুলি ভাষার মাধ্যমে কালের দহনকে পাঠকের চোখে দৃশ্যমান করে তোলে। আবার সংলাপে তিনি চাপা ক্ষোভ ও বঞ্চনার ভাষা প্রকাশ করেছেন। চরিত্রদের সংলাপে সময়ের উত্তাপ ও সামাজিক অবস্থা প্রকাশ পায়:

কৃষক: ধান তো আমাদের ঘামেই পাকল, ভাগ যাবে অন্যের ঘরে।

শ্রমিক: আমরা লড়ব না, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে?

জমিদার: সব কিছুই বদলে যাচ্ছে, আমাদের ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

কৃষক, শ্রমিক ও জমিদারের সংলাপ তিনটি আসলে ১৯৪০-৫০ দশকের পূর্ববাংলার শ্রেণিসংঘর্ষ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার শিল্পিত রূপ। কৃষকের বক্তব্য- 'ধান তো আমাদের ঘামেই পাকল, ভাগ যাবে অন্যের ঘরে' -শোষিত কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও জমিদারি প্রথার নির্মম চিত্র তুলে ধরে। শ্রমিকের সংলাপ- 'আমরা লড়ব না, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে?'- অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের অনিবার্যতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ প্রকাশ করে। অন্যদিকে জমিদারের স্বীকারোক্তি– 'সব কিছুই বদলে যাচ্ছে, আমাদের ক্ষমতাও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে'- পতনোন্মুখ শাসকশ্রেণির ভয় ও অসহায়তার প্রতিফলন। এই তিন শ্রেণির ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একসাথে মিলিয়ে লেখক দেখিয়েছেন- শোষণ ও প্রতিরোধের দ্বন্দ্বে ভরপুর একটি সমাজ বদলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কৃষক শোষিত জনতার, শ্রমিক  সংগঠিত সংগ্রামের, আর

জমিদার  ভেঙে পড়া পুরনো সামাজিক কাঠামোর প্রতীক। সংলাপগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ শক্তিশালী ভাষা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও সময়ের ইতিহাসকে সমানভাবে ধারণ করেছে, যা খোয়াবনামার মূল থিম- স্বপ্ন, ভয় ও পরিবর্তনের গল্পকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। সংলাপের সরলতা এবং চাপা রাগ উপন্যাসের বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক উত্তাপকে প্রতিফলিত করে। উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের রাজনৈতিক শব্দভান্ডার সরাসরি উপস্থিত: 'তেভাগা চাই', 'মাঠ আমাদের', 'জমিদারকে নয়, কৃষকের অধিকার'।

এই ভাষা কেবল চরিত্রের নয়, ইতিহাসের স্বাক্ষ্যও বহন করে। ভাষা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলনের এক প্রামাণ্য দলিল। ইলিয়াস গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্রমবিকাশ ও সাংস্কৃতিক চাপকে ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। কৃষকের কাজ, ঘরের কাজ, উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান এসব আঞ্চলিক শব্দ এবং বর্ণনার মাধ্যমে কালের দহনকে আরও গভীরভাবে প্রকাশিত করে। ইলিয়াসের ভাষা একদিকে সরল কথ্য, অন্যদিকে রূপক ও প্রতীক, সংলাপ, রাজনৈতিক স্লোগান সব মিলিয়ে এক শিল্পমিশ্রণ। এই শৈল্পিক কাঠামো কেবল উপন্যাসকে নান্দনিক করে না, ইতিহাস ও সমাজের প্রতিফলনও নিশ্চিত করে। খোয়াবনামাতে কালের দহন ভাষার বিভিন্ন স্তরে উপস্থিত- আঞ্চলিক শব্দ, রূপক, সংলাপ, রাজনৈতিক ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা সব মিলিয়ে ভাষা হয়ে ওঠে সময়ের উত্তাপের এক শৈল্পিক দলিল। ইলিয়াস এখানে দেখিয়েছেন, কীভাবে ইতিহাস, সমাজ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে একত্রিত হতে পারে। ইলিয়াসের খোয়াবনামা এবং চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাস দুটির মধ্যে ভাষা ও কালের দহনের প্রকাশে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করা যায়। খোয়াবনামাতে আঞ্চলিক শব্দ, প্রবাদ, কথ্যভাষা এবং রাজনৈতিক স্লোগানগুলোর ব্যবহার গভীর এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। চিলেকোঠার সেপাইতে ভাষা তুলনামূলকভাবে সরল, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উত্তাপের চিত্র অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। খোয়াবনামাতে প্রকৃতি, নদী, মাঠ, ঘাট সবই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রতীক। চিলেকোঠার সেপাইতে রূপকগুলোর ব্যবহার মূলত মানসিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত দুঃখের প্রতিফলন। খোয়াবনামাতে সংলাপ রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং সময়ের উত্তাপ ফুটিয়ে তোলে। চিলেকোঠার সেপাই তে সংলাপ চরিত্রের আভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। এই তুলনা থেকে বোঝা যায়, ইলিয়াস খোয়াবনামাতে ভাষাকে কেবল বর্ণনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি; তিনি তা সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সময়ের উত্তাপের বহুমাত্রিক প্রকাশে পরিণত করেছেন। ইলিয়াসের ভাষাগত কৌশলগুলো বাংলা সাহিত্যে কালের দহন প্রকাশের এক অনন্য উদাহরণ। উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা ও সামাজিক কাহিনি বাস্তবতার ধারাকে শক্তিশালী করেছে। প্রকৃতি ও দৈনন্দিন বস্তুর মাধ্যমে সময়ের উত্তাপ এবং সামাজিক বিভাজন প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকরা স্বীকার করেছেন যে খোয়াবনামা র ভাষা ইতিহাস, সমাজ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠকের কাছে সময়ের উত্তাপ জীবন্ত করে তোলে (আনিসুজ্জামান, ২০০৮)।

আবার রীতি কৌশলের সঙ্গে ইতিহাস যেন দেহতলায় জড়িয়ে গেছে। শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক নয়, ইলিয়াসের প্রেক্ষণশক্তিতে তা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। সেক্ষেত্রে ইলিয়াসের গদ্য ভিন্ন শক্তিতে প্রদীপ্ত, পুরাণ ও ঐতিহ্যের অঙ্গে নৃতত্ত্ব যেন গভীরভাবে জড়ানো। প্রকরণ দেখেই অনুমান করা যায়, সময়ের জটিল বাস্তবতার চিত্র-

> পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিলো, ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার।... তাকে যদি এক নজরে দেখা যায়- এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়।

এখানে তমিজের বাপকে ঘিরে বর্ণিত 'পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে... আসমানের মেঘ খেদায়' অংশটি গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা ও প্রতীকী তাৎপর্যের এক অনন্য উদাহরণ। কাদা এখানে কৃষকজীবনের অনিবার্য দারিদ্র্য ও সংগ্রামের প্রতীক, যেখানে মানুষ প্রতিদিন অনিশ্চয়তার কাদায় আটকে থাকে। গলার রগ টানটান করে আকাশের দিকে তাকানো তার আকাঙ্ক্ষা ও আশার প্রতিফলন, যেন সে দুঃসময় দূর করার সংকল্প নিয়েছে। গাঢ় ছাই রঙের মেঘ বিপদ, অন্ধকার ও সামাজিক শোষণের ইঙ্গিত বহন করে; আর সেই মেঘ তাড়ানোর প্রয়াস মানুষের প্রতিরোধচেতনার প্রতীক। কালো কুচকুচে হাত শ্রমজীবী জীবনের চিহ্ন, যা সূর্যের তাপে ও কঠোর পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে। মেঘ খেদানো হয়তো বাস্তবে অর্থহীন, কিন্তু এতে প্রকাশ পায় মানুষের মানসিক দৃঢ়তা- যেখানে হতাশার মাঝেও আশা বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা থাকে। এই দৃশ্যের মাধ্যমে লেখক শুধু বাস্তববাদী গ্রামীণ জীবনচিত্রই আঁকেননি, বরং সাধারণ মানুষের অবিচল মনোবল ও স্বপ্নবোধকে গভীরভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

*খোয়াবনামা*র শুরুই হয়েছে মিথ দিয়ে। এখানে ধূসর হয়ে যাওয়া অতীতকে পাওয়া যায়, ইতিহাসের ঘটনার উল্লেখ এবং সেই সঙ্গে লোকবিশ্বাসকে। এতেই ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসের অভাব-অনটন, শোষণ-বঞ্চনা, লোকবিশ্বাস আর স্বপ্নের পাঁকে ডুবে থাকা মানুষের ঘোরগ্রস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতায় প্রবেশের তোরণ রচনায় একটি কুয়াশাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। ইলিয়াস মিথকে এইভাবে আবিষ্কার করেন এবং দেখান যে মানুষের বিদ্রোহের আর লড়াইয়ের স্মৃতি থেকে যায় তার অবচেতনার পরতে পরতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এবং তা বেরিয়ে আসে কখনো মন্ত্র বা গানের শ্লোক হয়ে, কখনো আঁকিবুকি টানা নকশার ভেতর দিয়ে, আবার কখনো বা স্বপ্নব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মিথ যে অতীতের বহু বিদ্রোহ ও গণসংগ্রামের স্মৃতিকে ধারণ করে রেখেছে এই ব্যাপারটা তথাকথিত এলিট শ্রেণির হস্তক্ষেপে মিথের প্রকৃত তাৎপর্য যেমন চাপা পড়ে যায়, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে তার ভুল ব্যাখ্যাও দেয়া হয়ে থাকে-

একটি মিথকে নিষ্প্রভ করার জন্য ভিন্ন মিথও তৈরি হয়ে যায়। ভূমিলগ্নে থাকা মানুষের অবস্থান থেকে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিথ, পুরাণকে নিয়ে এসেছেন তাঁর রচনায়-

> মিথ ও ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন বা পুনর্জন্মদান আধুনিক উপন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মননশীল শিল্পরীতি। বিষয়ের পশ্চাৎগমন যে সভ্যতা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সমকাল বিযুক্তির জটিল প্রক্রিয়া তা স্বতঃসিদ্ধি।

*খোয়াবনামায়* ইলিয়াস মিথকে অবলম্বন করেছেন, তা ভেঙ্গেছেন, আবার তা নির্মাণও করেছেন, শ্লোকগুলো তার রচনা কিন্তু তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেগুলোও তাঁর পাওয়া শ্লোক অদৃশ্যলোক থেকে যেন সেগুলো ভেসে এসেছিল আর সেগুলো তিনি লিখেছেন। উপন্যাসে কাৎলাহার বিলের উত্তর, সেখানে মুনসিকে এড়াতে বিলের দক্ষিণ ধার ঘেঁষে 'নিশুতি' রাতে বাড়ি ফেরে তমিজ-

> হাঁটতে হাঁটতে দেখে একটি ছায়া চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে... ছায়া মানুষটির ঘাড়ে তৌড়া জল। ছায়া চলছে উত্তরের দিকে। ভয়ে ও খানিকটা আশায় ভালো করে ঠাহর করলে তমিজ বোঝে, ওটা ছায়া নয়- তমিজেরে বাপ। বাপ তার ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলেছে উত্তরের দিকে। ...দাঁড়িয়ে একটু মনোযোগ দিলেই তমিজ তার বাপের সব কথা শুনতে পায়:
>
> সুরুজে বিদায় মাঙে শীতে সে কাতর।
> শীষের ভিতরে ধান কাঁপে থরথর।
> পশ্চিমে হইল রাঙা কালাপানি অচিন ডাঙা ফকিরে করিবে মেলা রাত্রি দুই প্রহর।
> ধানের আঁটি তোলে চাষা মাঝি ফেরো ঘর।
>
> বাপের ছায়ার অনুসঙ্গে তমিজও এই প্রথমবারের জন্য বাপের 'সূরা পড়ার' বিড়বিড় ধ্বনি শুনতে পায়, ব্যাকুল হয় শ্লোকের প্রতিটি অক্ষর বুঝতে। ব্যাকুল আশংকায় কুলসুম জিজ্ঞাসা করে, 'এত আতেত তুমি কোটে গেছিলা গো? তোমার বাপের ব্যারাম তোমায় ধরিছে?

এখানে তমিজের বাপকে ঘিরে বর্ণিত 'ছায়া চলছিল উত্তরের দিকে' অংশটি স্বপ্নময়তা, গ্রামীণ কুসংস্কার ও মানুষের অবচেতন জগতের মিলিত রূপ। প্রথমে তমিজ একটি ছায়া দেখে, পরে বুঝতে পারে সেটি তার বাপ, যিনি ঘুমের মধ্যে উত্তরের দিকে হাঁটছেন। উত্তরের দিক এখানে প্রতীকী- অজানা ভবিষ্যৎ, নির্বাসন বা মৃত্যুর পথে যাত্রা। বাপের শরীরে তৌড়া জল ও কালো ছায়া রাতের শীতলতা ও রহস্যময় আবহ তৈরি করে। এরপর তার মুখে শোনা যায় লোককবিতার মতো ছন্দ- 'সুরুজে বিদায় মাঙে... ধান কাঁপে থরথর... অচিন ডাঙা ফকিরে করিবে মেলা রাত্রি দুই প্রহর'- যেখানে প্রকৃতির পরিবর্তন, ফসলের অবস্থা ও অচেনা বিপদের পূর্বাভাস মিশে আছে। 'সূরা পড়া'-র বিড়বিড় শব্দ ধর্মীয়

বিশ্বাস ও বিপদ থেকে রক্ষার প্রার্থনার প্রতীক। কুলসুমের প্রশ্ন- 'তোমার বাপের ব্যারাম তোমায় ধরিছে?'- গ্রামীণ কুসংস্কারের প্রতিফলন, যেখানে মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতাকে প্রায়ই অলৌকিক শক্তির প্রভাব হিসেবে দেখা হয়। পুরো দৃশ্যটি বাস্তব ও অলৌকিকতার সীমানা ভেঙে এক গভীর প্রতীকী অর্থ তৈরি করেছে মানুষ কাদায় পা রেখে অজানা পথের দিকে এগিয়ে চলে, আর তার মন থাকে ভয় ও আশার টানাপোড়েনে। শ্লোকের অর্থের রেশ আর সময় উজিয়ে উজিয়ে সময়ের কাঁপন- সুফি আবেশের পরিসর খুঁজে নেয়। 'পশ্চিম', 'অচিন ডাঙা', 'ফকিরে করিবে মেলা' ও 'রাত্রি দুই প্রহর'- ভাবকল্পগুলো তমিজের খোয়াবের সঙ্গে একাকার হয়ে 'ধানের আঁটির' প্রতিকল্পে সুসংহত হয়। ব্যক্তির খোয়াবের সঙ্গে উৎপাদনশীলতার যোগ ঘটে। ক্ষণিকের জন্য হলেও তমিজ 'অচিন ডাঙ্গার' রূপকল্পে শিহরিত হয় আর তারপর, 'ঘুম নামে তার দুই চোখ ঝেঁপে'। সারাক্ষণ বাস্তবের বৃত্তে থেকেও ব্যক্তির বাস্তবকে অস্বীকার করার এই প্রয়াস যেন জীবনের ভাবকেন্দ্রে পৌঁছানোর আদি ও অনন্ত সাধনা, সেখানে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার যুগলবন্দি ঘটে। ইলিয়াসের এই রচনার মধ্য দিয়েই বাঙালি পাঠক আবিষ্কার করতে পারবে নিজেদের পায়ের তলার মাটি এবং দু'পাশের মানুষকে। মিথ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজবাস্তবতা তথা বিভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার পরস্পরাগত বিন্যাস। বর্ণনায় ইলিয়াসের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি দারুণভাবে লক্ষণীয়, তা হলো তাঁর গল্প- উপন্যাসে মৃত্যুর বিভীষিকাময় বর্ণনা, যেখানে ফ্যান্টাসি ও ইমেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। লেখক ও পাঠকের মাঝে মনে হয়, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এ দৃশ্য বর্ণনা করছে-

> বাবা গো! বলে বৈকুণ্ঠ চিৎকার করে উঠলে তার আর্তনাদ হারিয়ে যায় বাইরের প্রবল ঝড়ের ভেতরে। সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের আঁকাশি এড়িয়ে বাজ পড়লো বটপাকুড়ের জোড়া শরীরে, তার আওয়াজে ধরিত্রী কাঁপে। কিন্তু মুনসির পান্টিটাকে ছড় বানিয়ে চেরাগ আলি কি এই আওয়াজে নিজের জবান ফোটাতে পারে না? ... চোখ তার অকেজো হয়ে গেছে, বৈকুণ্ঠের নজর তাই চলে যায় একেবারে ভেতরের দিকে। সেই নজরে ধরা পড়ে, আধময়লা লালপেড়ে শাড়ি পড়া মাথা ভরা কালো চুলে লাল সিঁথির আলো জ্বালানো একটি মেয়েকে।

দৃশ্যটি বাস্তব ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণ, যেখানে প্রকৃতি, মানুষের অভিব্যক্তি ও অন্তর্মুখী দৃষ্টি একত্রিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠ 'বাবা গো!' বলে আর্তনাদ করলেও ঝড়ের তীব্রতায় তার শব্দ অদৃশ্য হয়ে যায়, যা মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও প্রকৃতির বিশাল শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব নির্দেশ করে। সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের আকাশি বাজ বটপাকুড়ের জোড়া শরীরে পড়ার বর্ণনা আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিপদের প্রতীক। বৈকুণ্ঠের দৃষ্টি শেষপর্যন্ত বাহ্যিক নয়, বরং ভেতরের দিকে চলে যায়, যেখানে সে অর্ধময়লা লালপেড়ে শাড়ি পরা, কালো চুলে লাল সিঁথি জ্বালানো মেয়েকে দেখেন যা গ্রামীণ জীবনের শক্তি, প্রীতি ও আশা প্রতিফলিত করে। শব্দ

ও আওয়াজ, ঝড় ও বাজের মিলনে মানুষের ভয়, অসহায়তা, সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক সংকল্প ফুটে ওঠে। লেখক বাস্তবতার চাদরে অলৌকিকতা মেখে, চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি, গ্রামের সামাজিক পরিবেশ এবং মানুষের মানসিকতার জটিলতা প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেছেন।

তমিজের বাপ, কুলসুম, তমিজ, ফুলজান, কেরামত, বৈকুণ্ঠ, শরাফত মন্ডল, আবদুল কাদের, আবদুল আজিজ, ইসমাইল মুসলিম অধ্যুষিত জনজীবনে পূর্ব-বাহিত প্রজন্মের উত্তরসূরি। উপন্যাসের শেষেও লেখক পাঠকের ভেতর সঞ্চারিত করে দেন পুরাণ বা মিথিক সম্ভাবনা। তমিজের বাপের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও তিনি পুনরাবৃত্তি ঘটান সেই ঘোরের জগৎ। শেষ পর্যন্ত তমিজের বাপও হয়ে ওঠেন মুনশি বায়তুল্লাহ শাহের মতোই একটি পুরাণ-

> এই মাঝির বংশের মানুষ বড়ো একরোখা। মাছ ধরা হলো এদের কুলপেশা, মাছের মতোই ঝাঁক ধরে থাকে। নদীর স্রোতের সঙ্গে বিবাদ করতেও শালাদের বাধে না। কেমন? না, স্রোতের উল্টাদিকে চলতেও এরা মাতে সমান তালে। উজানে তো উজানে, ভাটায় তো ভাটায়।... ফুলজান নিশ্চিত হয়, তার বেটি এখন গজার মাছের মাখা মাখা করে রাঁধা ঝোল সালুনের সুবাস পাচ্ছে। নইলে শুধু শুধু ভাতের গন্ধে এতোক্ষণ হা করে নিশ্বাস নেওয়ার ছুঁড়ি তো সে নয়।

এখানে মাঝির বংশের মানুষদের জীবনচিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'এই মাঝির বংশের মানুষ বড়ো একরোখা... উজানে তো উজানে, ভাটায় তো ভাটায়' অংশে তাদের দৃঢ়চেতা, ধৈর্যশীল এবং নদীর স্রোতের সঙ্গে খাপ খাওয়ার দক্ষতা ফুটে উঠেছে। মাছ ধরা তাদের কুলপেশা, যেখানে ঝাঁক ধরে থাকা ও বিপদের সঙ্গে লড়াই করার মানসিকতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ফুলজান সন্তানের সুস্থতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে গ্রামীণ পারিবারিক সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ করেছেন। গজার মাছের ঝোল ও সালুনের সুবাস গ্রামীণ খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির জীবন্ত চিত্র হিসেবে কাজ করে। এখানে নদী, মাছ, ঝোল, মাতৃস্নেহ ও সামাজিক জ্ঞান- সব মিলিয়ে গ্রামীণ জীবনের বাস্তববাদ, চরিত্রের মানসিকতা এবং মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর শিল্প প্রতিফলিত হয়েছে।

খোয়াবনামার সংলাপে ইলিয়াস সচেতনভাবেই লোক-প্রকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করেছেন। এ কারণে উপন্যাসের সংলাপ কেবল বিশেষ অঞ্চলের উপভাষার ভাষাগত বিশেষত্বকেই ধারণ করে না, একই সঙ্গে চিরন্তন লোকমানবের আবেগ, বিশ্বাস, অনুভূতি আর পরিণতিকেও লালন করে। খোয়াবনামা শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ স্বপ্ন-ব্যাখ্যান সংবলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এই উপন্যাসটি যেন এক বিশেষ অঞ্চলের লোকমানবের জীবন আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়ে সমগ্র মানবজাতির শাশ্বত স্বপ্নচারিতার ব্যাখ্যান পুস্তক। ইলিয়াস তাই

সচেতনভাবেই শব্দসূত্রে গ্রথিত করেন তমিজের বাপের মুনসির দেখা পাবার স্বপ্ন, মৎসজীবী তমিজের সফল কৃষক হবার স্বপ্ন কিংবা গৃহস্থ জীবনের স্বপ্ন, গন্ধভূক কুলসুমের ইলিউশন আর রিয়েলিটির সন্ধি পাতানোর স্বপ্ন, ফুলজানের স্নেহ আর দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন, কেরামতের কবিয়াল হবার স্বপ্ন, শরাফত মন্ডল কিংবা কালাম মাঝির সামন্ত আধিপত্যবিস্তারী ধনবাদী স্বপ্ন, পাকিস্তান নামক এক স্বপ্ন-পূরণের দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, আবদুল আজিজ, আবদুল কাদের, ইসমাইল, তহসেন প্রমুখের বিভক্ত দেশের পরিবর্তিত রাজনীতিকে ব্যবহার করে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় তেভাগা আন্দোলন সফল হবার স্বপ্ন। এছাড়াও নর-নারীর অবচেতন মনে লালিত জৈবিকতার দুর্নিবার প্রকাশ, স্বপ্নে বিমাতার সঙ্গে সপত্নী-পুত্রের দৈহিক মিলন ও তার ক্ষীণতম অনুশোচনাবোধ প্রভৃতি বিন্যস্ত হয়েছে এ উপন্যাসে। মানুষের এই স্বপ্নতৃষ্ণাকে নানা মাত্রায় ইলিয়াস ধারণ করেন সংলাপের মধ্য দিয়ে। তাই খোয়াবনামার সংলাপ প্রকাশিত বাচনের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাময় সংজ্ঞাপনকে অনুভবস্পর্শী করে তোলে-

> বিকালের দিকে আলোর ওপর বসে দুই হাতে কাদা ছানতে ছানতে বৃষ্টির গন্ধে, একটুখানি আভাস দিয়ে-যাওয়া রোদের গন্ধে এবং হাতের সঞ্চালনে তমিজের ঘুম ঘুম পায়, এই সময় জমিতে একেবারে উপুড় হয়ে শোবার তাগিদে তার সারা শরীর এলিয়ে এলিয়ে পড়ে।... শুধু স্তন নয়, তার গোটা গাতরে সাঁতার কাটার জন্য তার নিজের শরীরেই ভয়ানক কোলাহল শুরু হয়।

মাটি ও নারীর অভেদকল্পনার স্বপ্নাভিলাসী এই সংলাপ লোকজীবনের অকপট শরীরী অভিব্যক্তির প্রকাশক, লোক-প্রকরণের অন্তরালে শায়িত যৌনচেতনার চিহ্নায়ক। একইসঙ্গে, এখানে তমিজের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা, তার ভূ-স্বামী হয়ে ওঠার স্বপ্নকেই আভাসিত করে। এখানে তমিজের বিকেলের অভিজ্ঞতা শারীরিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক সংযোগের এক চিত্রময় প্রকাশ। এই অংশে গ্রামীণ পরিবেশের বাস্তববাদ, প্রকৃতির উপস্থিতি এবং চরিত্রের অন্তর্মুখী অনুভূতি মিলিত হয়েছে। কাদা এবং জমি শ্রম ও বাস্তবতার প্রতীক; বৃষ্টির গন্ধ এবং যাওয়া রোদের আভাস জীবনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, আশা ও বিপদের ইঙ্গিত বহন করে। হাতের সঞ্চালনে ঘুম ঘুম হওয়া এবং উপুড় হয়ে শোয়ার তাগিদ মানসিক শিথি লতা এবং স্বপ্নময়তার প্রকাশ। তমিজের শরীরে সাঁতার কাটার মতো 'ভয়ানক কোলাহল' তার জীবনের শক্তি, উত্তেজনা এবং প্রাণবন্ততা নির্দেশ করে। লেখক এখানে শারীরিক কাজ, প্রকৃতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের জটিলতা, শক্তি ও সংবেদনশীলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

খোয়াবনামার গান লোক-প্রকরণ প্রয়োগের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। এ সকল গানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তিন শ্রেণির গান পাওয়া যায়। প্রথমত, লোকমানবের খোয়াবের সমাধান সংবলিত শ্লোক। দ্বিতীয়ত, চেরাগ আলী ফকিরের গান এবং তৃতীয় শ্রেণিতে

কেরামতের গান। কেরামতের গানে একদিকে রয়েছে চাষি-নিগ্রহের গান, অপরদিকে রয়েছে পাকিস্তানের স্মৃতিমূলক গান, মোহাজের সম্পর্কিত গান ও স্থূল হাস্য-রসের গান। তবে গানগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে লোক-প্রকরণ। যেমন-

ছাওয়ালে গভেতে ধরি শুকায় পোয়াতি।

মাতার লোহুতে পুত্র বাড়ে দিবারাতি ।।

এখানে লোক-প্রকরণ সূত্র হিসেবে পাওয়া যায় 'পোয়াতি' শব্দবন্ধ। গর্ভধারণ, গর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা লোকসংস্কার প্রচলিত। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর রূপকধর্মিতা। এই দুই বাক্যের সমন্বয়ে মূলত ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভূমির উর্বরাশক্তি ও ফসল উৎপাদনের নিগূঢ় লোকতত্ত্ব। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে চেরাগ আলী বলে,

> মাটি এখন গভভো ধারণ করিছে। তার গভভো দুটা মাস, এক কাত্তিক আর আঘুন। পোয়াতি হলে মেয়ামানুষের শরীল শুকায়, এক প্যাট ছাড়া পোয়াতির ব্যামাক অক্ত তার খায়া ফালায় পেটের ছাওয়াল। পৌষ মাসে পোয়াতি বিয়ালে তার কোনো দুঙ্কু থাকে না।

মাটি ও পশুপালনের বর্ণনা গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা এবং কৃষি চক্রের সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রতিফলন। এ অংশে মাটির আর্দ্রতা, কাত্তিক ও আঘুন মাসের গুরুত্ব এবং পশুর গর্ভধারণের চক্র তুলে ধরা হয়েছে। পোয়াতির সময়ে মেয়েমানুষের শরীর শুকানো, ব্যামাক অক্তের প্রভাব এবং পৌষ মাসে গর্ভধারণের সুবিধা- সবই গ্রামীণ জীবনের বাস্তবিক চক্রকে নির্দেশ করে। এখানে লেখক শুধুমাত্র কৃষি ও পশুপালনের তথ্যই উপস্থাপন করেননি, বরং মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত জীবনধারা, কৃষকের দায়িত্ব এবং ফসল ও খাদ্য উৎপাদনের নিয়মাবলিও ফুটিয়ে তুলেছেন। মাটি, ঋতু ও পশুর সংযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের চলমান চক্র, সচেতনতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার শিল্প স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিল্পী ইলিয়াস গণমানুষের ভাষ্যকার। তিনি আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ- প্রবচন, বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, শ্লোক, সন্দেহ প্রভৃতি নানা প্রবণতা বিবেচনায় আনেন। তবে অনেক সমালোচকের মতে এখানে ব্যবহৃত ভাষা কথা ও প্রবাদ, ছড়া ও শ্লোক আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি রুচি অনুসারে অশ্লীল ও স্থূল। কিন্তু জীবন্ত চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই ভাষা নতুন মাত্রা দেয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করেছেন-

ছড়া ও শ্লোক:

ক. শ্বশুর গেছে শ্বশুরবাড়ি

শ্বশুরবাড়ির পানসুপাড়ি।

দাঁত নাই তাই খাইতে নারি

মুখোত মারো হামান দিস্তার বাড়ি। [খোয়াবনামা, ১৭৫]

খ. বৌ হলো ডালভাতের থালি রসের হাঁড়ি জোয়ান শালি। [খোয়াবনামা, ১৭৬]

গ. চোখ দুটি তার নয়ন তারা

রসিক নাগর পাগল পারা। [খোয়াবনামা, ২০৬]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামাজিক আচরণ জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। 'শ্বশুর গেছে শ্বশুরবাড়ি... মুখোত মারো হামান দিস্তার বাড়ি'- অংশে গ্রামের শ্বশুরবাড়ি, পানসুপাড়ি এবং বৃদ্ধ বা অক্ষম মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক রীতিনীতি প্রদর্শিত হয়েছে। 'বৌ হলো ডালভাতের থালি রসের হাঁড়ি জোয়ান শালি' লাইনটি গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে নারীর সক্রিয়তা, যৌবন এবং পরিবারের সংহতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'চোখ দুটি তার নয়ন তারা, রসিক নাগর পাগল পারা'- অংশে চরিত্রের সৌন্দর্য, প্রাণবন্ততা এবং গ্রামের রসিক সংস্কৃতি চিত্রিত হয়েছে। এই তিনটি লাইন মিলিয়ে ইলিয়াস গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, সামাজিক আচরণ, নারী-পুরুষের দৈনন্দিন ভূমিকা এবং গ্রামের রসিক সংস্কৃতির সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরেছেন।

কিছু অশ্লীল সংলাপ আছে-

ক. কলকাতার মানুষ মরিচ্ছে কুত্তাবিলায়ের লাকান। [খোয়াবনামা, পৃ. ২৪৯]

খ. মাঝিদের চৌদ্দপুরুষের বিল দখল করে ভিন্ন জাতের মানুষ আর মাঝিরা বস্যা বস্যা খালি বাল ছেঁড়ে... [খোয়াবনামা, ১০৮]

গ. এ্যাসেম্বলিতে জমিদার উচ্ছেদের বিল তো ওঠানোই হচ্ছে কয়দিন পর জমিদারই পাছার কাপড় তুল্যা দৌড় মারবি, আর নায়েব তো চাকর। [খোয়াবনামা, ২৫২]

ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাসে শহুরে, গ্রামীণ এবং রাজনৈতিক জীবনের সংঘাত ও শক্তি বিশদভাবে ফুটে উঠেছে। ক- অংশে শহুরে মানুষের আধিপত্য ও গ্রামীণ সম্পদের উপর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। খ- অংশে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদের শোষণ, গ্রামের মানুষের অধিকারহানি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ফুটে উঠেছে। গ- অংশে প্রশাসন, আইন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের ওপর ক্ষমতার দমন চিত্রিত হয়েছে। এই তিনটি অংশ মিলিয়ে লেখক গ্রামীণ

জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা, মানুষের অধিকার ও শক্তির সংঘাত এবং সমাজে বৈষম্য ও শোষণের সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরেছেন।

প্রবাদ ও প্রবচন:

ক. সাবধানের মার নাই। (পৃ. ৬১)

খ. পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। (পৃ. ৭৪)

গ. জমি তার লাঙল যার । (পৃ. ১০৮)

এখানে গ্রামীণ জীবন, শ্রম এবং নৈতিক মূল্যবোধের সূক্ষ্ম চিত্র ফুটে উঠেছে। 'সাবধানের মার নাই' অংশে সতর্কতার গুরুত্ব এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার শিক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, যা কৃষিজীবন ও দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য। 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে' লাইনটি গ্রামীণ জীবনের ধৈর্য, সংরক্ষণ এবং পূর্বপ্রচেষ্টার মূল্য নির্দেশ করে, যেখানে আগের শ্রমের ফল দীর্ঘমেয়াদি উপকার দেয়। 'জমি তার লাঙল যার' অংশে শ্রমের মূল্য ও অধিকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা দেখায় যে কৃষক বা শ্রমিকের পরিশ্রমই তার সম্পদ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এখানে ইলিয়াস গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা, শ্রমের ন্যায্যতা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কথাসাহিত্যে বিষয় অনুযায়ী ভাষা ও প্রকরণের প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপন্যাস দুদিকেরই বহুমাত্রিক নিরীক্ষণ। এমন প্রসঙ্গকে মূর্ত করতে গিয়েই তাঁর ভাষা হয়েছে অলঙ্কারবহুল, জটিল এবং চাতুর্যপূর্ণ। তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপে অসংলগ্ন বাস্তবতার মেসেজ প্রেরণ করেন কুশলী বর্ণনায়-

ক. কয়েকদিনের জন্যে বাড়ি আসায় সকালে হাগার পর ছোচা ছাড়া বাম হাতের কাজকাম বন্ধ, সেই নিষ্ক্রিয়তার শোধ সে তোলে জিভ আর টাকরার অবিরাম ব্যবহার করে। [খোয়াবনামা, ৪৭]

খ. টেলিগ্রাম পেয়ে আবদুল আজিজ এসে পৌঁছেছে শিশির ডাক্তার পৌঁছুবার একটু পর; সুতরাং তার টমটমের গতি উদযাপন ও চাকা অনুসরণ উৎসাহী মানুষ বেশি পাওয়া যায়নি। [খোয়াবনামা, ৮৫]

উভয় লাইনেই দৈনন্দিন ছোটো ঘটনা, চরিত্রের স্বভাব, সমাজের অব্যক্ত প্রতিক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবকে জটিল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। এটি পাঠককে কেবল ঘটনার নয়, চরিত্রের অভ্যাস ও সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণ দেখায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য চেতনাপ্রবাহধর্মী। কোনো শ্রেণির অস্তিত্ব রক্ষানুগ রাষ্ট্রীয় চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্য দর্শন, নীতিচেতনা কল্যাণবোধ এবং নানাবিধ

ধ্যান-ধারণার যোগফলই হলো সে শ্রেণির একক চেতনাপ্রবাহ। খোয়াবনামায় ইলিয়াসের চেতনাপ্রবাহের কুশলী প্রয়োগ ঘটেছে-

তমিজ তো ওই এলাকা থেকেই ঘুরে এসেছে এই মাস তিনেক। তিন মাস, কিন্তু মনে হয় কালকের ঘটনা। আধিয়ারদের তাড়া খেয়ে কাটা ধান ফেলে সে দৌড় দিলো। দৌড়, দৌড়, দৌড়।... অন্তত আবদুল আজিজের মুখ বারবার কাঁটাওয়ালা মোটা একটা বাবলাডাল লাগাবার জন্যে তমিজ নানাভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু জুত করতে পারে না। তমিজ আরো ডাল ভাঙতে লাগলো।

প্রান্তিক মানুষ সামাজিক ও প্রাকৃতিক শত প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করতে না পেরে জীবন্মৃতের মতো বেঁচে থাকে সত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যে মানুষ, তারা যে প্রতিবাদ করতে জানে, রুখে দাঁড়াতে জানে, জানে প্রতিশোধ নিতে। মানুষের সেই চিরন্তন জাগরিত শক্তিকেই চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। অন্ত্যজ মানুষেরা যত বেশি নতজানু হতে থাকে সামজিক শোষণ ততই বৃদ্ধি পায়। এভাবে একসময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সেই বঞ্চিত মানুষই হয়ে ওঠে অধিকার সচেতন, রোগা-পটকা, হাড় জিরজিরে চিকিৎসা বঞ্চিত শরীরও হয়ে ওঠে দ্রোহী। মানুষ কীভাবে তার ন্যায্য হিস্যাটুকু আদায় করে ছাড়ে তারই রুদ্ররূপ এখানে চিত্রিত হতে দেখি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পূর্ণ বয়সে বাংলা কথাসাহিত্যে পদার্পণ করে দু'টি উপন্যাস ও কিছু গল্প ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর খোয়াবনামা উপন্যাসের রচনারীতি, ভাষাপ্রপঞ্চ স্বতন্ত্র। ইলিয়াসের খোয়াবনামা শেষ পর্যন্ত জীবনের বিশালত্বের আখ্যান, জীবনের ঘোরলাগা কলরব ভাষার মধ্য দিয়ে নিরন্তর সৃজনশীলতার আখ্যান।

**গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল**

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাসের ভাষা নির্মিত হয়েছে এক বহুমাত্রিক শিল্পরীতির ভিতর দিয়ে, যেখানে আঞ্চলিক ভাষা, লোককথা, ছড়া-শ্লোক, প্রবাদ-প্রবচন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অভিন্ন ধারায় সংমিশ্রিত হয়েছে। উপন্যাসে ব্যবহৃত মিথ ও সুফিবাদের উপাদান ভাষার গভীরতা ও বর্ণনার গঠনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। ইলিয়াসের ভাষা চর্চা কেবল শৈলীর দিক থেকে নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিফলন হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ এক সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কালের দহনকেও রূপায়িত করেছে।

## উপসংহার

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সীমাবদ্ধতাগুলোকে পেরিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমগ্রতার এমন একটি স্থানে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন যেখানে সাহিত্যের প্রকাশ আর তার ভাষা লাভ করে সর্বজনীনতার একটি অবয়ব। খোয়াবনামা উপন্যাসটি এমনভাবেই বাংলাভাষার সাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অবাধ প্রান্তরে। অস্বস্তিকর অস্থির সময়ের দেওয়ালের ভেতর থেকে ইলিয়াস বিশাল ও অনন্ত সময়কে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। *খোয়াবনামা*'য় বয়ানভঙ্গি ও আখ্যানগঠনের মৌলিক দ্যুতিময় বিচ্ছুরণ ঘটেছে। এই উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি অনেকটা স্বপ্নের মতোই, ছুঁয়েও যেন ছোঁয়া যায় না মূল ঘটনাস্রোতকে। খোয়াবনামাতে কালের দহন ভাষার প্রতিটি স্তরে উপস্থিত। আঞ্চলিক শব্দ, প্রবাদ, সংলাপ, রাজনৈতিক ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা- সব মিলিয়ে ভাষা হয়ে ওঠে সময়ের উত্তাপের এক শৈল্পিক দলিল। ইলিয়াস দেখিয়েছেন কীভাবে ভাষা ইতিহাস, সমাজ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সাহিত্যকে বহুমাত্রিক ও নান্দনিক করে তোলে। তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখায় যে, চিলেকোঠার সেপাই-এর তুলনায় খোয়াবনামাতে ভাষা সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাপ এবং সময়ের দহন প্রকাশে আরও কার্যকর ও প্রভাবশালী। এই গবেষণা বাংলা সাহিত্যে ভাষার মাধ্যমে সময় ও ইতিহাস প্রকাশের সম্ভাবনা বোঝাতে সহায়ক।

## তথ্য-নির্দেশ


আহমেদ, ওয়াকিল (সম্পা.)। (১৯৮৯)। *সমকালীন বাংলা সাহিত্য* । এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ : ঢাকা।

ইলিয়াস,আখতারুজ্জামান। (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা* । মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

চৌধুরী, দীপক ও কবির, নুরুল (সম্পা.)। (১৯৯২)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার।* কথা প্রকাশ: বগুড়া।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। (১৯৮০)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।* দ্বেজ পাবলিকেশনস: কলকাতা।

সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্র (সম্পা.)। (১৪০৫)। *সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক বিশেষ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা* (৫০৮/এ)। বিভাব: কলকাতা।

Anisuzzaman, A. (2008). *Akhtaruzzaman Elias: The language of social reality. Bangla Literary Review.* 3 (1). 23-38.

Rahman, M. (2015). Regional language and symbolism in Akhtaruzzaman

Elias's Khwabnama. *Journal of Bengali Literary Criticism.* 10 (2). 55-65.

Sadeq, A. (2012). Language and social consciousness in Akhtaruzzaman Elias's novels. *Journal of Bangla Literature Studies.* 7 (1). 30-42.

# বাংলাদেশের লুসেই* ও পাংখুয়া ভাষা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন**

**Abstract:** This article presents a comparative analysis of the endangered Lushei and Pangkhua languages of Bangladesh. Among the languages of the Kuki–Chin sub-branch (Lushei–Pangkhua–Bawm–Khiang–Khumi–Rengmitca) of the Sino-Tibetan language family spoken in the Chittagong Hill Tracts, these two languages have been brought into special focus. The Linguistic Survey of Bangladesh 2018 recognized Pangkhua as a distinct language. From a linguistic perspective, the two languages not only share many similarities but also exhibit several differences. For this study, we have selected 207 words from linguist Morris Swadesh's word list to assess lexical similarity and identified their equivalents in both Lushei and Pangkhua. Lushei has been used as the base language for comparison. We have calculated the lexical similarity percentage by measuring character-level differences and word lengths using the Levenshtein distance algorithm. Based on the distance values from the 207 word pairs, we have applied the Blair model to categorize the words into levels of similarity. A

* লুসাই ও লুসেই শব্দদ্বয়ের মধ্যে উচ্চারণগত প্রায় সাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত পার্থক্য আছে। যারা লুসাই হিলে বসবাস করে তারা বৃহদার্থে লুসাই। লুসাই হিলের কুকি-চিনভাষি অসংখ্য জাতিসত্তার মধ্যে লুসেই একটি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের লুসেই গোত্রের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কর্নেল শেক্সপিয়ার ও বি. বি. গোস্বামী বলেছেন– *In this monograph Lushai is used in this wider sense, Lushei being used only for the clan of that name* (Shakespear, J. *The Lushei Kuki Clans*, London, 1912, p. 14). *It may be noted that the British used the word Lushai to designate most of the people living in the Lushai Hills; the word Lushei ment an ethnic group only.* (B. B. Goswami, *The Mizo unrest: a study of politicisation of culture*, Jaipur: Aalekh, 1979, p. 22).

** মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীন, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, হাটহাজারী সরকারি কলেজ, ইমেইল: utaslim85@gmail.com

statistical analysis has been conducted to classify the words into exact matches, minor differences, and complete mismatches, according to Blair's thresholds. We have further visualized the quantitative comparison using pie charts and bar graphs to show lexical distribution across the categories. The findings have revealed that, although the two languages are closely related, there are regular phonological differences that distinguish them. The primary objective of this research is to support language documentation, preservation, and revitalization efforts through a comparative analysis of these endangered languages.

**মূলশব্দ (Keyword):** লুসেই-পাংখুয়া (Lushei–Pangkhua), কুকি-চিন (Kuki–Chin), লেক্সিকাল সিমিলারিটি (Lexical Similarity), ব্লেয়ার মডেল (Blair Model), সোয়াদেশ তালিকা (Swadesh List), লেভেনেস্টেইন ডিস্ট্যান্স (Levenshtein Distance)

## ভূমিকা

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতি ও ভাষা-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। মঙ্গোলয়েড মানবধারার এই নৃগোষ্ঠীদের জীবনেতিহাস ও সংস্কৃতি অনন্য। পার্বত্য এই ভূমে চীনা-তিব্বতি ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বারোটি নৃগোষ্ঠীর (সরকারিভাবে স্বীকৃত) বারোটি স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে। এখানে চীনা-তিব্বতি ভাষার অন্তর্গত কুকি-চিন ভাষাভাষী ছয়টি নৃগোষ্ঠীর (লুসেই-পাংখুয়া-বম-খুমি-খিয়াং-রেংমিটচা) যুগ যুগ ধরে বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-ভাগে চীনা-তিব্বতি ভাষার এই কুকি-চিন শাখাকে কেন্দ্রীয় বা মধ্য কুকি-চিন ও দক্ষিণ কুকি-চিনে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে লুসেই-পাংখুয়া-বম নৃগোষ্ঠীর ভাষাকে মধ্য কুকি-চিন আর খুমি-খিয়াং-রেংমিটচাকে দক্ষিণ কুকি-চিন উপশাখা হিসাবে ধরা হয়। একটি সরলিকৃত রেখাচিত্রে কুকি-চিনভাষী নৃগোষ্ঠীদের নিম্নরূপে দেখানো যায়:

কুকি-চিন ভাষাগুচ্ছের 'কুকি' শব্দটি নিয়ে মতানৈক্য আছে। বলা হয়ে থাকে একসময় জঙ্গলাকীর্ণ অরণ্যভূমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা নৃগোষ্ঠীর লোকজন একে অপরকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কু.... কু আওয়াজ করতো (মনিরুজ্জামান, ২০২০: ৪০)। সমতলবাসীগণ এই কু.... কু ডাক-ভাষা ব্যবহারকারী নৃগোষ্ঠীদের 'কুকি' বলে সম্বোধন করতো। দেখা যায়, ১৯০১-এর জনশুমারিতেও অরণ্যবাসীদের জন্য 'কুকি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও সুনীতিকুমার 'কুকি' শব্দটি ষোড়শ শতাব্দীতে পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন। নৃগোষ্ঠী গবেষক সাহু (২০১১: ১৫৪) 'কুকি'কে একটি Vague term বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ

তারা নিজেদের বেলায় এই শব্দ 'কু......কি.....' কখনো উচ্চারণ করে না। এদিকে সাত্তার (১৯৬৬: ১৩৪) 'আরণ্য জনপদে' কুকিদেরকে একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে দেখিয়েছেন।

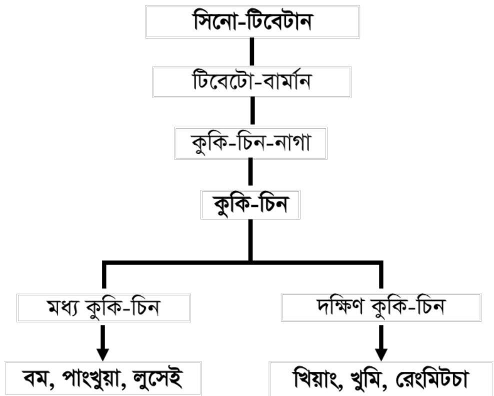


রেখাচিত্র ১.১: Kim-Roy-Sangma (2011: 7) অবলম্বনে কুকি-চিন ভাষায় লুসেই ও পাংখুয়ার অবস্থান

কুকি-চিন সম্পর্কে বলা হয়েছে–The Nagas, Kukis and Manipuris descended from a common ancestor, who had three sons who became the progenitors of those tribes (Hadson 1911: 9). এখানে দেখা যাচ্ছে– কুকি-চিনভাষীগণ আসামের নাগা ও মনিপুরিদের অন্তর্ভুক্ত জনজাতি। কুকি-চিনভাষীগণ ভারতের মণিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরামের পূর্বে দিকে, মিয়ানমারের উত্তর আরাকান এবং চিনহিলস্ অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এখান থেকে তারা কালক্রমে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও বসতি স্থাপন করতে থাকে।

মনিরুজ্জামান (২০২০) এর মতে– কুকি-চিন এই ভাষাগুলো আন্তঃসম্পৃক্ত ভাষা এবং এর বিস্তার মিয়ানমার ও চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত। গ্রিয়ারসন ও টিসি হাডসন, তিব্বতি গোষ্ঠীর বর্মি শাখাভুক্ত (মিয়ানমার তথা পেগু-তৌগু ও শ্যামদেশ উৎসজাত) উপভাষাগুলোকে 'কুকি-চিন' নামকরণ করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে হাডসন কুকিকে লুসেই এর সিস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে কর্নেল শেক্সপিয়র কুকিকে লুসেই-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর শাখা-ভাষা বলে মত দিয়েছিলেন (পৃ. ৪৫)।

কুকি-চিন ভাষাগুচ্ছের মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য ভাষা– লুসেই ও পাংখুয়া।

লুসেইগণ বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রান্তিক। এরা প্রধানত রাঙামাটির

বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক উপত্যকায় বাস করে। এছাড়া বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতেও স্বল্পসংখ্যক লুসেইকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে দেখা যায়। লুসেই নৃগোষ্ঠীর আদিভূমি ভারতের মিজোরাম। তাছাড়া মিয়ানমারের চীনপ্রদেশও বেশকিছু লুসেইর আবাস আছে। দেখা যাচ্ছে লুসেইগণ মোটামুটি তিনটি দেশে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করছে।

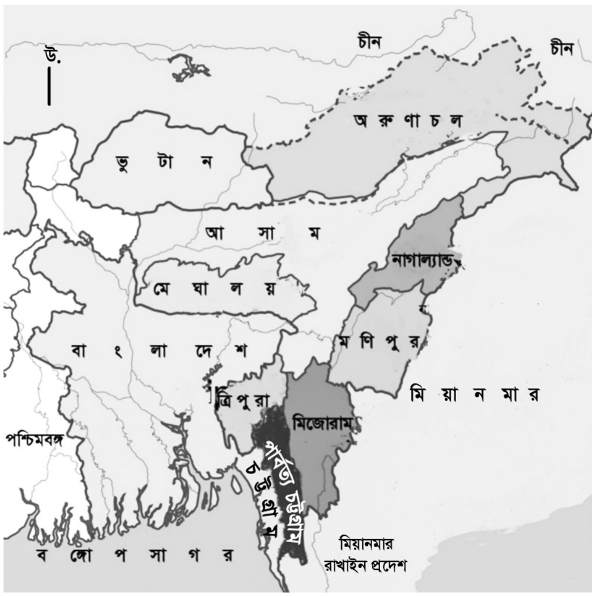


মানচিত্র ১.১: বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের সেভেন সিস্টার্স ও মিয়ানমারের অবস্থান

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনশ্রুতি আছে, লুসেইগণ একসময় নরমুণ্ড শিকার করতো। লুসেই ('লু' মানে মাথা আর 'সেই' মানে শিকারি) নামের ভেতরেই এদের মানুষের মাথা শিকারের উল্লেখ আছে (ত্রিপুরা, ২০১২: ১৩৭)। আবার কেউ কেউ বলেছেন লুসেই মানে 'মাথা লম্বা' (Shakespear, 1912: 14)। কারণ লুসেই পুরুষগণও একসময় মাথায় লম্বা চুল রাখতো। এবং এই চুল দিয়ে মাথায় ঝুঁটি বাঁধতো বলে এদের মাথা অনেকটা লম্বাটে দেখাতো।

লুসেই নৃগোষ্ঠীদের বিশ্বাস 'লুসাই হিল' ছিল তাদের আদিনিবাস। 'মিজোরাম' ওই লুসাই হিলের বর্তমান নাম। বর্তমান লুসেইগণ ওই মিজোদেরই উত্তরসূরি (লুসাই, ২০১৫: ৫২১)। অন্যদিকে Hutchinson তাঁর The Chittagong Hill Tracts (1909) গ্রন্থে লুসেইদেরকে Lhoosai or Kookies বলে অভিহিত করেছেন (চাকমা, ২০০৯: ১২৯)। লুসেই একটি স্বতন্ত্র ভাষা। যেটি মিজোরামে 'মিজো ভাষা' বলে পরিচিত। তাই বাংলাদেশে লুসেই ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ মিজো (লুসেই) বলেও অভিহিত করেছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের ভাষাজরিপ (২০১৮),

এথনোলগ [আইএসও কোড: lus 639-3; ভাষাপরিবার: চীনা-তিব্বতি (কুকি-চিন); ভাষাঞ্চল: দক্ষিণ-এশিয়া; ভাষা-এলাকা: বাংলাদেশ ও ভারত; লিপি: নেই] ও গ্লুটোলগে (গ্লুটোকোড: lush1249) লুসেই একটি স্বতন্ত্র এবং গুরুতরভাবে বিপন্নের (Critically Endangered) তালিকায় থাকা একটি ভাষা।

মানচিত্র ১.২: পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্রে (লুসেই ও পাংখুয়া) আমার ভাষাতাত্ত্বিক মাঠসমীক্ষা

লুসেইদেরকে চাকমাগণ 'কুগি', মারমাগণ 'লাংগী' এবং 'ত্রিপুরাগণ 'শিকাম' বলে সম্বোধন করে। যদিও বর্তমানে ওই জাতিত্রয় লুসেইদের সম্পর্কে তাদের পূর্বতন মনোভাব অনেকটা পরিবর্তন করেছে। সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা (২০১২: ১৩৭) লুসেইদের সাতাশটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পাংখুয়া কোনো স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী নয়; বরং এরা লুসেই দলভুক্ত একটি নৃগোষ্ঠী। প্রকৃতপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাংখুয়া একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী। বাংলাদেশের ভাষাজরিপ (২০১৮), এথনোলগ [আইএসও কোড: pkh 639-3; ভাষাপরিবার: চীনা-তিব্বতি (কুকি-চিন); ভাষাঞ্চল: দক্ষিণ-এশিয়া; ভাষা-এলাকা: বাংলাদেশ ও ভারত; লিপি: নেই] ও গ্লুটোলগে (গ্লুটোকোড: pan1249) পাংখুয়া একটি স্বতন্ত্র এবং গুরুতরভাবে বিপন্ন (Critically Endangered) ভাষা হিসাবে চিহ্নিত। লুসেইগণ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০ এবং ১৭১ নং মৌজায় বাস করে। জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩৮০ জন লুসেই বাস করে। যা বাংলাদেশে মোট নৃগোষ্ঠীর ০.০২ শতাংশ।

'পাংখুয়া' শব্দটির গোড়াপত্তন 'মিজো' ভাষা থেকে। এর ব্যুৎপত্তিতে দেখা যায়, 'উমপাং' আর 'খুয়া'। মিজো ভাষায় 'উমপাং' মানে– শিমুল ফুল আর 'খুয়া' মানে– গ্রাম। অর্থাৎ 'পাংখুয়া' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়-শিমুল ফুলের গ্রাম। পাংখুয়ারা ওই শিমুল ফুলের গ্রাম থেকে এসেছে বলে মনে করে (চাকমা, ২০০৯: ১৩১)। গ্রিয়ারসন, লুইন ও হাচিনসনের মতে, পাং বা শিমুল (ফুল) টোটেমে বিশ্বাসী লুসেই পাহাড়-আশ্রয়ী নৃগোষ্ঠীগণই পাংখুয়া নামে চিহ্নিত। গ্রিয়ারসন, কুকি-চিন ও তিব্বতি-বর্মি ভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পাংখুয়া ভাষাকে মধ্য কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

পাংখুয়া গবেষক শাওন ফরিদ দেখিয়েছেন- মিজোরামের 'লুংলাই' জেলার 'পাংজল' নামে একটি গ্রামে শতবর্ষী অসংখ্য শিমুল গাছ আছে বলে মিজোরামফেরত এক যুবকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন। কেউ পাংখুয়ারা কোত্থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করলে তারা নির্দ্বিধায় বলে- শিমুল ফুলের গ্রাম থেকে (ফরিদ, ২০০৬: ২৭)। তাছাড়া বর্তমান প্রবন্ধের লেখক পাংখুয়াদের আদিভূমি বসন্ত পাংখুয়া পাড়ায় ভাষাতাত্ত্বিক মাঠসমীক্ষায় (ডিসেম্বর ১৫, ২০১৮) গিয়ে জেনেছেন পাংখুয়ারা মিজোরাম থেকে এসেছে (জীবন পাংখুয়া এক সাক্ষাৎকারে গবেষককে বলেছেন)। পাংখুয়ারাও বিশ্বাস করে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-দিকস্থ মিজোরামের 'লুসাই' পাহাড় থেকে এখানে এসেছে। বর্তমানে পাংখুয়ারা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সদর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল উপজেলায় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলায় বাস করছে।

দৈহিক নৃতত্ত্বে দেখা যায়– পাংখুয়াদের অরোমশ শরীর, পীতাভ বাদামি গায়ের রং, মাঝারি হতে চ্যাপ্টা নাক, ছোটো চোখ এবং চোখের পাতায় ভাঁজ, বিরল শ্মশ্রু,

লম্বাটে মুখমণ্ডল, শক্ত-মোটা পায়ের গোড়ালি, থোড় এবং মাংসপেশি, গোল মাথা এবং খাড়া কালো চুল, গাট্টাগোট্টা পেশল ও সুঠাম বেটে দেহাবয়বের অধিকারী। দৈহিক নৃতত্ত্বে লুসেই নৃগোষ্ঠীগণও পাংখুয়াদের মতো। এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখুয়াদের পঁচিশটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে (ফরিদ, ২০২০: ৩৫)। নৃতাত্ত্বিক Hutchinson পাংখুয়ারা ভাংজাং নামক একটি গোত্রের হাত ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন বলে মন্তব্য করেছেন (1906: 160)। জনশুমারি ২০২২-এ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাংখুয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৮৫৭ জন; যা মোট নৃগোষ্ঠীর ০.১১ শতাংশ।

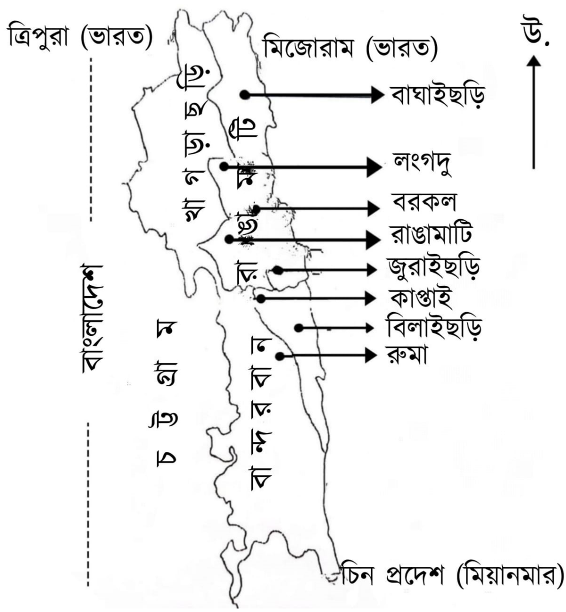


মানচিত্র ১.৩: পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্রে পাংখুয়া বসতি (মানচিত্র স্কেলানুযায়ী নয়)

লুসেই প্রভাবিত ভাষা হিসাবে ধরা হয়– বম ও পাংখুয়া ভাষাকে। তবে এই ভাষা দুটো লুসেই এর সমজ (Cognate) না অন্তঃজ উপভাষা (developed witin) আপাত মিলের কারণে এরূপ বলা হলেও এগুলোর সাদৃশ্যের পেছনে একাধিক কারণও থাকতে পারে (মনিরুজ্জামান, ২০২০: ৪৬)। কারণ হিসেবে এখানে সম্মিলিত কৃষিসংস্কৃতির (জুমচাষ) প্রভাবকে মুখ্য ধরা হয়। বলা যায় জুমসংস্কৃতি এতদঞ্চলের ভাষাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে নৃগোষ্ঠীরা নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল প্রতিবেশের কারণে অভিবাসন-প্রত্যাবাসন প্রত্যাশী হয়ে প্রতিনিয়ত স্থানান্তর এবং দেশান্তরিত হচ্ছে। ফলে নতুন পরিবেশে সেতুভাষা (Lingua Franca), ভাষাসংযোগ ও সমবিন্দুক পরিবর্তন (Convergence)-এর প্রভাব ঘটেছে।

## সাহিত্য পর্যালোচনা

কুকি-চিন ভাষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা লুসেই ও পাংখুয়ার ওপর পৃথকভাবে কিছু গবেষণা হলেও এই ভাষা দুটোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ বিশেষত সোয়াদেশ শব্দতালিকার ভিত্তিতে হয়নি বললেই চলে। আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী মরিস সোয়াদেশ সর্বজনীন ও দৈনন্দিন ব্যবহার হয় এরূপ ২০৭টি মৌলিক শব্দ প্রস্তাব করেন। এটা Swadesh Wordlist নামে খ্যাত। এই শব্দতালিকা বিপন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপস্থাপন করতে সক্ষম। বিভিন্ন ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য ও ভিন্নতা বুঝতে এটি সহায়তা করে।

এখানে তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং এই দুটো ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য ও নিয়মিত অমিলগুলো দেখিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের গবেষণাকর্ম পর্যালোচনার জন্য নেওয়া হয়েছে।

Akter, Zahid (2016)-*The Endangerment and Documentation of the Pangkhua Language in Bangladesh* এই গবেষণাকর্মে গবেষক পাংখুয়া ভাষার বিপন্নতা ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেছেন।

Rao, G. U. (2017)- *Critical Evidence for the Genetic Relationship of Mongolic and Dravidian Languages* গবেষণাপ্রবন্ধে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় ভাষাগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। এখানে গবেষক এই দুই ভাষাপরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক Cognates (সমরূপ শব্দ) এবং কিছু বিশেষ ধরনের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

Lewis, Simons & Fennig (2015)-*Ethnologue: Languages of Asia* এখানে লুসেই আর পাংখুয়া ভাষাকে কুকি-চিন ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাংখুয়া ভাষার বিপন্নতার লক্ষণগুলো এখানে দেখানো হলেও লুসেই ভাষার স্বতন্ত্রতা এবং এই দুই ভাষার কোনো তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হয়নি।

Wieling et al. (2007), Nerbonne & Heeringa (1997) তাদের গবেষণাকর্মে লেভেনস্টেইন দূরত্ব ব্যবহার করে বিভিন্ন উপভাষা বা ভাষার সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন।

## গবেষণার প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপদাপন্ন কুকি-চিন ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত, শব্দতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা তেমন হয়নি। এক্ষেত্রে ভাষার বিপন্নতা প্রতিরোধে ভাষার সংরক্ষণ

ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণে সোয়াদেশ শব্দতালিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এটি ভাষার মধ্যে অভিন্নতা ও ভাষার মধ্যকার ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে সহায়ক। ফলে এই গবেষণাকর্ম পার্বত্য অঞ্চলের কুকি-চিন ভাষাগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই গবেষণার ফলাফল ভাষাসংরক্ষণ, সংস্কৃতি রক্ষা ও নৃভাষা অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নেও প্রয়োগযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত কুকি-চিন ভাষাগুচ্ছের এই ভাষাদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য, পার্থক্য ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনে অবদান রাখা। সোয়াদেশ শব্দতালিকার ভিত্তিতে লুসেই ও পাংখুয়ার মৌলিক শব্দভান্ডারকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধ্বনিগত, রূপগত এবং শব্দার্থিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা। ভাষাদ্বয়ের ভাষাগত আত্মীয়তা ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভাষানীতি ও গবেষণার ভিত্তি তৈরি করাই এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**গবেষণা-প্রশ্ন**

১. সোয়াদেশ শব্দতালিকার ভিত্তিতে এই ভাষা দুটোর মধ্যে কী ধরনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আছে?

২. ভাষা দুটোর পারস্পরিক সম্পর্ক বা দূরত্ব কতটুকু?

৩. কুকি-চিনভুক্ত ভাষাগুলোর সংরক্ষণে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?

**গবেষণা-পদ্ধতি**

এই গবেষণাকর্মটি একটি বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা। এখানে বাংলাদেশে বিপন্ন ভাষার তালিকাভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি-চিন লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। লেক্সিকাল ডেটাবেজের জন্য শব্দগত উপাদানগুলো নেওয়া হয়েছে সোয়াদেশ তালিকা (Swadesh list) থেকে। ইন্টারভিউ এবং রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য শব্দগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। Blair (1990) প্রস্তাবিত Lexical Similarity Computation Model ব্যবহার করে সূত্রের মাধ্যমে সাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে শব্দের ধ্বনিগত গঠন, অর্থগত পার্থক্য, রূপগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের পাশাপাশি শতকরা হিসাব (Lexical

Similarity Percentage) দেখানো হয়েছে। দুই ভাষার তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপনাকে টেবিল, চার্ট ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে এই গবেষণায় উপরিউক্ত দুই ভাষার শব্দগত দূরত্ব নির্ণয়ে Levenshtein distance প্রয়োগ করা হয়েছে (Heeringa, 2004; Nerbonne & Heeringa, 1997)। এখানে শব্দজোড়ের রূপগত দূরত্বের ভিত্তিতে শতকরা সাদৃশ্য নির্ণয় করে তা আবার শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

*তথ্য-সংগ্রহ*

এখানে শব্দগত সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্য সোয়াদেশ শব্দতালিকার (Swadesh list) ২০৭টি ইংরেজি মৌলিক শব্দের লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার সমশব্দ (Cognet) নেওয়া হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী মরিস সোয়াদেশ (Morris Swadesh) শব্দতালিকা অনুসরণে রাঙামাটি সদরের ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ১২৮নং বসন্ত মৌজার বসন্ত পাংখুয়া পাড়ার স্থানীয় বক্তাদের কাছ থেকে শব্দসংগ্রহ করা হয়েছে। পাড়াটি প্রায় তিনশ বছরের পুরোনো; এটি কাপ্তাই হ্রদ থেকে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দুর্গম এলাকা। এখানে পঁয়ত্রিশটি পরিবারে প্রায় আড়াইশ পাংখুয়ার বসতি। রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার ১২০নং তিনকুনিয়া মৌজার পাংখুয়া নৃগোষ্ঠীদের সবচেয়ে বড়ো পাড়া মালুম্য পাংখুয়া পাড়ার বাসিন্দা রামথাংয়া পাংখুয়া (৫৮) [ভাষাতাত্ত্বিক মাঠসমীক্ষা ৬ই মে ২০২২], জুরাছড়ি উপজেলার লালতে পাংখুয়া (২৭) এবং বাঘাইছড়ি উপজেলার রামা লুসাই (৩৯) [ভাষাতাত্ত্বিক মাঠসমীক্ষা ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩] এই গবেষণাকর্মের মূল তথ্যদাতা (Informant)। রামা, বাঘাইছড়ি নিবাসী হলেও বিবাহসূত্রে থাকেন জুরাছড়িতে। তিনি সম্পর্কসূত্রে লালতের বড়োদিদির জামাই। রামার আত্মীয়-স্বজন ভারতের মিজোরামেও থাকে। সেই সুবাদে রামার প্রতি বছরান্তে অন্তত একবার হলেও মিজোরামে যাতায়াত করতে হয়। রামথাংয়া, লালতে ও রামা থেকে সংগৃহীত তথ্য আমরা অন্য গ্রামে বাস করা বক্তাদের মাধ্যমে আবার যাচাই-বাছাই করেছি। আমরা এখানে লুসেই ভাষাকে ভিত্তি ভাষা ধরে পাংখুয়ার সঙ্গে ধ্বনিতাত্ত্বিক স্তরে তুলনা করেছি। কারণ বৃহত্তর কুকি-চিন ভাষাপরিবারে মিজো (লুসেই) ভাষীর সংখ্যা পাংখুয়ার চাইতে অনেক বেশি। তাছাড়া পাংখুয়ায় লুসেই ভাষার প্রভাব লক্ষ করা যায় (লুসাই, ২০১৫: ৫৩১)।

*তথ্য-বিশ্লেষণ*

আমরা এখানে আমাদের সংগৃহীত শব্দভান্ডারভিত্তিক ডেটাবেজের ওপর লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখিয়েছি। Blair (1990: 31-33)-এর প্রক্রিয়া অনুসারে, এখানে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার শব্দতালিকা তুলনা করে প্রতিটি শব্দজোড়ার ধ্বনিগত (phonetic) মিল কতটুকু তা নির্ধারণ করা হয়েছে। Blair, Lexical Similarity

নির্ধারণে Character-level distance-কে প্রাধান্য দিয়ে দুই ভিন্ন (ভাষাবংশ এক) ভাষার শব্দজোড়কে তিনটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

ক্যাটেগরি ১: Exact or Strong Matches or near-exact matches বা হুবহু মিল বা উচ্চমাত্রায় মিল। এদের Levenshtein distance (LD) বা লেভেনেস্টেইন দূরত্ব ০, ১, ২ হয়।

ক্যাটেগরি ২: Partial similarity/ related but not close enough বা সীমিত সাদৃশ্য। এগুলোর মধ্যে কিছু মিল থাকার পরেও তা ক্যাটেগরি ১-এ পড়ে না; এদের লেভেনেস্টেইন দূরত্ব ৩-এর বেশি হয়।

ক্যাটেগরি ৩: No similarity বা সম্পূর্ণ অমিল।

Blair-এর উপরিউক্ত তিনটি ক্যাটেগরিকে ভিত্তিমূল ধরে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণে গবেষক একটি স্কেল প্রস্তাব করেছেন। স্কেলটি সংখ্যার তারতম্য ভেদে দুই ভাষার শব্দগত গঠন-বিশ্লেষণ করতে পারে। যেমন–

- ০, ১, ২ হলো Exact or Strong Matches বা খুবই মিল
- ৩, ৪, ৫ হলো Partial similarity বা সীমিত মিল
- >৫ No similarity বা সম্পূর্ণ অমিল

প্রতিটি শব্দজোড়ের মধ্যে Levenshtein distance Algorithm (Levenshtein 1966: 707-710) প্রয়োগ করে শব্দদ্বয়ের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমত Levenshtein Distance দেখা হয়েছে। Levenshtein distance একটি গাণিতিক পদ্ধতি, যেখানে একটি শব্দের অক্ষর পরিবর্তন (substitution) অপসারণ (deletion) ও সংযোজন (insertion) করে অন্য শব্দটির মতো করা হয়। দ্বিতীয়ত LD-এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে– Lexical Distance ($L_XD$)। অর্থাৎ $L_XD$ = (লেভেনেস্টেইন দূরত্ব/ বড় শব্দটির দৈর্ঘ্য)। এখানে Lexical Similarity (LS%) নির্ণয় করা হয়েছে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায়–

LS% ={১ - (লেভেনস্টেইন দূরত্ব-LD/ বড়ো শব্দটির দৈর্ঘ্য-LW)} × ১০০

এখানে Levenshtein Distance-এ দেখানো হয়েছে শব্দজোড়ের পরিবর্তনের পরিমাণ আর Lexical Distance এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে পরিবর্তনটা তুলনামূলকভাবে কত বড়ো; অর্থাৎ পরিবর্তনের অনুপাত। নিম্নে হুবহু মিল, সীমিত মিল ও সম্পূর্ণ অমিল এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক সাধারণীকরণ উদাহরণসমেত দেখানো হলো–

*হুবহু মিল*

আমরা লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার অনেক শব্দজোড় (Word Pairs) পেয়েছি যেগুলো এই দুই ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে হুবহু মেলে। অর্থাৎ ভাষা দুটোর ধ্বনিগত বা গঠনগত কোনো পার্থক্য থাকে না। নিচে আমাদের শব্দতালিকাভিত্তিক ডেটাবেজ থেকে এরকম কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো (মূল শব্দতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত):

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | tree | গাছ | *t̪ʰiŋ* | *t̪ʰiŋ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| ২. | fruit | ফল | *t̪ʰe͡i̯ʔ* | *t̪ʰe͡i̯ʔ* | 0 | 8 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| ৩. | dog | কুকুর | *u͡i̯ʔ* | *u͡i̯ʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| ৪. | to think | চিন্তা করা | *ŋa͡i̯t̪oʷaʔ* | *ŋa͡i̯t̪oʷaʔ* | 0 | 11 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| ৫. | yellow | হলুদ | *eŋ* | *eŋ* | 0 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 |
| ৬. | to split | ভাগ করা | *ʃem* | *ʃem* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 |

সারণি ১.১: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় হুবহু মিল শব্দ

*সীমিত মিল*

এই ধরনের শব্দজোড়ে ধ্বনি (Phonetic) বা ধ্বনিগুচ্ছ এবং আংশিক রূপগত (Morphological) বা উপসর্গ/প্রত্যয়ে মিল থাকে। তবে শব্দজোড়গুলো পুরোপুরি একই নয়। আমাদের শব্দতালিকাভিত্তিক ডেটাবেজে আমরা এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ লক্ষ্য করেছি। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো (মূল শব্দতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত):

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | I (1SG) | আমি | *kəi̯-máʔ* | *kəʲiʔ* | 5 | 8 | 0.625 | 37.5% | 0.375 | 0.5 |
| ২. | long | লম্বা | *ʃe͡i̯ʔ* | *aʃe͡i̯ʔ* | 1 | 7 | 0.142 | 85.8% | 0.858 | 1 |
| ৩. | child | শিশু | *na͡o̯paŋ* | *napaŋ* | 3 | 8 | 0.375 | 62.5% | 0.625 | 0.5 |
| ৪. | to swim | সাঁতরানো | *t̪ui̯ hle͡u̯ʔ* | *t̪oi̯li͡u̯ʔ* | 4 | 14 | 0.285 | 71.5% | 0.715 | 0.5 |
| ৫. | to turn | ঘোরাঘুরি করা | *in-her* | *an her* | 2 | 6 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 1 |
| ৬. | star | তারা | *art͡ʃʰoʃiʔ* | *arɔʃiʔ* | 5 | 10 | 0.50 | 50% | 0.50 | 0.5 |
| ৭. | because | কারণ | *at͡ʃʰan* | *aʃat͡ʃu* | 5 | 7 | 0.714 | 28.6% | 0.286 | 0.5 |
| ৮. | with | সাথে/সঙ্গে | *roʷal in* | *roʷalni* | 2 | 8 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| ৯. | seed | বিচি/বীজ | *t͡ʃiʔ* | *a-t͡ʃĩ* | 3 | 8 | 0.375 | 62.5% | 0.625 | 0.5 |
| ১০. | bark (of a tree) | বাঁকল | *t̪ʰiŋkɔr* | *t̪ʰiŋ per* | 3 | 9 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 0.5 |

সারণি ১.২: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় সীমিত পরিবর্তিত শব্দ

*সম্পূর্ণ অমিল*

এই ধরনের শব্দজোড়ে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের কোনো মিল থাকে না, শব্দমূল আলাদা, উপসর্গ/প্রত্যয় মিলে না এবং এদের ধ্বনিগত দূরত্ব অনেক বেশি। আমাদের ডেটাবেজ থেকে এরকম কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো (মূল শব্দতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত):

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | some | কিছু | *eŋ emzat̪* | *t̪m kaʔ* | 8 | 9 | 0.888 | 11.11% | 0.111 | 0 |
| ২. | where | কোথায় | *kʰi-á-ŋeʔ* | *t̪iʲakaŋ* | 7 | 9 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| ৩. | thick | মোটা | *t͡ʃʰat͡ʃ* | *at̪au̯͡ʔ* | 7 | 9 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| ৪. | women | মহিলা | *mei̯͡t͡ʃʰiʲaʔ* | *nonau̯͡ʔ* | 11 | 13 | 0.846 | 11.4% | 0.114 | 0 |
| ৫. | wife | বউ | *nopui̯͡ʔ* | *dɔŋ* | 7 | 7 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 |
| ৬. | foot | পায়ের তালু | *kept̪ʰaʔ* | *pei̯͡ manzaʔ* | 9 | 12 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| ৭. | to hear | শোনা | *ŋai̯͡phlaʔ* | *ranzai̯͡ʔ* | 8 | 9 | 0.888 | 11.2% | 0.112 | 0 |
| ৮. | dust | ধুলা | *bʱai̯͡bʱot̪* | *ʃau̯͡ʲ* | 8 | 11 | 0.727 | 27.27% | 0.272 | 0 |
| ৯. | if | যদি | *lou̯͡ʔ* | *iʲaŋŋin* | 7 | 7 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 |

সারণি ১.৩: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় সম্পূর্ণ অমিল শব্দ

## ধ্বনিতাত্ত্বিক সাধারণীকরণ

*স্বরের নিম্নায়ন*

এখানে ভাষা দুটোর মৌলিক স্বরের ধ্বনিগত পরিবর্তন (Phonetic/Phonological shift) হয়। ভাষায় একটি স্বরধ্বনি পরিবর্তন করে উচ্চ (high) অবস্থা থেকে মধ্য (mid) বা নিম্ন (low) স্বরে রূপান্তরিত হয়। আমরা এই দুই ভাষার তথ্য বিশ্লেষণে এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করেছি। নিচে এ ধরনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো (মূল শব্দতালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত):

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া |
|---|---|---|---|---|
| ১. | skin | চামড়া | *bʱun* | *bʱon* |
| ২. | hand | হাত | *kut̪* | *kot̪* |
| ৩. | bone | হাড় | *ruʔ* | *roʔ* |
| ৪. | head | মাথা | *luʔ* | *loʔ* |
| ৫. | hear | চুল | *ʃom* | *ʃam* |

সারণি ১.৪: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় স্বরের নিম্নায়ন

*দ্বিস্বরধ্বনি*

এটি একটি একক স্বরধ্বনি (monophthong)-কে ধীরে ধীরে দ্বিস্বরধ্বনিতে (Diphthong) রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়া দুটো ভাষার মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলে। লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় এ ধরনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া |
|---|---|---|---|---|
| ১. | to laugh | হাসা | *nu͡i̯ʔ* | *no͡i̯ʔ miʔ* |
| ২. | to swim | সাঁতরানো | *t̪u͡i̯ʔ hle͡u̯ʔ* | *t̪o͡i̯li͡u̯ʔ* |
| ৩. | to throw | ফেলে দেওয়া | *pa͡i̯t͡ʃ* | *pe͡i̯-iʔ* |
| ৪. | to sew | সেলাই করা | *tʰo͡i̯ʔ* | *ʃa͡i̯ d̪iŋ* |
| ৫. | to think | ভাবা | *ŋo͡i̯t̪oʷaʔ* | *ŋa͡i̯t̪oʷaʔ* |

সারণি ১.৫: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় ডিফথংগাইজেশন

*স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন*

এখানে শব্দের প্রথমে বা মধ্যে বা শেষে বাড়তি একটি ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে। আমাদের তথ্য বিশ্লেষণে আমরা এ বিষয়টি লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় লক্ষ করেছি। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া |
|---|---|---|---|---|
| ১. | many | অনেক | *t̪am* | *at̪am* |
| ২. | one | এক | *pakʰat̪* | *pakkʰo͡a̯t̪* |
| ৩. | two | দুই | *paniʔ* | *pinikaʔ* |
| ৪. | five | পাঁচ | *paŋaʔ* | *panzaʔ* |

সারণি ১.৬: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন

**রূপতাত্ত্বিক সাধারণীকরণ**

পাংখুয়া ভাষায় prefix হিসেবে *a-, ma-, ra-, an* যুক্ত হয়। অন্যদিকে লুসেই ভাষায় prefix এ *sa-* যুক্ত হয়। আমাদের শব্দতালিকাভিত্তিক ডেটাবেজে আমরা এ ধরনের অসংখ্য উদারহরণ লক্ষ করেছি। নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া |
|---|---|---|---|---|
| ১. | liver | ফুসফুস | *t̪ʰin* | *mat̪ʰin* |
| ২. | knee | হাঁটু | *kʰup* | *rakʰup* |
| ৩. | eye | চোখ | *mit̪* | *amit̪* |

| ক্রম. | SWL | বাংলা | লুসেই | পাংখুয়া |
|---|---|---|---|---|
| ৪. | tongue | জিহ্বা | *lei̯ʔ* | *malei̯ʔ* |
| ৫. | belly | পেট | *d̠ul* | *mad̠il* |
| ৬. | heart | হৃদয় | *loŋ* | *maloŋ* |

সারণি ১.৭: লুসেই ও পাংখুয়া ভাষায় রূপতাত্ত্বিক সাধারণীকরণ

## পরিমাণগত বিশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের পাশাপাশি আমাদের ডেটাবেজকে (পরিমাণগত) মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি। আমাদের ডেটাবেজকে সাদৃশ্যের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি লুসেই ভাষার সঙ্গে পাংখুয়া ভাষার কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে Lexical Similarity Analysis Table (Blair, 1990 Model)-এর প্রক্রিয়া অনুসারে ভাষাদ্বয়ের সাদৃশ্য ম্যাট্রিক্স তৈরিতে হুবহু মিল (Exact Matches) ১ পয়েন্ট, আংশিক মিল (Partial Matches) ০.৫ পয়েন্ট ও সম্পূর্ণ অমিল (No Matches) ০ পয়েন্ট ধরা হয়েছে। অন্যদিকে Levenshtein distance (LD)-এর মাধ্যমে প্রতিটি শব্দজোড়ের Longest word Length (LW), Lxical Similarity (LS) ও শব্দগত দূরত্বের শতকরা হার বের করা হয়েছে।

*উপাত্ত বিশ্লেষণ*

Swadesh list অনুযায়ী দুই ভাষার ২০৭টি শব্দজোড়ের মধ্যে ৬৩টি হুবহু মিল বা Exact/Strong matches (LD: 0, 1, 2); ৯২টি সীমিত মিল (উচ্চ ও নিম্ন) বা Partial matches (LD: 3, 4, 5); ও ৫২টি সম্পূর্ণ অমিল শব্দসংখ্যা বা No matches (LD: >5) রয়েছে।

এই ২০৭টি শব্দজোড়ের শতকরা হার হিসাব:

- হুবহু মিল বা Exact/Strong matches: (৬৩ ÷ ২০৭) × ১০০ ≈ ৩০%
- সীমিত মিল বা Partial matches: (৯৩ ÷ ২০৭) × ১০০ ≈ ৪৫%
- সম্পূর্ণ অমিল বা No matches: (৫১ ÷ ২০৭) × ১০০ ≈ ২৫%

লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার শাব্দিক সাদৃশ্যকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়–

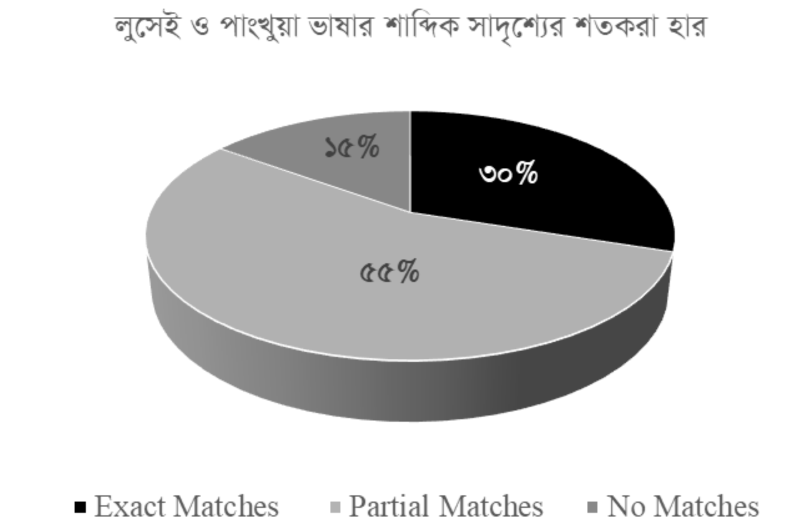


গ্রাফ ১.১: পাই চার্টে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার সাদৃশ্যের শতকরা হার

এবার আমরা আমাদের ডেটাবেজের ২০৭টি শব্দজোড়ে Levenshtein distance সংখ্যা দেখিয়ে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার আকারগত দূরত্বের একটা গ্রহণযোগ্য ফলাফল দেখবো–

| লেভেনেস্টেইন দূরত্ব | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শব্দজোড় সংখ্যা | ২৮ | ৭ | ২৮ | ২৬ | ২৭ | ৩৫ | ২১ | ১৬ | ৮ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ১ |
| মোট শব্দজোড় | ২০৭ | | | | | | | | | | | | | |

সারণি ১.৮: লেভেনেস্টেইন দূরত্ব ও  শব্দজোড় সংখ্যা

শব্দগত সাদৃশ্য সূচক (Lexical Similarity Index) নির্ণয়ের জন্য ভার্টিকাল অ্যাক্সিসে শব্দজোড়ের সংখ্যা আর হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসে লেভেনেস্টেইন দূরত্ব ও শতকরা হার নিম্নে বার কলামে উপস্থাপন করা হলো। Levenshtein distance-এর সাহায্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়া উপ-অনুচ্ছেদ ৩.২ (তথ্যবিশ্লেষণ)-এ দেখানো হয়েছে।

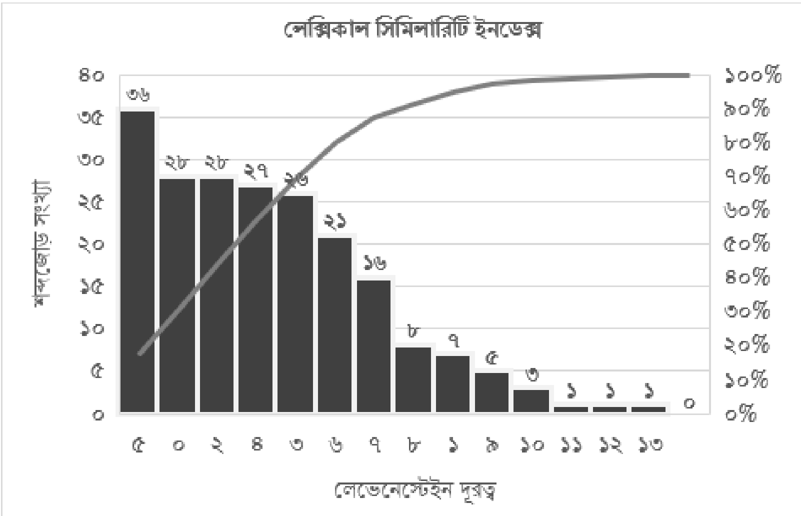


গ্রাফ ১.২: বার কলামে লেভেনস্টেইন দূরত্ব ও শব্দজোড় সংখ্যার শতকরা হার

**প্রত্যাশিত ফলাফল**

আমাদের ডাটাবেজকে আমরা এখানে প্রথমত তিনটি গ্রুপকে চিহ্নিত করেছি। এর মধ্যে প্রথম গ্রুপটি হুবহু মিল বা Exact matches এতে প্রায় ৩০% শব্দ অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় গ্রুপটি হলো– সীমিত মিল বা Partial matches এটাতে ৫৫% শব্দ অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় গ্রুপটি– সম্পূর্ণ অমিল বা No matches; এর মধ্যে ১৫% শব্দ অন্তর্ভুক্ত। এখানে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার সাদৃশ্যগত স্কোর দাঁড়ায়:

(৬৩×১) + (৯৩×০.৫) + (৫১×০) = ৬৩ + ৪৬.৫ + ০ = ১০৯.৫

সুতরাং লুসেই ভাষার সঙ্গে পাংখুয়া ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য (LS%) =(১০৯.৫ ÷ ২০৭)×১০০ = ৫৩%

নিম্নে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার শাব্দিক সাদৃশ্য (ব্লেয়ার ও লেভেনেস্টেইন) দেখানো হলো:

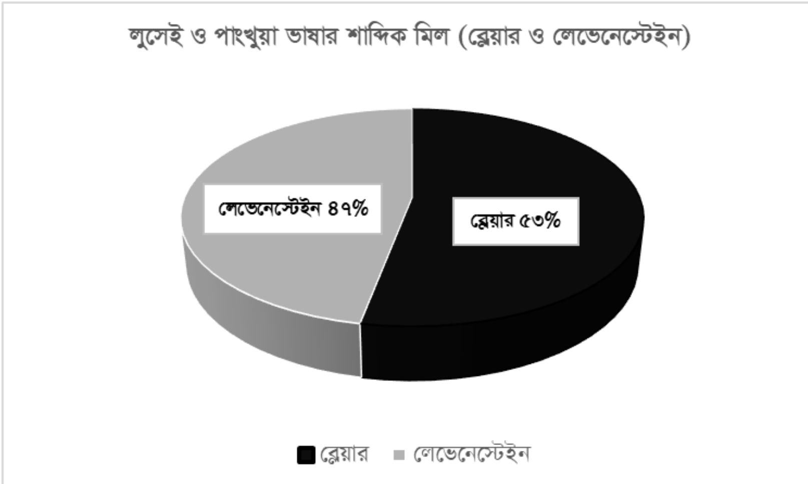


গ্রাফ ১.৩: পাই চার্টে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার শাব্দিক মিল

অন্যদিকে Levenshtein মডেল অনুযায়ী আমাদের ডেটাবেজের ২০৭টি শব্দজোড়ের প্রতিটির similarity percentage যোগ করে গড় সাদৃশ্য নির্ণয় (Overall Similarity Calculation) করা যায়। এখানে লেভেনেস্টেইন দূরত্ব অনুযায়ী শব্দজোড়ের সাদৃশ্যের শতকরা মোট যোগফল (পরিশিষ্ট: LS%) ও মোট শব্দজোড় সংখ্যার গড় ফলাফল দাঁড়ায়⟶ ৯৮৩২ ÷ ২০৭ = ৪৭% Lexical Similarity Index (LSI); অর্থাৎ লুসেই ভাষার সঙ্গে পাংখুয়া ভাষার ৪৭% আকারগত সাদৃশ্য আছে।

এখানে আমরা দুই ভাষার শব্দগত সাদৃশ্যের পাশাপাশি ডেটাবেজ থেকে কিছু বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পার্থক্যও দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ ধরনের উদাহরণে দেখা যায়– পাংখুয়া ভাষায় স্বর-নিম্নগমন (Vowel Lowering), লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন এবং দুই ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনি (Diphthongization) ইত্যাদি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে রূপতাত্ত্বিক (Morphological) বিশ্লেষণে এই দুই ভাষায় উপসর্গ (Prefix) ও প্রত্যয় (Sufix) যুক্ত হতেও দেখা যায়। তবে এই দুই ভাষায় এপোকোপেশন অর্থাৎ শব্দের শেষে ধ্বনির অপসারণ এবং স্বরের দীর্ঘায়ন (Vowel Lengthening) প্রক্রিয়া তেমন দেখা যায় না।

**আলোচনা**

আমরা Blair (1990/1992) ও Swadesh (1955) এর মডেল অনুযায়ী ভাষাগত সাদৃশ্য নির্ণয়ে লুসেই ও পাংখুয়া ভাষা স্বতন্ত্র কিনা তা সহজে যাচাই করতে পারি। নিম্নে

একই ভাষা, সম্পর্কিত ভাষা ও স্বতন্ত্র ভাষার রেঞ্জ সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো:

১. Blair (1990/1992)-এর মতে,

- ≥ ৮০% শব্দগত সাদৃশ্য ⟶ একই ভাষা বা উপভাষা
- ৬০%–৭৯% ⟶ গভীর সম্পর্কিত ভাষা
- < ৬০% ⟶ স্বতন্ত্র ভাষা

২. Swadesh (1955): ১০০ শব্দের তালিকা নিয়ে গ্লোটোক্রোনোলজি প্রয়োগ করে বলেন–

- ≥ ৮১% ⟶ একই ভাষা বা পারস্পরিক বোধযোগ্য ভাষা
- ৩৬%–৮০% ⟶ পারস্পরিক সম্পর্কিত কিন্তু স্বতন্ত্র
- < ৩৬% ⟶ অসম্পর্কিত

দুই ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য নির্ণয়ে Blair (1992)-এর মডেল এবং Levenshtein distance অ্যালগরিদম অর্থাৎ দুটো ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। Blair মডেল exact, partial, no matches ব্যবহৃত শব্দকে যেখানে আংশিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বিবেচনায় রাখেনি; সেখানে Levenshtein মডেল সেই শব্দগুলোকে আংশিক সাদৃশ্যের গণনায় এনেছেন। তাছাড়া Levenshtein distance শব্দের গঠনে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো পরিমাপ করে বলে এখানে সাদৃশ্যের হার কিছুটা বেশি এসেছে। Levenshtein Distance আরও সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, যা পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাকে বেগবান করতে পারে। মডেল দুটির প্রয়োগ থেকে আমরা লক্ষ করি লুসেই ও পাংখুয়া পারস্পরিক সম্পর্কিত কিন্তু স্বতন্ত্র (Swadesh) এবং Blair এর মতে শব্দগত সাদৃশ্য সম্পন্ন ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ভাষা।

SIL International এর একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক Frank Blair. Survey on a Shoestring গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বড়ো আকারের ভাষাজরিপ সহজে করা যায়। তাঁর Lexical Similarity Model ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য নির্ণয়ে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এই মডেল দিয়ে ছোটো ভাষাগুলোর তুলনামূলক গবেষণা করা সহজ। তাছাড়া ডায়ালেক্ট সার্ভে, ভাষাগত মানচিত্রেও এই মডেল ফলদায়ক। মূলত দুটি ভাষায় একই অর্থের শব্দতালিকা তৈরি এবং শব্দজোড়ার ধ্বনিগত সাদৃশ্য অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস দেখাতে এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়।

## সীমাবদ্ধতা

লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার লিখিত উপকরণ একেবারেই সীমিত। এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলো নির্দিষ্ট এলাকার স্বল্পসংখ্যক ভাষিক থেকে সংগৃহীত। ফলে এই দুই ভাষার ব্যবহারিক বৈচিত্র্য এখানে নাও থাকতে পারে। এখানে প্রায় শব্দের একাধিক সমার্থক বা প্রতিশব্দ থাকলেও ভাষাভাষীদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেভেনেস্টেইন মডেলের মাধ্যমে শব্দের ধ্বনিগত আকার দেখানো গেলেও টোন ও সূক্ষ্ম ধ্বনিগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় আনা হয়নি। ভবিষ্যতে আরও ভাষিক এলাকায় ভাষাতাত্ত্বিক মাঠসমীক্ষা চালিয়ে বৃহত্তর কর্পাস ও টোন-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এই গবেষণার ফলাফলকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

## উপসংহার

এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশে গুরুতরভাবে বিপন্নের তালিকায় থাকা লুসেই ও পাংখুয়া ভাষার তুলনামূলক এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস। আমাদের ডেটাবেজের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে আমরা ভাষা দুটোর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করেছি। Blair (1992) মডেলের ভিত্তিতে এখানে দুই ভাষার মধ্যে ৫৩% শব্দগত সাদৃশ্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে Levenshtein distance নামক গাণিতিক পদ্ধতিতে শব্দজোড়ের মধ্যে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সম্পাদনার সংখ্যা গণনা করে গড় সাদৃশ্যের হার পাওয়া গেছে ৪৭%। পরিপূরক পদ্ধতিতে দেখা যায় ব্লেয়ার মডেলে এই মান বেশি। কারণ এ পদ্ধতিতে ভাষার ধ্বনি ও গঠনগত বিশ্লেষণ দেখানো হয়। আর লেভেনস্টেইন দেখায় অ্যালগরিদমিক দূরত্ব। দুই ভাষার এই শতকরা হারকে উপরিউক্ত Blair ও Swadesh রেঞ্জ মতে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে ধরা যায়। এই সামান্য পার্থক্য মূলত ব্যবহৃত পদ্ধতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়েছে। এই গবেষণা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায়, বিশেষ করে রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও প্রোটো-ভাষার পুনর্গঠনে কাজে আসতে পারে।

## তথ্য-নির্দেশ

চাকমা, সুগত। (২০০৯)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল। (২০১২)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

ফরিদ, শাওন। (২০০৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য*। হিল ট্র্যাক্টস্ ফাউন্ডেশন: চট্টগ্রাম।

চাকমা, সুগত। (২০০৯)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

ত্রিপুরা, সুরেন্দ্রলাল। (২০১২)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

ফরিদ, শাওন। (২০০৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের পাংখোয়া ভাষা ও সাহিত্য*। হিল ট্র্যাক্টস্ ফাউন্ডেশন: চট্টগ্রাম।

ফরিদ, শাওন। (২০২০)। *পাংখোয়া: জুমচাষ, শিকার ও ফাঁদ*। আপন আলো: চট্টগ্রাম।

মনিরুজ্জামান। (২০২০)। *পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

লুসাই, জনি। (২০১৫)। লুসাই। মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা* (৫২১-৫৪৩)। উৎস প্রকাশন: ঢাকা।

সাত্তার, আবদুস। (২০১২)। *আরণ্য জনপদে*। নওরোজ সাহিত্য সম্ভার: ঢাকা।

সাহু, জিরকুং। (২০১১)। বম পাংখোয়া ও লুসাই ভাষা-সাহিত্য। শুভ্র জ্যোতি চাকমা (সম্পা.), *পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য*। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

সুরেন্দ্রলাল, ত্রিপুরা। (২০১২)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙামাটি।

Akter, Zahid. (2016). The Endangerment and Documentation of the Pangkhua Language in Bangladesh. Working Paper No: 10. East West University Center for Research and Training, East West University: Dhaka

Blair, F. (1990). *Survey on a Shoestring: A Manual for Small-Scale Language Surveys.* Summer Institute of Linguistics.

Blair, F. (1992). *Survey on a shoestring: A manual for small-scale language surveys.* Dallas: SIL International.

Chauhan, S. & Tiwari, P. M. (2021). Hindi and Magahi: A Comparative and Quantitative Analysis. *Jadavpur Journal of Languages and Linguistics.* Vol 4. IC3C PROCEEDING (22-33).

Hadson, T.C. (1911). *The Naga Tribes of Monipur.* London

Hutchinson, R. H. S. (1906). *An Account of the Chittagong Hill Tracts.* The Bengal Secretarial Book Depot: Calcutta.

Kim, Roy & Sangma. (2011). The Kuki-Chin Communities of Bangladesh: A

Sociolinguistic Survey (Abstract of Paper), *Electronic Survey Report* (2005-2011).

Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. *Soviet Physics Doklady,* 10 (8), 707–710.

Lewis, Simons & Fennig. (2015). Ethnologue: *Languages of Asia* (Ethnologue: Languages of the World). 18th edition. Dallas: SIL International, Global Publishing.

Nerbonne, J., & Heeringa, W. (1997). Measuring dialect distance phonetically. In G. Sankoff, S. Laberge & P. H. Nelde (Eds.), *Language variation and change* (85-122). John Benjamins.

Rama, T. (2016). Multi-lingual computational models for lexical similarity prediction. In Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (1040-1046).

Rao, G. U. (2017). *Critical Evidence for the Genetic Relationship of Mongolic and Dravidian Languages.* New Delhi: Lakshi Publishers.

Shakespear, J. (1912). *The Lushei Kuki Clans,* London.

Swadesh, M. (1955). *Towards Greater Accuracy in Lexicostatistic Dating. International Journal of American Linguistics.*

**Abbreviations**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SWL | Swadesh Word List | LS% | Lexical Similarity% |
| LD | Levenshtein Distance | $L_VS$ | Levenshtein Score |
| LW | Longest Word | $B_LS$ | Blair Score |
| $L_XD$ | Lexical Distance | LSI | Lexical Similarity Index |

## পরিশিষ্ট

## Swadesh Word List: Lushei & Pangkhua

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I (1SG) | আমি | *kə̯i-máʔ* | *kəʲiʔ* | 5 | 8 | 0.625 | 37.5% | 0.375 | 0.5 |
| | you (2SG) | তুমি, আপনি | *naŋ-máʔ* | *naŋ* | 4 | 7 | 0.571 | 43% | 0.43 | 0.5 |
| | he, she(3SG) | সে | *a-máʔ* | *iniʔ* | 4 | 5 | 0.8 | 20% | 0.20 | 0.5 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | we (1PL) | আমরা | *kə̯imániʔ* | *kəʲi-niʔ* | 4 | 9 | 0.444 | 55.6% | 0.556 | 0.5 |
| | you (2PL) | তোমরা, আপনারা | *naŋma-niʔ* | *naŋniʔ* | 3 | 9 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 0.5 |
| | they (3PL) | তারা | *an-niʔ* | *ini-hɔ͡u̯ʔ* | 7 | 9 | 0.777 | 22.2% | 0.222 | 0 |
| | this | এই | *he͡i̯ʔ* | *ɔhiʔ* | 4 | 6 | 0.666 | 33.4% | 0.334 | 0.5 |
| | that | ওটা | *sɔ-sɔʔ* | *ɔhaʔ* | 4 | 6 | 0.666 | 33.4% | 0.334 | 0.5 |
| | here | এখানে | *he-t̪aʔ* | *ɔhi nan* | 6 | 7 | 0.857 | 14.2% | 0.142 | 0 |
| | there | ওখানে | *sɔ-t̪a-s* | *ɔhanan* | 6 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | who | কে | *t̪o-ŋeʔ* | *a-t̪oʔ* | 6 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | what | কি | *e-ŋeʔ* | *hi-iʔ* | 4 | 5 | 0.8 | 20% | 0.20 | 0.5 |
| | where | কোথায় | *kʰi-á-ŋeʔ* | *t̪iʲakaŋ* | 8 | 9 | 0.888 | 11.2% | 0.112 | 0 |
| | when | কখন | *eŋ-t̪ik* | *it̪ik máʔ* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | how (much) | কত | *eŋzat̪* | *izaka* | 4 | 5 | 0.857 | 14.3% | 0.143 | 0.5 |
| | not | না | *nilo͡u̯ʔ* | *i-hi malo͡u̯ʔ* | 6 | 13 | 0.461 | 53.9% | 0.539 | 0 |
| | all | সব | *zabʰa͡i̯ʔ* | *zábʰa͡i̯ʔ mahep* | 6 | 15 | 0.4 | 60% | 0.60 | 0 |
| | many | অনেক | *t̪am* | *atam* | 2 | 4 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1 |
| | some | কিছু | *eŋ emzat̪* | *t̪m kaʔ* | 8 | 9 | 0.888 | 11.1% | 0.111 | 0 |
| | few | কম | *hlem* | *aro͡u̯ kan* | 10 | 10 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0 |
| | other | অন্য | *t̪ʰild̪aŋ* | *ad̪aŋ* | 5 | 9 | 0.555 | 44.4% | 0.444 | 0.5 |
| | one | এক | *pakʰat̪* | *pakkʰo͡at̪* | 4 | 11 | 0.363 | 63.6% | 0.636 | 0.5 |
| | two | দুই | *paniʔ* | *pinikaʔ* | 3 | 7 | 0.428 | 57.2% | 0.572 | 0.5 |
| | three | তিন | *pat̪ʰum* | *t̪ʰomkaʔ* | 6 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | four | চার | *paliʔ* | *paliʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | five | পাঁচ | *paŋaʔ* | *panzaʔ* | 2 | 6 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 1 |
| | big | বড়ো | *liʲan* | *anrɔl* | 5 | 5 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.5 |
| | long | লম্বা | *ʃe͡i̯ʔ* | *aʃe͡i̯ʔ* | 1 | 7 | 0.145 | 85.5% | 0.855 | 1 |
| | wide | চওড়া | *za͡o̯ʔ* | *at̪ʰaŋ* | 6 | 7 | 0.857 | 85.7% | 0.857 | 0 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | thick | মোটা | *t͡ʃʰat͡ʃ* | *at̪a͡u̯ʔ* | 8 | 8 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | heavy | ভারী | *rit̪* | *anrik* | 4 | 5 | 0.8 | 80% | 0.8 | 0.5 |
| | small | ছোটো | *t̪eʔ* | *t̪ɔmmiʔ* | 4 | 7 | 0.571 | 42.9% | 0.429 | 0.5 |
| | short | বেঁটে | *t̪ɔʲ* | *niʲamiʔ* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | narrow | চিপা | *zim* | *at͡ʃip* | 5 | 6 | 0.833 | 83.3% | 0.833 | 0.5 |
| | thin | পাতলা | *pan* | *azʱaŋ* | 4 | 5 | 0.8 | 80.0% | 0.8 | 0.5 |
| | woman | মহিলা | *me͡i̯t͡ʃʰiʲaʔ* | *nona͡u̯ʔ* | 11 | 13 | 0.846 | 15.4% | 0.154 | 0 |
| | man (adult male) | পুরুষ | *mipaʔ* | *mipaʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | man | মানুষ | *mihriŋ* | *miʔ* | 4 | 6 | 0.666 | 66.6% | 0.666 | 0.5 |
| | child | বাচ্চা | *na͡o̯paŋ* | *napaŋ* | 3 | 8 | 0.375 | 37.5% | 0.375 | 0.5 |
| | wife | স্ত্রী/বউ | *nopu͡i̯ʔ* | *dɔŋ* | 8 | 8 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | husband | স্বামী | *paʃal* | *paʃal* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | mother | মা | *noʔ* | *noʔ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | father | বাবা | *paʔ* | *paʔ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | animal | পশু | *ramsaʔ* | *ran-saʔ* | 2 | 7 | 0.285 | 71.5% | 0.715 | 1 |
| | fish | মাছ | *saŋaʔ* | *ŋaʔ* | 2 | 5 | 0.4 | 60% | 0.6 | 1 |
| | bird | পাখি | *sabʱaʔ* | *bʱaʔ* | 2 | 6 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 1 |
| | dog | কুকুর | *u͡i̯ʔ* | *u͡i̯ʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | louse | উকুন | *hrik* | *hrik* | 0 | 4 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | snake | সাপ | *rol* | *marul* | 3 | 5 | 0.6 | 60% | 0.6 | 0.5 |
| | worm | কৃমি | *rolhɔbot̪* | *rakʰʲat̪* | 6 | 9 | 0.666 | 66.6% | 0.666 | 0 |
| | tree | গাছ | *t̪ʰiŋ* | *t̪ʰiŋ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | forest | বন | *ramhɔnʱɯʲa͡i̯ʔ* | *maŋ* | 12 | 14 | 0.857 | 14.3% | 0.143 | 0 |
| | stick | লাঠি | *t̪iʲaŋ* | *soŋ* | 5 | 6 | 0.833 | 83.3% | 0.833 | 0.5 |
| | fruit | ফল | *t̪ʰe͡i̯ʔ* | *t̪ʰe͡i̯ʔ* | 0 | 8 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | seed | বীজ | *t͡ʃiʔ* | *aʔ-t͡ʃiʔ* | 3 | 8 | 0.375 | 62.5% | 0.625 | 0.5 |
| | leaf | পাতা | *hnaʔ* | *hnaʔ* | 0 | 4 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | root | শিকড় | *zuŋ* | *razoŋ* | 3 | 5 | 0.6 | 60% | 0.6 | 0.5 |
| | bark (tree) | বাঁকল | *t̪ʰiŋkɔr* | *t̪ʰiŋ per* | 3 | 9 | 0.333 | 33.3% | 0.333 | 0.5 |
| | flower | ফুল | *paŋpar* | *par* | 3 | 6 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 |
| | grass | ঘাস | *plol* | *bel* | 3 | 4 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0.5 |
| | rope | দড়ি | *hro͡i̯ʔ* | *ru͡i̯ʔ* | 2 | 7 | 0.286 | 71.4% | 0.714 | 1 |
| | skin | চামড়া | *bʱun* | *bʱon* | 1 | 4 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| | meat | মাংস | *ʃaʔ* | *meʔ* | 2 | 3 | 1 | 0.00% | 0.0 | 1 |
| | blood | রক্ত | *t̪ʰisen* | *t̪ʰĩ* | 3 | 7 | 0.425 | 57.5% | 0.575 | 0.5 |
| | bone | হাড় | *ruʔ* | *roʔ* | 1 | 3 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 1 |
| | fat (noun) | চর্বি | *t̪ʰa͡o̯ʔ* | *at̪ʰat̪ʰuʔ* | 5 | 10 | 0.5 | 50% | 0.50 | 0.5 |
| | egg | ডিম | *art̪u͡i̯ʔ* | *art̪u͡i̯ʔ* | 0 | 9 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | horn | শিং | *kiʔ* | *rakiʔ* | 2 | 5 | 0.4 | 60% | 0.6 | 1 |
| | tail | লেজ | *me͡i̯ʔ* | *rame͡i̯ʔ* | 2 | 8 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| | feather | পালক | *enkɔlt̪oʔ* | *mahaʔ* | 8 | 9 | 0.888 | 11.2% | 0.112 | 0 |
| | hair | চুল | *ʃom* | *ʃam* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | head | মাথা | *luʔ* | *loʔ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | ear | কান | *beŋ* | *naʔ* | 3 | 3 | 1 | 0.00% | 0.0 | 0.5 |
| | eye | চোখ | *mit̪* | *amit̪* | 0 | 4 | 0 | 100% | 1.0 | 0.5 |
| | nose | নাক | *hnar* | *hnar* | 0 | 4 | 0 | 100% | 1.0 | 0.5 |
| | mouth | মুখ | *kaʔ* | *mur* | 3 | 3 | 1 | 0.00% | 0.0 | 0.5 |
| | tooth | দাঁত | *haʔ* | *haʔ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | tongue (organ) | জিহ্বা | *le͡i̯ʔ* | *male͡i̯ʔ* | 2 | 8 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| | fingernail | নখ | *kot̪t̪in* | *kot̪ mat̪in* | 3 | 11 | 0.272 | 72.7% | 0.727 | 0.5 |
| | foot | পায়ের তালু | *kept̪ʰaʔ* | *pe͡i̯ manzaʔ* | 9 | 12 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | leg | পা | *keʔ* | *pe͡i̯ʔ* | 4 | 6 | 0.666 | 33.4% | 0.334 | 0.5 |
| | knee | হাঁটু | *kʰup* | *rakʰup* | 2 | 6 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |
| | hand | হাত | *kut̪* | *kot̪* | 0 | 4 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wing | ডানা | *hlaʔ* | *mahaʔ* | 3 | 5 | 0.6 | 40% | 0.40 | 0.5 |
| | belly | পেট | *d̪ul* | *mad̪il* | 3 | 6 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 |
| | guts | ভুঁড়ি | *pumpu͡i̯ʔ* | *ril* | 8 | 9 | 0.888 | 11.2% | 0.112 | 0 |
| | neck | গলা | *hrɔk* | *riŋ* | 3 | 4 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0.5 |
| | back | পিঠ | *hroŋzaŋ* | *noŋ* | 5 | 7 | 0.714 | 28.5% | 0.285 | 0.5 |
| | breast | বুক | *ɔm* | *t͡ʃaŋ* | 5 | 5 | 1 | 0.00% | 0.0 | 0.5 |
| | heart | হৃদয় | *loŋ* | *maloŋ* | 2 | 5 | 0.4 | 60% | 0.6 | 1 |
| | liver | ফুসফুস | *t̪ʰin* | *mat̪ʰin* | 2 | 7 | 0.285 | 71.4% | 0.714 | 1 |
| | to drink | পান করা | *in* | *ind̪iŋ* | 4 | 6 | 0.666 | 66.6% | 0.666 | 0.5 |
| | to eat | খাওয়া | *e͡i̯ʔ* | *ʃakd̪iŋ* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | to bite | কামড়ানো | *seh* | *iʲe͡i̯ d̪iŋ* | 10 | 11 | 0.909 | 90.9% | 0.909 | 0 |
| | to suck | চোষা | *pʰɔp* | *mazʰɔn* | 5 | 6 | 0.833 | 83.3% | 0.833 | 0.5 |
| | to spit | থুতু | *t͡ʃil* | *mat͡ʃil* | 2 | 7 | 0.285 | 71.4% | 0.714 | 1 |
| | to vomit | বমি করা | *loʷak* | *maloʷak* | 2 | 7 | 0.285 | 71.4% | 0.714 | 1 |
| | to blow | ফুঁ দেওয়া | *t͡ʃem* | *sem-miʔ* | 6 | 7 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | to breathe | শ্বাস নেওয়া | *tɔklaʔ* | *rat̪ʰoʲok lak* | 9 | 13 | 0.692 | 69.2% | 0.692 | 0 |
| | to laugh | হাসা | *nu͡i̯ʔ* | *no͡i̯ miʔ* | 4 | 9 | 0.444 | 55.6% | 0.556 | 0.5 |
| | to see | দেখা | *en* | *iʲen miʔ* | 5 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0.5 |
| | to hear | শোনা | *ŋa͡i̯phla* | *ranza͡i̯* | 8 | 10 | 0.8 | 20% | 0.20 | 0 |
| | to know | জানা | *hriraʔ* | *ho͡i̯ miʔ* | 6 | 9 | 0.666 | 33.4% | 0.334 | 0 |
| | to think | ভাবা | *ŋo͡i̯t̪oʷaʔ* | *ŋa͡i̯t̪oʷaʔ* | 0 | 11 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | to smell | গন্ধ | *rim* | *rim* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | to fear | ভয় করা | *hla͡u̯ʔ* | *t͡ʃiʔ* | 6 | 7 | 0.857 | 14.3% | 0.143 | 0 |
| | to sleep | ঘুমানো | *mohil* | *in miʔ* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to live | বেঁচে থাকা | *noŋ-d̪am* | *dam* | 5 | 8 | 0.625 | 37.5% | 0.375 | 0.5 |
| | to die | মরে যাওয়া | *t̪ʰiʔ* | *t̪ʰiʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | to kill | হত্যা করা | *t̪ʰat̪* | *t̪ʰã-d̪iŋ* | 5 | 10 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 |
| | to fight | যুদ্ধ করা | *d̪o͡u̯ʔ* | *ʃoʷal d̪iŋ* | 10 | 11 | 0.90 | 10% | 0.1 | 0 |
| | to hunt | স্বীকার করা | *rambʱak* | *ʃa-makaʔ* | 5 | 7 | 0.714 | 71.4% | 0.714 | 0.5 |
| | to hit | কাউকে মারা | *t̪inaʔ* | *maho͡i̯ʔ* | 7 | 8 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| | to cut | কাটা | *t̪an* | *nɔk d̪iŋ* | 7 | 8 | 0.875 | 87.5% | 0.875 | 0 |
| | to split | ভাগ করা | *ʃem* | *ʃem* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | to stab | ছুরি মারা | *bʱit̪* | *pe͡i̯ʔ* | 5 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to scratch | আঁচড় দেওয়া | *bʱɔm* | *mapoʷak* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | to dig | খনন করা | *la͡i̯ʔ* | *t͡ʃ* | 5 | 6 | 0.833 | 16.7% | 0.167 | 0.5 |
| | to swim | সাঁতরানো | *t̪u͡i̯ hle͡u̯ʔ* | *t̪o͡i̯li͡u̯ʔ* | 4 | 14 | 0.285 | 71.5% | 0.715 | 0.5 |
| | to fly8 | ওড়া | *hlok* | *bʱoʷaŋ* | 5 | 6 | 0.833 | 83.3% | 0.833 | 0.5 |
| | to walk | হাঁটা | *kal* | *kal d̪iŋ* | 4 | 8 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 |
| | to come | আসা | *lo͡u̯kal* | *han kal* | 5 | 8 | 0.625 | 37.5% | 0.375 | 0.5 |
| | to lie (as in a bed) | শোয়া | *mu-zal* | *monin-in* | 7 | 8 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| | to sit | বসা | *tʰuʔ* | *an t̪o͡u̯ʔ* | 7 | 9 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| | to stand | দাঁড়ানো | *d̪iŋ* | *an-d̪iŋ* | 3 | 7 | 0.428 | 57.1% | 0.571 | 0.5 |
| | to turn | ঘোরাঘুরি করা | *in-her* | *an her* | 2 | 6 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |
| | to fall | পড়ে যাওয়া | *hloʔ* | *an poʷak* | 7 | 8 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| | to give | দেওয়া | *pe* | *pek* | 1 | 3 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |
| | to hold | ধরা | *man* | *mat̪ok* | 4 | 6 | 0.666 | 33.3% | 0.333 | 0.5 |
| | to squeeze | চাপ দেওয়া | *met̪* | *mat͡ʃe-eʔ* | 6 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | to rub | ঘষা | *nɔt̪* | *lak* | 4 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to wash | ধোয়া | *sil* | *raʃɔm* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | to wipe | মোছা | *noʲa͡i̯ʔ* | *mabʱa͡i̯ʔ* | 4 | 9 | 0.444 | 55.6% | 0.556 | 0.5 |
| | to pull | টানা | *pɔd̪* | *aka͡i̯ʔ* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | to push | ঠেলা | *nɔɽ* | *nam* | 2 | 3 | 0.666 | 33.3% | 0.333 | 1 |
| | to throw | ফেলে দেওয়া | *pa͡i̯t͡ʃ* | *pe͡i̯-iʔ* | 4 | 8 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 |
| | to tie | বাঁধা | *tɔn* | *reŋ* | 3 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to sew | সেলাই করা | *tʰo͡i̯ʔ* | *ʃa͡i̯ d̪iŋ* | 7 | 10 | 0.7 | 30% | 0.3 | 0 |
| | to count | গণনা করা | *t͡ʃʰiʲar* | *t͡ʃin d̪iŋ* | 7 | 10 | 0.7 | 30% | 0.3 | 0 |
| | to say | বলা | *tɔŋ* | *ril-r* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to sing | গাওয়া | *za͡i̯ʔ* | *laʃak* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | to play | খেলা | *inpʰiʲam* | *anlɔt* | 7 | 8 | 0.875 | 12.5% | 0.125 | 0 |
| | to float | ভাসা | *laŋ* | *apoʷan* | 5 | 6 | 0.833 | 16.6% | 0.166 | 0.5 |
| | to flow | বয়ে যাওয়া | *loʷaŋ* | *anloʲaŋ* | 3 | 7 | 0.428 | 57.1% | 0.571 | 0.5 |
| | to freeze | জমে যাওয়া | *kʰal* | *mad̪aʲ* | 5 | 6 | 0.833 | 16.6% | 0.166 | 0.5 |
| | to swell | ফুলে যাওয়া | *bʱoŋ* | *apoʷaʔ* | 4 | 5 | 0.8 | 20% | 0.2 | 0.5 |
| | sun | সূর্য | *niʔ* | *niʔ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | moon | চাঁদ | *hlaʔ* | *hlapaʔ* | 2 | 6 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 1 |
| | star | তারা | *art͡ʃʰoʃiʔ* | *arɔʃiʔ* | 5 | 10 | 0.5 | 50% | 0.50 | 0.5 |
| | water | পানি | *t̪o͡i̯ʔ* | *t̪o͡i̯ʔ* | 0 | 7 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | rain | বৃষ্টি | *ruʷaʔ* | *kʰoʷaʔ* | 3 | 6 | 0.5 | 50% | 0.50 | 0.5 |
| | river | নদী | *lu͡i̯ʔ* | *t̪o͡i̯ po͡i̯ bʱaʔ* | 13 | 17 | 0.764 | 23.6% | 0.187 | 0 |
| | lake | হ্রদ | *d̪il* | *t̪o͡i̯d̪il* | 6 | 10 | 0.6 | 40% | 0.4 | 0 |
| | sea | সমুদ্র | *t̪u͡i̯pʰinriʲat̪* | *t̪o͡i̯pʰim riʲot͡ʃ* | 6 | 18 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 0 |
| | salt | লবণ | *t͡ʃi-al* | *al* | 5 | 7 | 0.714 | 28.5% | 0.285 | 0.5 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_X D$ | LS% | $L_V S$ | $B_L S$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | stone | পাথর | *luŋ* | *luŋ* | 0 | 3 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | sand | বালি | *baluʔ* | *baluʔ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | dust | ধুলা | *bʰa͡i̯bʰot̪* | *ʃa͡u̯ʲ* | 8 | 11 | 0.727 | 27.2% | 0.272 | 0 |
| | earth | মাটি | *le͡i̯ʔ* | *t̪ola͡i̯ʔ* | 4 | 9 | 0.444 | 55.6% | 0.556 | 0.5 |
| | cloud | মেঘ | *t͡ʃʰum* | *kʰanim* | 5 | 6 | 0.833 | 16.6% | 0.166 | 0.5 |
| | fog | কুয়াশা | *t͡ʃʰom* | *me͡i̯ʃum* | 6 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | sky | আকাশ | *bʰan* | *rabʰan* | 2 | 6 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |
| | wind | বাতাস | *hliʔ* | *t̪ʰi͡i̯ʔ* | 6 | 8 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | snow | তুষার | *bʰur* | *rad̪oʔ* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0.0 | 0.5 |
| | ice | বরফ | *bʰur* | *bor* | 2 | 4 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1 |
| | smoke | ধোঁয়া | *me͡i̯kʰoʔ* | *akʰoʔ* | 5 | 9 | 0.555 | 44.5% | 0.445 | 0.5 |
| | fire | আগুন | *me͡i̯ʔ* | *me͡i̯ʔ* | 0 | 6 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | ash | ছাই | *bʰut̪* | *rapʰt̪oʔ* | 6 | 8 | 0.714 | 28.5% | 0.285 | 0 |
| | to burn | পোড়া | *kaŋ* | *akaŋ* | 1 | 4 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| | road | রাস্তা | *kɔŋpu͡i̯ʔ* | *lampu͡i̯ʔ* | 3 | 9 | 0.333 | 66.7% | 0.667 | 0.5 |
| | mountain | পাহাড় | *thlaŋ* | *thlaŋ* | 0 | 5 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | red | লাল | *ʃen* | *aʃen* | 1 | 4 | 0.25 | 75% | 0.75 | 1 |
| | green | সবুজ | *hriŋ* | *araŋ* | 2 | 4 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1 |
| | yellow | হলুদ | *eŋ* | *eŋ* | 0 | 2 | 0 | 100% | 1.0 | 1 |
| | white | সাদা | *bʰar* | *ŋu* | 4 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | black | কালো | *d̪om* | *bʰɔm* | 3 | 4 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0.5 |
| | night | রাত | *zan* | *ziŋla͡i̯* | 6 | 9 | 0.666 | 33.4% | 0.334 | 0 |
| | day | দিন | *t͡ʃʰon* | *sun* | 5 | 6 | 0.833 | 25% | 0.166 | 0.5 |
| | year | বছর | *kum* | *kom* | 1 | 3 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |
| | warm | গরম | *saʔ* | *sat̪* | 2 | 4 | 0.5 | 50% | 0.5 | 1 |
| | cold | ঠান্ডা | *bʰɔt̪* | *ad̪aʲ* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | full | ভরা | *kʰat̪* | *aʃip* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | new | নতুন | *t̪ʰar* | *at̪ʰar* | 2 | 6 | 0.333 | 66.6% | 0.666 | 1 |

| SL. | SWL | বাংলা শব্দ | W1 (লুসেই) | W2 (পাংখুয়া) | LD | LW | $L_XD$ | LS% | $L_VS$ | $B_LS$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | old | পুরানো | *hlo͡i̯ʔ* | *alu͡i̯ʔ* | 2 | 7 | 0.285 | 71.5% | 0.715 | 1 |
| | good | ভালো | *tʰaʔ* | *asaʔ* | 2 | 4 | 0.5 | 50% | 0.50 | 1 |
| | bad | খারাপ | *tʰalo͡u̯ʔ* | *asaloʔ* | 5 | 9 | 0.555 | 44.5% | 0.445 | 0.5 |
| | rotten | পচা | *tɔʲ* | *at̪ʰuʔ* | 5 | 5 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | dirty | ময়লা | *tɔʔ* | *anom* | 4 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | straight | সোজা | *ŋil* | *ant̪laŋ* | 6 | 7 | 0.857 | 85.7% | 0.857 | 0 |
| | round | গোল | *biʲal* | *abil* | 3 | 5 | 0.6 | 60% | 0.60 | 0.5 |
| | sharp (as a knife) | ধারালো | *hriʲam* | *arim* | 3 | 6 | 0.5 | 50% | 0.50 | 0.5 |
| | dull (as a knife) | ভোঁতা | *hriʲamlo͡u̯ʔ* | *amol* | 9 | 12 | 0.75 | 25% | 0.25 | 0 |
| | smooth | মসৃণ | *nem* | *anal* | 3 | 4 | 0.75 | 75% | 0.75 | 0.5 |
| | wet | ভেজা | *hoʔ* | *azul* | 4 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | dry | শুকনা | *rep* | *ahul* | 4 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0.5 |
| | correct | ঠিক | *t̪id̪ik* | *ad̪ik* | 3 | 7 | 0.428 | 57.1% | 0.571 | 0.5 |
| | near | কাছে | *bol* | *ana͡i̯ʔ* | 6 | 6 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | far | দূর | *hlaʔ* | *anlaʔ* | 2 | 5 | 0.4 | 60% | 0.60 | 1 |
| | right | ডান | *d̪iŋ* | *t͡ʃemɔhlaŋ* | 9 | 10 | 0.9 | 90% | 0.90 | 0 |
| | left | বাম | *bʰe͡i̯ʔ* | *t͡ʃi t͡ʃɔk* | 9 | 10 | 0.9 | 90% | 0.90 | 0 |
| | at | এতে | *he-t̪aʔ* | *ɔhaʔ* | 5 | 7 | 0.714 | 28.6% | 0.286 | 0.5 |
| | in | মধ্যে | *he-t̪aʔ* | *ʃuŋt̪iʲaʔ* | 5 | 9 | 0.555 | 44.5% | 0.445 | 0.5 |
| | with | সাথে | *roʷal in* | *roʷalniʔ* | 2 | 8 | 0.25 | 25% | 0.25 | 1 |
| | and | আর/ও | *leh* | *mat͡ʃon* | 7 | 5 | 1.4 | 0% | 0.00 | 0 |
| | if | যদি | *lo͡u̯ʔ* | *iʲaŋŋin* | 7 | 7 | 1 | 0% | 0 | 0 |
| | because | কারণ | *at͡ʃʰan* | *aʃat͡ʃuʔ* | 5 | 7 | 0.714 | 71.4% | 0.714 | 0.5 |
| | name | নাম | *miŋ* | *ramiŋ* | 2 | 5 | 0.4 | 60% | 0.60 | 1 |

# বিবাহ নাটক: ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সখীনার উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর

তানজিনা জাহান*

**Abstract:** If we look at the literary arena of Bangladesh, we can see that the topic of the Language Movement has been replete with multidimensional resonance in the literary works of our creative writers. Momtazuddin Ahmed (1935-2019), a prominent figure in Bengali drama, is one of those creative writers. Bibaho (composed 1979, published 1985), the best play by Momtazuddin Ahmed, is about the bloodz revival of Bengalis in the Language Movement of 1952 and the story of their unity in the great Liberation War with the aim of this revival. Numerous language martyrs who sacrificed their lives to establish the dignity of the mother tongue are memorable and welcome to us. Apart from the language martyrs, there are many others in our society who consider language martyrs as their own and live by holding on to their memories for years. We find one such person in the drama Bibaho. Sakhina's future husband was martyred while participating in the Language Movement procession. In this incident, Sakhina sets aside her personal pain and moves forward on the path of greater revival. The research paper will discuss how the martyrdom of Sakhina's future husband in the Language Movement inspired the unarmed warrior Sakhina to speak about a larger or collective revival.

**মুখ্যশব্দ (Keyword):** ভাষা-আন্দোলন (Language Movement), মাতৃভাষা (Mother tongue), মিছিল (Procession), শহিদ (Martyr), বিবাহ (Bibaho), সামষ্টিক (Collective), উজ্জীবন (Resuscitation)

* তানজিনা জাহান, প্রভাষক (বাংলা), স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ইমেইল: jahan@bou.ac.bd

**প্রাককথন**

একুশ ভাষা আন্দোলনের সফল একটি প্রতীক। একুশ বাঙালিকে দেখিয়েছে আত্মপরিচয়ের নব নিশানা। কেননা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ প্রোথিত হয়েছিল বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনেই। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একুশের আবির্ভাব বাঙালি জাতির জীবনে একটি যুগান্তরের সূচনা করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পরবর্তীতে ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুর ভিত্তি নির্মাণ করেছে। বায়ান্নর একুশ মানে বিরোধী শক্তির নিকট কোনোভাবেই মাথা নত না করা। একুশকে বলা হয় বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মদানের এক অনিবার্য ভ্রুণ। বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসের এক প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো "এ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সরব প্রকাশ (হক, ১৯৭৬: ৪৮)। সাহিত্যের আসরেও এর সরব প্রকাশ অনিবার্যভাবেই ঘটেছে। উনিশশো বায়ান্ন সালে বাঙালি জাতির রক্তাক্ত উজ্জীবনের পরপর শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও উজ্জীবনের সুবাতাস বইতে শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে মর্মমূলে ধারণ করে আমাদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকরা সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের মতো অবিনাশী শিল্প উপাদানকে পাথেয় করে অনেক নাট্যকার শিল্প সফল নাটক নির্মাণ করেছেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো: মুনীর চৌধুরী রচিত কবর (রচনাকাল ১৯৫৩, প্রকাশকাল ১৯৬৬), ওবায়েদ উল হক রচিত কতিপয় শহীদের উক্তি (১৯৭৪), মমতাজউদদীন আহমদ রচিত বিবাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদের কাল মহাকাল (রচনাকাল ১৯৯৬, প্রকাশকাল ১৯৯৯), সৈয়দ শামসুল হকের আমাদের জন্ম হলো (রচনাকাল ১৯৯০, প্রকাশকাল ২০০৮) এবং মামুনুর রশীদ রচিত নাটক উচাইয়ের কুসুম (২০১১)। নাটকগুলো নান্দনিক পিপাসা মেটানোর পাশাপাশি বাঙালির হৃদয়ে জাতীয় চেতনাকে ধারণ করতে মন্ত্রের মতো কাজ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মমতাজউদদীন আহমদের লেখনী এক্ষেত্রে আলোকিত। তাঁর উজ্জ্বল লেখনীতে একাধারে জায়গা করে নিয়েছে ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ আরও নানা বিষয়।

বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে বাঙালির রক্তাক্ত উজ্জীবন এবং এই উজ্জীবনের নিশানা ধরে মহান মুক্তিযুদ্ধে একাত্ম হওয়ার কাহিনি নিয়ে রচিত মমতাজউদদীন আহমদের শ্রেষ্ঠ নাটক বিবাহ । এখানে তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গের সরল সংযোজন করেছেন। বর্তমান গবেষণায় বিবাহ নাটক গবেষণার প্রাথমিক উৎস এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, সাহিত্য পত্রিকা, গবেষণা-প্রবন্ধ

ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ প্রভৃতি দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ গবেষক প্রাধান্য দেন মুনীর চৌধুরী রচিত কবর নাটককে। সেদিক থেকে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বিবাহ নাটক নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা তুলনামূলক কম। বিশেষ করে ভাষা শহিদদের বাইরেও আমাদের সমাজে এমন আরও অনেকে আছেন যারা ভাষা শহিদদের একান্ত আপনজন মনে করে তাঁদের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বছরের পর বছর বেঁচে আছেন। এমনই একজনের সন্ধান পাওয়া যায় বিবাহ নাটকে। যার নাম সখীনা। সখীনার হবু স্বামী ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শহিদ হন। এই ঘটনায় সখীনা তার একান্ত ব্যক্তিগত বেদনাকে পাথরচাপা দিয়ে চেতনাগত ও আদর্শিক যুদ্ধক্ষেত্রের একজন যোদ্ধা হয়ে যাত্রা করে সামষ্টিক উজ্জীবনের পথে। এই নাটকে ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন সাধারণ নারীচরিত্রের যে উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর মমতাজউদদীন নির্মাণ করে দেখিয়েছেন তা আগের গবেষণাসমূহে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই এই নাটক নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে সখীনার হবু স্বামীর ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়ার ঘটনা অস্ত্রহীন যোদ্ধা সখীনাকে কীভাবে বৃহত্তর বা সামষ্টিক উজ্জীবনের কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা পাঠ-বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে।

**ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট**

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে '৫২র ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুসংহত হয়ে অগ্রগতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনা জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্ম দেয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারত গঠিত হয়। ফলে ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত বিরোধের জের ধরে পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষের উপর নানারকম বৈষম্যমূলক নীতি আরোপ করতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতি মুছে দেয়ার নোংরা খেলায় মেতে ওঠে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির আবহমান সংস্কৃতির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করতে থাকে। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শিকলে বাঁধতে প্রথমেই পরিকল্পনা করে মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার। কিন্তু বাংলার সর্বস্তরের মানুষ এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। বাঙালি ভাষার অধিকার আদায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং

১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলায় 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপক আন্দোলন।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রস্তাব করা হয়, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা। ফলে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ শুরু হয় ও দাবি ওঠে, "উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে" (উমর, ১৯৭০: ২৪)। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং দাবি পূরণে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকার ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন চলমান থাকে। একপর্যায়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলে আন্দোলন সাময়িক বন্ধ হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ও কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এই ঘোষণার পর দেশব্যাপী আন্দোলন পুনরায় তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সাল ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির বছর। "১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টনে মুসলিম লীগের এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই আবার ঘোষণা দেন: পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" (হান্নান, ২০১২: ২১৫)। ফলে ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষের মাঝে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে ৩০শে জানুয়ারি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে তোলে। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় ও "সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে" (মাহবুব, ২০১৩: ৬৪)। ২১শে ফেব্রুয়ারির হরতাল কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্ররা এক গোপন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোনো উপায়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। পরদিন ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ও পুলিশের যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে ছাত্ররা দলে দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বটতলায় জমায়েত হতে থাকে। ছাত্ররা জমায়েত হয়ে মিছিলে মিছিলে মুখরিত করতে থাকে চারদিক। স্লোগান নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া মাত্রই পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বেলা তিনটার দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেদিন ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল। ভাষার দাবিতে সোচ্চার মিছিলটি জোর কদমে এগিয়ে

যেতে থাকে প্রাদেশিক ভবনের দিকে। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই শহিদ হন রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার। শহিদ হন আবুল বরকত, সফিউর রহমানসহ আরও যুবকেরা। তাঁদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পাকিস্তান সরকার "বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাস করে" (হান্নান, ২০১২: ২২৪)। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে অসংখ্য ভাষা শহিদ আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। ভাষার জন্য তাঁদের ত্যাগ আমাদের কাছে জ্বলজ্বলে এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে নতুন পথের অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

## বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের অবদান

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয় মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। "ভাষা আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হয়" (ছালাম, ২০১৯: ৫৬৫)। কালক্রমে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বীর বাঙালি প্রথম নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়। এই সাহসকে পুঁজি করেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয় ও স্বৈরাচারী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে নিজ মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে সক্ষম হয়।

## মমতাজউদদীনের নাটক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

সংস্কৃতিবান ও নাট্যপ্রেমী পরিবারে জন্ম মমতাজউদদীন আহমদের। নাট্যিক পরিবেশে লালিত মমতাজউদদীন ছোটোবেলায় মায়ের কোলে বসে নাটক দেখতেন। মামা-চাচাদের অভিনয়ের প্রতি নেশা ও নাট্যপ্রেমী বাবাকে দেখেই নাট্যকর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থাতেই মঞ্চে ও পথনাটকে অভিনয় করেন তিনি। স্বয়ং মমতাজউদদীন আহমদের ভাষ্য:

> নাটকের নেশায় যে একবার মজেছে তার আর উপায় নেই। বারবার তাকে আসতে হবে। তার ক্ষুদ্র ক্লিষ্ট সংসারে দারিদ্র্যের শতছিদ্র বেদনা জড়িয়ে থাকুক, তার রুগ্ন স্বাস্থ্যে, অবক্ষয়ের যন্ত্রণা ঘিরে থাকুক, তবু তাকে আসতে হবে পাদপ্রদীপের সামনে। ... নাটকের নেশায় পেলে সে লোকের আর বাঁচোয়া নেই। সে বিত্ত চায়না, প্রধান অতিথি হয়ে সভাসমিতি গরম করতে চায় না, যশ-খ্যাতির গজদন্ত মিনারে বসে ঈশ্বরের বিধানকে ব্যঙ্গ করতে চায় না। সে চায় জীবনের সংলাপ যথাযথভাবে উচ্চারণ করতে (আহমদ, ২০০০: ২৮৬-২৮৭)।

মমতাজউদদীন আহমদ "ভয়াবহ সব সত্য কথা বলেন, কোনো পরিণাম বিবেচনা না করেই" (রশীদ, ২০০০: ৬৯০)। পূর্ব বঙ্গের নাট্য আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর রচিত ও মঞ্চায়িত নাটক বাংলার মুক্তিকামী জনগণকে জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। নিরাশার বালুচরে থেকে তিনি মানুষকে শুনিয়েছেন আশার সংলাপ। তাঁর নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং মুক্তির চেতনায় বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই তিনি নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন করেন। মঞ্চের পাশাপাশি টেলিভিশনের জন্যও তিনি নাটক লিখেছেন।

> স্বাধীনতা উত্তরকালে তাঁর যে নাটকগুলো টিভি-দর্শকদের কাছে বহুল প্রশংসিত ও আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যে 'এই সেই কণ্ঠস্বর', 'বন্ধু আমার', 'বিবাহ', 'অন্যরকম ভালবাসা', 'জোহরা', 'কূল নাই কিনার নাই' এবং 'সহচর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য" (হাসান, ২০০০: ৬৭৫)।

সমাজজীবনের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর নাটকগুলো তাই হয়ে উঠেছে মৃত্তিকানির্ভর। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের অন্তর্দহন, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মূল্যবোধের সংকট, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, মানুষের স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাঁর নাটকের উপজীব্য বিষয়। তাঁর নাটকের শিল্প উপাদান হিসেবে বারবার খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালির সংগ্রামী নানা ঐতিহ্যকে। বিশেষত স্বাধীনতাভিত্তিক নাটক রূপায়ণে তিনি দক্ষ কারিগর। স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক তাঁর বিখ্যাত একটি নাট্যগ্রন্থ *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা* (১৯৭৭)। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলো হলো: স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বর্ণচোরা।স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা নাটকটি লেডি গ্রেগরীর রাইজিং অব দি মুন অবলম্বনে রচিত। নাট্যকারের স্বদেশপ্রীতির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। এবারের সংগ্রাম নাটকে এঁকেছেন নির্যাতিত মানুষের কাহিনি। স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বর্ণচোরা নাটকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও স্বাধীনভাবে বাঁচার স্পৃহা ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত নাটক বিবাহ। নাটকের

প্রধান চরিত্র সখীনার মুখ দিয়ে নাট্যকার উচ্চারণ করিয়েছেন সামষ্টিক উজ্জীবনের সংলাপ। কী চাহ শঙ্খচিল রৌশনারা নামের এক বীরাঙ্গনার কাহিনি। শঙ্খচিল মানে অশুভ শক্তি। একাত্তরের নানা করুণ চিত্র, স্বাধীনতাত্তোর স্বজনদের ভয়াবহ রূপ, প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয় নাট্যকার অঙ্কণ করেছেন এই নাটকে। এই সেই কণ্ঠস্বর মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত জাগরণী চেতনায় ঋদ্ধ একটি নাটক। সাতঘাটের কানাকড়ি নাটকে শিল্পরূপ পেয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির উত্থান, স্বজন হারা মানুষের ক্রন্দন, স্বৈরশাসন ও বাঙালির সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চেতনা। মীর মশাররফ হোসেনের জমীদার দর্পণ (১৮৭৩) নাটকের নব নাট্যায়ন মমতাজউদদীনের জমিদার দর্পণ নাটক। এই নাটকে তিনি এই কালের শ্রেণিসংগ্রাম চেতনাকে তুলে ধরেছেন। তাছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে: স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, হাস্য লাস্য ভাষ্য, ক্ষত বিক্ষত, প্রেম বিবাহ সুটকেশ, হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, রঙ্গপঞ্চাদশ, রাজা অনুস্বরের পালা প্রভৃতি। এসব নাটকে শোষক-নির্যাতক ও মিথ্যার বিরুদ্ধে মমতাজউদদীনের কণ্ঠ সর্বদা সোচ্চার ছিলো। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আলোকিত করেছেন। মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি গণমানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর নাটক দর্শক ও পাঠককে শোনায় আশার বাণী, অনুপ্রাণিত করে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে ওঠতে।

**বিবাহ নাটকে সখীনার উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর**

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী বাংলা নাট্যধারার ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ তাঁর নাটকে জীবনের কথা বলেন, যৌবনের কথা বলেন। দুই খণ্ডে বিভক্ত "বিবাহ"(আহমদ, ২০১২) নাটকে তিনি বাঙালির অনিবার্য এক সত্য ইতিহাসের কাহিনিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরী রচিত *কবর*। এরপর দ্বিতীয় সার্থক নাটক নিঃসন্দেহে বিবাহ। এই নাটকে চরিত্রগুলোর শাণিত সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভাষা ও দেশের প্রতি তাদের প্রগাঢ় ও খাঁটি ভালোবাসা। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের অস্তিত্ববাচক চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে জীবিতদের মধ্যে। এই চেতনার স্পর্শে জাগ্রত হয়ে বীর বাঙালি বারবার অস্ত্র ধরেছে। সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করে নিজ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে অনেকে আবার সম্পদের পাহাড় নির্মাণ করেছে। কিছু মানুষ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও ত্যাগের মহিমাকে বছরের পর বছর লালন করেছে। বিবাহ নাটকের মুখ্য চরিত্র সখীনারও নিজের বিয়েকে ঘিরে ছিলো অজস্র স্বপ্ন। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। সে যখন গায়ে হলুদ আর হাতে মেহেদি মেখে বধূবেশে বসে ছিলো তখন তার হবু বর বায়ান্নর উত্তাল মিছিলে অংশগ্রহণ করে তাজা রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। সখীনার চেতনায় তার গায়েমাখা হলুদের রং রক্তের মতোই

লাল। এই রং মোছা যায় না। নাট্যকার এ নাটকে দেখিয়েছেন সখীনার গায়ে হলুদের এই রং কত সহজেই তাকে সামষ্টিক উজ্জীবনের পথে নিয়ে যায়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, "বায়ান্ন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যষ্টিক জীবন ছাপিয়ে কীভাবে সামষ্টিক জনগোষ্ঠীকে উদ্বেলিত-উচ্ছ্বসিত করেছে সেটারও নৈয়ায়িক প্রতীকী জন্মেছে এ নাটকে" (ইসলাম, ২০১৩: ৫১)।

১৯৭৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে সখীনাকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে বিবাহ নাটকের আরম্ভ হয়। সখীনা তার মামাতো বোন দোলনের বিয়েতে এসেছে আনন্দ করতে, তাই আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ রক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার নেই। এদিকে আবার দোলনের বিয়েতে সখীনার আগমনে দোলনের পরিবার খুশি হতে পারেনি। সখীনার আগমনে তারা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। কারণ বায়ান্নর কোনো এক ফুল-ফাগুনে সখীনার বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সেই বিয়ে হয়নি। সখীনার হবু স্বামীকে নিয়ে ২০ তারিখ ঢাকায় বিয়ের কেনাকাটা করতে যায় লালু মামা। ২১ তারিখ বা ২২ তারিখ ঢাকা থেকে তাদের ফেরার কথা ছিলো। কিন্তু ২১ তারিখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে চারদিকে ছাত্র-জনতার মিছিল-প্রতিবাদ ও দ্রোহের শাণিত উচ্চারণ গর্জে ওঠে। ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ড ঘটে সেদিন। সেই মিছিলে যোগ দেয় সখীনার হবু স্বামী। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সে হয়ে উঠে একজন সক্রিয় কর্মী। একদিকে সখীনার গায়ে হলুদ, অন্যদিকে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংক্ষুব্ধ জনতাকে স্তব্ধ করতে পুলিশের দানব গুলি। সেই গুলিতেই শহিদ হয় সখীনার হবু স্বামী। সখীনার চেতনায় তার হবু স্বামীর টগবগে রক্ত গভীরভাবে লেপ্টে আছে। তার অনুভূতিতে হলুদের রং রক্তের মতোই গভীর। তাইতো স্মৃতি আর কল্পনার সাগরে ভাসমান কঠিন অথচ শোকে বিহ্বল সখীনা তার মামাকে বেদনা জড়িত কণ্ঠে বলেছে:

> আমার আনন্দ, গৌরব, সুখ, সংসার। কাকে দেব, কেমন করে দেব ছোট মামা। হলুদ শাড়ি- আমার ওই শাড়িতে যে বেঁচে থাকার প্রদাহ, দাহ লেগে আছে। না জানা ভালোবাসা ছোট মামা, আমার এক এক করে অনেক বছরের ফাল্গুন জমে আছে। আমি যে নীড় রচনার কাজে নিমগ্ন আছি। এই দেখলাম হাঁড়িতে ভাত টগবগ করে ফুটছে, কখনো শুনছি একটি সরল নরম কণ্ঠ এসে আমাকে বলছে: চল না নৌকায় চড়ে নদীর মোহনায় যাই। কখনো শুনি একটি কচিকণ্ঠের অমৃত কান্না বলছে: মা, ওমা আমাকে কোলে নাও, ঘুম যাব। ছোট মামা আকাশ, ঘর, পানি ভরা কলসী, বর্ণ পরিচয়, দুঃখ, অভিমান, আমি যে এক এক করে সাতাশ বছর, সাতশো বছর- অন্ধকার আলো, জীবন বুনছি- আমি বাঁচার জন্য (ত্রয়োদশ দৃশ্য, ১ম খণ্ড)।

সখীনার বাবা বাংলা ভাষা, দেশ ও দেশের স্বাধীনতার পক্ষের অতি দরদী

একজন মানুষ। ভাষা আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে তিনিও তার সর্বোচ্চ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাইতো নিজের হবু জামাতার মৃত্যুতে তিনি ভেঙ্গে না পড়ে অটল থেকেছেন। ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে তার বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ সামষ্টিক উজ্জীবনকে স্পর্শ করে। তিনি সাহসিকতার সাথে সখীনার বান্ধবী আতিয়াকে বলেন: "... ঢাকায় শুনেছি ছাত্ররা খুব ক্ষেপে গিয়েছে আতিয়া। মিছিল করবে, হরতাল করবে। করবেই তো। বাংলা ভাষা যদি না থাকে তো কীসের দেশ, কীসের স্বাধীনতা" (৫ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড) ।

মেয়ের জামাই এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি বলেন:

> ...আমার মেয়ের জামাই জালেমের গুলিতে শহীদ হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। এতো একটা ঘটনা নয়। এতো ইতিহাস, এতো একটি অগ্নিগিরি। আমি বলছি, আমার দেল বলছে- ওই ছেলেকে আমরা মাটির নিচে রাখব না। আমার ছেলেকে হরগিজ কবরে যেতে দেব না। আমার ঐ ছেলের গোরাজাব নাই, আমার জামাই এর জন্য বেহেস্তের সব দরজা খোলা (৭ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড)।

আন্দোলনে শহিদ হবু জামাতাকে কবরে যেতে না দেয়ার বিষয়টিকে নাট্যকার তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে নাটকে তুলে ধরেছেন। এই প্রতিবাদ জালেমের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির সামষ্টিক উজ্জীবনের পরিচয় বহন করে।

এদেশের কিছু মানুষ আবার ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিক দাবি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। স্থানীয় জন-প্রতিনিধির গুটিকতক ব্যক্তি বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিকে ঘৃণাভরা চোখে অবলোকন করেছে। নাটকের জয়নুদ্দিন চেয়ারম্যান তাদেরই একজন। সখীনার মৃত স্বামীকে মসজিদ প্রাঙ্গণে আনার চেষ্টা করলে চেয়ারম্যান গর্জে উঠে বলে: "আরে আরে, ঐ ছোঁড়ার লাশ নিয়ে তো মসজিদের দিকেই আসছে। এই দিকে আসছে ক্যান। শালারা তো ফাজলামি শুরু করেছে। ... শালারা, বাংলা চাওতো এখানে কেন। এটা তো বাংলাওয়ালার ওয়াতন নয়"(৮ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড)। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে আন্দোলনে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলো তাঁরা সবাই চেয়ারম্যানের দৃষ্টিতে জঘন্য। চেয়ারম্যানের কাছে আন্দোলনকারীরা কাফের, কমিউনিস্ট ও বিদেশের দালাল। সখীনার স্বামীকে মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা নিয়ে জয়নুদ্দিনের সাথে লালুর কথা কাটাকাটি হয়। ফলে দাফন আর সম্পন্ন হয়নি। দাফন সম্পন্ন না হওয়ায় শহিদের আত্মা তৃপ্ত হতে পারেনি। সখীনার হবু স্বামীর অতৃপ্ত আত্মা ও সখীনার হৃত হৃদয়ের কান্না সম্পর্কে সমালোচক ড. মো. রিজাউল ইসলাম বলেন:

> সখীনার স্বামীর অতৃপ্ত আত্মা শান্ত ছেলের মত গোরস্থানে ফিরে গেছে। কিন্তু সখীনাকে মুক্তি দিয়ে যায়নি। সতের বছর বয়সে সখীনা গায়ে বিয়ের হলুদ

> পরেছিল, হাত মেহেদি রঙে রাঙিয়েছিল। সবকিছু অটুট রাখতে চায় সাধনা দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। এজন্য সখীনা অন্যত্র বিয়ে করেনি। এই হারানোর মধ্যে সখীনা মহৎ এক প্রাপ্তি খুঁজে ফিরেছিল এতদিন (ইসলাম, ২০১৩: ৫৩)।

চেয়ারম্যানের বাধার মুখে মসজিদ প্রাঙ্গণে সখীনার স্বামীর কবর রচিত হয়নি। কোথায় হয়েছে কেউ জানেনা। সেই '৫২ থেকে '৭৯ পর্যন্ত তার গোরস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়নি। '৭৯ এর ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে দীর্ঘ সাতাশ বছর পর সখীনার স্বামীর আত্মা সখীনা ও তার একে অপরকে চেনা প্রসঙ্গে লালু মামাকে বলেছে:

> লালু: সখীনাকে তুই কি আর চিনতে পারবি। সখীনাও কি তোকে চিনবে।
> কণ্ঠ: চিনবে লালু মামা চিনবে। সখীনার দৃষ্টির ভেতর আমি যে
> দীর্ঘস্থায়ী সুখ রেখে গেছি সেই সুখ দিয়ে সখীনা আমাকে
> আবিষ্কার করবে। তোমাদের ছেড়ে, ঘাসের এই সবুজ
> নরোম গন্ধ ছেড়ে আমি আর যাব না লালু মামা (১ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড)।

লালু মামা চায়নি নিত্যদিনের মলিনতা এই ভাষা শহিদকে স্পর্শ করুক। তাই সখীনার শহিদ স্বামীর আত্মা লালু মামার কথায় শান্ত ছেলের মতো গোরস্থানে ফিরে যায়।

সখীনা তার কনে সেজে থাকার প্রতীক্ষাকে অটুট রাখতে চেয়েছিল নিজস্ব কল্পনা দিয়ে। হবু স্বামীকে হারানোর মধ্য দিয়ে সে মহৎ প্রাপ্তি খুঁজেছিল জীবনে। ১৯৭৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালু মামা। লালু মামা তার বক্তৃতায় সখীনার হবু স্বামীর করুণ পরিণতির মর্মস্পর্শী বর্ণনা করেন। সখীনা এসব শুনে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে সবার অজান্তে সভাস্থল ত্যাগ করে বাড়ি চলে যায়। সভা শেষে বাড়ি ফিরে লালু মামা তার চলে আসার কারণ জানতে চাইলে সখীনা যে উত্তর দেয় তা তার জীবনের এক ব্যথিত উচ্চারণ:

> ছোট মামা এ তুমি কি করলে। এতকাল অন্ধকারে বসে আমি আলোর সাধনা করছি। আজ আমাকে প্রকাশ করে, উন্মোচন করে একেবারে নিঃস্ব করে দিলে। ছোট মামা আমার যা কিছু দুঃখ, যা কিছু বঞ্চনা, যত কিছু হাহাকার, সবই তো আমার ছিল; আজ আমি প্রচারের মধ্যে প্রবেশ করে সব হারিয়ে দিলাম এখন আমার আমি কি নিয়ে বাঁচবে বলত ছোট মামা (১০ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড)।

সখীনা তার হৃত হৃদয়ের কান্না, তার সব ব্যথা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রেখে বাঁচতে চেয়েছিল। সে তার জীবনের সবকিছুতেই নেতির মধ্যে ইতি খুঁজেছিল, আলোর সাধনা করেছিল। কিন্তু লালু মামা তার অভ্যন্তরীণ সত্তার প্রকাশ করে তাকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দেয়। এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য লালু মামা সখীনাকে বিয়ে করে নতুনভাবে

সংসার করার প্রস্তাব দেয়। মামার এই প্রস্তাবে সখীনার ইতিবাচক অস্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। সখীনার দৃপ্ত উচ্চারণ:

> আমার তো সেই কবে বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মামা। ... আমার বিয়েটা হয়েছিল মহা সমারোহে। ছোট মামা বিয়ের প্রথম কথাটা শুনেছিলাম তোমার কাছে।... আমি ওকে চিরকাল ধরে রাখব কেমন করে। এক এক করে এমনি করে বায়ান্ন থেকে সাতাশটা বছর বেঁচে আছি। যতদিন বাঁচব ওকে নিয়েই বেঁচে থাকব। ওগো, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে নিয়েই বাঁচব (১০ম দৃশ্য, ২য় খণ্ড)।

সখীনা তার কান্না ও বেদনা লুকাতে সারাজীবনই হাসিমাখা মুখ নিয়ে চলেছে। তবে শেষপর্যন্ত তার লুকায়িত একান্ত ব্যক্তিক এই বেদনা সবকিছু ছাপিয়ে সামষ্টিক উজ্জীবনকে আলিঙ্গন করেছে।

সখীনার বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন হলেও তার বিয়ে হয়নি। বিয়ে না হলেও আত্মিকভাবে সখীনার হবু স্বামী ও সখীনা খুব কাছাকাছি ছিল। ঘাতকের একটি গুলি সখীনার জীবনকে তছনছ করে দেয়। নিজের তছনছ হয়ে যাওয়া অতৃপ্ত জীবনের দুঃখ সে অন্যের জীবনকে সুখী করার মধ্য দিয়ে ভুলে যেতে চায়। তাই সাতাশ বছর পর মামাতো বোন দোলনের বিয়েতে এসে সখীনা তার জীবনের হারানো স্বপ্ন ও সুখ পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সখীনার সংলাপে দোলনের বিয়ে উপলক্ষ্যে তার এই ব্যস্ততার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: "ফুল পাতার মধ্যে বিয়ের কনে বসে থাকবে। দেখতেও সুখ, ভাবতেও আনন্দ। সুখ আনন্দ থই থই না করলে মানুষ বিয়ে করবে কেন শুনি? যাও আর দেরী করো না, ফর্দ মতো জিনিসগুলো নিয়ে এসো"(৪র্থ দৃশ্য, ১ম খণ্ড)। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে'- বাংলা এই প্রবাদের মতো যেমন-তেমন ভাবে দোলনের বিয়ে ও বিয়ের সাজ মেনে নিতে সখীনা নারাজ। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে করে এই অনুষ্ঠানের যথার্থতা প্রমাণ দিতে চায় সে।

সখীনা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের এক রক্তিম ইতিহাস। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সখীনারাই রক্তের আগুনে ছাই হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ এনেছিল। গায়ে হলুদ মেখে আর হাতকে মেহেদির লাল রঙে রাঙিয়ে সখীনা তার জীবনের নতুন স্বপ্নের জাল বুনেছিল। কিন্তু তার সেই মেহেদি রাঙা হাতের লাল রঙ গণগণ করে উঠে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করা হবু স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে। না দেখা ভালোবাসার মানুষকে আজীবন হৃদয়ের গভীরে পরম মমতায় আগলে রাখে সখীনা। দোলনকে সে করুণ স্বরে বলে:

> ও দোলন, আমার হলুদ মাখা গা আর মেহেদী রাঙা হাত তখন কেমন করছিল আজ আর নির্ভুল ভাবে বলতে পারব না। ওকে আমি কোনদিন চোখে দেখিনি, ওর শব্দ আমার কানে আসেনি। আমার কাছে ওর কোন দৃশ্য নেই, তবু তো সেই হচ্ছে আমার ভালোবাসার মিনার (৫ম দৃশ্য, ১ম খণ্ড)।

> ভাষা আন্দোলনে হবু স্বামীকে হারিয়ে সখীনার জীবনে যে অতৃপ্তির বেদনা বয়ে চলেছে সেই অতৃপ্তি থেকে সে বের হতে চায়। এই অতৃপ্তি থেকে বের হওয়ার উপায় সে আবিষ্কার করেছে দোলনকে কেন্দ্র করে। আর এটা সে করে দোলনকে বিয়ের সাজে পূর্ণতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে। দোলনের বিয়ের প্রস্তুতি যখন প্রায় শেষ তখন দোলনের হবু বর আনিসের পরিবার এই বিয়েতে বেঁকে বসে। কারণ, দোলনের পরিবার অস্বচ্ছল। এই সংবাদে সখীনা প্রচণ্ড রাগে টগবগ করে ফুটতে থাকে। নিজের বিয়ের সমস্ত গহনা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দোলনকে তার স্বামীর ঘরে পাঠাতে প্রাণপণে লড়ে যায় সখীনা। নিজের জীবনের করুণ বেদনার কথা স্মরণ করে সখীনা তার বড় মামাকে আশ্বাসের বাণী শোনায়। সখীনার সংলাপে তার দৃঢ় সংকল্প মূর্ত হয়ে ওঠেছে। বড়ো মামাকে সে বলে: "বড়ো মামা দোলন কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ছুটে গেল। আমি ওকে কাঁদতে দেব না বড়ো মামা- হলুদ মাখা মেয়েকে কাঁদতে হয় না" (৪র্থ দৃশ্য, ১ম খণ্ড)।
>
> বিয়ে বাড়ির উৎসবমুখর পরিবেশে সখীনার আশ্চর্য কর্মপটুতায় অবাক হয়ে যায় দোলনের হবু শ্বশুর অর্থাৎ আনিসের বাবা রহমত। তাই তিনি সখীনার বড়ো মামাকে লক্ষ্য করে সখীনা সম্পর্কে বলেন: "আপনার এই আশ্চর্য ভাগ্নীটির মগজে টিউমার আছে নাকি? রহস্যময়ী রমণী"(১০ম দৃশ্য, ১ম খণ্ড)। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা থেকে শুরু করে দোলনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা পর্যন্ত সখীনা হাসিমুখে সকল দায়িত্ব পালন করে গেছে। দোলন তার বাবার নিকট থেকে বিদায় নিতে গেলে সখীনার অতৃপ্ত হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। সাতাশ বছর আগে এমনি এক আনন্দঘন মুহূর্ত সখীনার জীবনে আসতে গিয়েও মাঝপথে থমকে দাঁড়ায়। তার জীবনের সেই আনন্দ নিরাশার গহীন বালুচরে আটকে যায়। সেই সব বেদনাময় স্মৃতি সখীনার হৃদয়ে আজও বহমান। বাবার কাছ থেকে দোলনের বিদায় মুহূর্তে সখীনা দোলনকে যা বলে তাতে জীবন সম্পর্কে সখীনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ব্যক্ত হয়। দোলনকে উদ্দেশ্য করে সখীনার সংলাপ: "খবরদার এক ফোঁটা পানি ফেলবি না। যতদিন বেঁচে থাকবি, শুধু হাসবি, হেসে হেসে দুনিয়াটাকে পাগল করে দিবি" (দ্বাদশ দৃশ্য, ১ম খণ্ড)।
>
> নিজের জীবনের সকল বেদনা চাপাতে সখীনা নিজেও সারাজীবন হেসে চলেছে।

নাটকের লালু মামারা দেশ মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করলেও দুর্জনদের ভীড়ে তাদের মতো দেশপ্রেমিকদের কোনো খোঁজ থাকে না। ভাষা আন্দোলনের গুলিতে লালু মামা একটা পায়ে আঘাত পায়। সেই পা নিয়েই বেঁচে আছে লালু মামা। লালু মামা নিজের জীবনের তোয়াক্কা করেনা কখনোই। কিন্তু নতুন প্রজন্ম নিয়ে তার অগাধ স্বপ্ন। এক পা হারিয়ে তার জীবনে যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে সেই অন্ধকার যেনো নতুন প্রজন্মের দোলন কিংবা অন্য কারও জীবনকে স্পর্শ করতে না পারে এটাই তার একান্ত চাওয়া। ভাইয়ের মেয়ে দোলনকে সে স্বপ্ন দেখায় সুস্থ ও সুন্দর জীবনের। জীবন সম্পর্কে লালু মামা দোলনকে আশার বাণী শোনায়:

> বুড়ি তোকে আমি কী দিয়ে আশীর্বাদ করবো, তোর লালকা তো খোঁড়া পায়ে হিমালয় লঙ্ঘন করতে অক্ষম। আমার দীনতার যদি সৌন্দর্য থাকত, আমি তোকে সেই সুখের সন্ধান দিতাম। বুড়ি, আমার পায়ে চলার পথটা অনেক দীর্ঘ। অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর- আমরা তো পেছনে পড়ে গেলাম, তোরা সুস্থ পায়ে হাঁটবি। জীবন, জীবন মানেই তো সমুদ্রের স্বাদ (৬ষ্ঠ দৃশ্য, ১ম খণ্ড)।

লালুদের জীবন গুলির আঘাতে থমকে গিয়েছিল। এই থমকে যাওয়া জীবনের আর কোনো নতুন রূপ কারও মধ্যে তারা দেখতে চায় না। কেননা, "বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে উঠে" (ভূঁইয়া, ২০০৫: ১৭৬)। তাই তাদের আকাঙ্ক্ষা নতুন প্রজন্মের দোলনরা যেনো সময়ের অন্ধকারে তলিয়ে না যায়। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির অন্ধকার থেকে নিজেদের রক্তের বিনিময়ে উত্তরণের মাধ্যমে বাঙালি আলোর সন্ধান পেয়েছিল। একুশের চেতনাকে নিজেদের অন্তরে ধারণ করে ও অধিকার সচেতন হয়ে দোলনরা যাতে সেই আলোয় আলোকিত হয়ে নতুন গতিতে জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে এটাই লালুদের একমাত্র প্রত্যাশা।

সখীনা চায় না তার মতো আর কোনো মেহেদি রাঙা হাত ও হলুদ মাখা শাড়ি পরা মেয়ে আজীবন অতৃপ্ত জীবনের বেদনা বয়ে বেড়াক। সে চায়না স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যাতনা নিয়ে কোনো মেয়ে বেঁচে থাকুক। তাই দোলনকে পরম মমতায় কাছে টেনে সে বোঝায়: "বিবাহ মানে জীবন বুঝলি। বিবাহ একটা মহা ঘটনারে মুখপুড়ি। এইটা না হইলে দুনিয়ার মানুষ মাইয়া মানষেরে পাগল কয়, পোড়াকপালি কয়" (৮ম দৃশ্য, ১ম খণ্ড)। সখীনার বিয়ে তার নিজের জীবনে বেদনার ছায়াপাত ঘটালেও দোলনকে দেয় নতুন জীবনের নির্যাস। সখীনার কারণে দোলন পায় বিবাহিত নতুন জীবনের রূপ, রস, গন্ধ আর স্পর্শ। পরের জীবনকে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দেয়া সখীনাদের বেঁচে থাকতে হয় ভালোবাসার মানুষকে না পাওয়ার তীব্র কষ্ট আর যাতনা নিয়েই। না পাওয়ার অতৃপ্ত হাহাকারকে সঙ্গী করে সখীনাদের সারাজীবন অতিবাহিত করতে হয়। বড়ো মামা সখীনার জীবনের অতৃপ্ত হাহাকার সম্পর্কে বলেন: "সখীনা মানে বাংলাদেশের বুক ভরা হাহাকার"(১০ম দৃশ্য, ১ম খণ্ড)। নিজের জীবনের হাহাকারকে সঙ্গী করে এই সখীনারাই সমাজকে সুখময় নতুন জীবনের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে। নিজের জীবনের অন্ধকারে থেকেই তারা আলোর সাধনা করে। এই আলো তাদের নিজের জন্য নয়, তারা তা বিলিয়ে দেয় অপরের জীবনকে আলোকিত করার অভিপ্রায়ে। আলোর জন্য জীবনব্যাপী সখীনাদের যে আরাধনা তা দেশের জন্য, শ্রেণি-বৈষম্যহীন একটি দেশের আপামর মানুষের জন্য। গ্রামের অতি সাদামাটা মেয়ে সখীনাকে লুপ্তপ্রায় জীবন থেকে বের করে বৃহত্তর উজ্জীবনের পথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গিয়ে তার হবু স্বামীর মৃত্যু। একটি মৃত্যু, ভাষার জন্য শহিদ হওয়া একটি প্রাণ একজন নারীকে প্রাতিস্বিক জীবন থেকে বের করে সামষ্টিক জীবনের কথা ভাবতে ও বলতে অনুপ্রাণিত করেছে। সখীনার এই উজ্জীবন

নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের সাথেই একীভূত। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্ন নিয়ে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসক চক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ধাপে ও স্তরে স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস (ভূঁইয়া, ২০০৫: ১৭৬)।

সখীনা নিজের জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে মামাতো বোন দোলনের জীবনকে সুখী করতে দিশেহারা। এভাবেই সখীনারা নিজেদের বঞ্চিত করে পরের জীবনের সুখ খুঁজে দিতে বদ্ধপরিকর। বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার সুখ তারাও খোঁজে। কখনো কখনো তাদের মাতৃহৃদয়ও পরম স্নেহে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই আবার নিজের সমাজের কথা ভেবে, দেশের চিন্তায় বিষণ্ন হয়ে নতুন প্রজন্মকে আশার আলো ও বাতিঘরের সন্ধান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কি চাহ শঙ্খচিল এর সাথে বিবাহ নাটকের যোগসূত্র স্থাপন করে বলেন:

> স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে কি চাহ শঙ্খচিলের বিষয় নির্ধারিত। বিবাহ নাটকের সখিনা এবং কি চাহ শঙ্খচিলের রৌশনআরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার এবং একাত্তরের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত তেমনি বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ (আহমদ, ১৯৮৫: ভূমিকাংশ)।

ভাষার জন্য আন্দোলন ও এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি অন্ধকারময় অধ্যায়ের সমাপ্তির পরপরই একের পর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের আগমন ঘটতে থাকে বাঙালির জীবনে। বীর বাঙালি প্রতিবারই একুশের চেতনায় ভাস্বর হয়েছে এবং দেশমাতৃকার প্রতি তাদের বিপুল ভালোবাসা সংবর্ধিত হয়েছে। ক্রমেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে সখীনার মতো হাজারো বাঙালি নতুন জীবন লাভ করে। অর্থাৎ মমতাজউদদীনের "বিবাহ নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় ভাষা আন্দোলন হলেও ইতিহাসের ক্রমধারায় তা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক কি চাহ শঙ্খচিল নাটকের সঙ্গে একীভূত ও একাত্ম" (ঘোষ, ২০০৯: ১৫০)। সখীনা তার শহিদ হওয়া হবু স্বামীর বেদনাময় স্মৃতি আঁকড়ে ধরে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে বেঁচে আছে। ভাষা শহিদদের ত্যাগ যেমন অনন্যতায় ভাস্বর, তেমনিভাবে সখীনার জীবনের এই ত্যাগও ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবেই বিবেচিত। সখীনার জীবনের এই ত্যাগই তার মধ্যে নব জীবনের চেতনা সঞ্চার করে তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপবিষ্ট করেছে।

**শেষকথা**

ভাষা আন্দোলনের অমর আয়োজনের শব্দছবি গাঁথা হয়েছে বিবাহ নাটকে। রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটি পরিবারের ত্যাগ শিকারের মধ্য দিয়ে এই নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে সখীনার হবু স্বামীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু একটি ঘটনা মাত্র নয়। কেননা, এই মৃত্যু সখীনা, সখীনার বাবা ও লালু মামার হৃদয়ে নতুন চেতনা সঞ্চার করেছে। এই চেতনা বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের চেতনাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছে সখীনার মতো অসংখ্য দেশপ্রেমিক। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করেছে তাঁরা। এই নাটকটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এই ঐক্যের কথা ও প্রতিবাদী উচ্চারণ সখীনার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। সখীনার ব্যক্তিক বেদনা ছাপিয়ে তার উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ও মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সখীনার হবু স্বামীর মৃত্যু কেবল সখীনাকেই নয় তার পিতাকেও নিয়ে গেছে বৃহত্তর উজ্জীবনের পথে। ব্যক্তিক বেদনা অতিক্রম করে তাদের সংলাপে শোভিত হয়েছে সামষ্টিক উজ্জীবনের কথা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে ঘিরে সখীনার মর্মভেদী মনঃকষ্টের উষ্ণতা এবং তার উজ্জীবনী কণ্ঠস্বর এই নাটকটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে।

## তথ্য-নির্দেশ


আহমদ, মমতাজ উদদীন.। (২০১২)। বিবাহ । বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মোবারক হোসেন (সম্পা.), *একুশের সাহিত্য: নাটক* । বাংলা একাডেমি: ঢাকা। (উক্ত সংস্করণ থেকে বর্তমান প্রবন্ধে ‘বিবাহ’নাটকের প্রয়োজনীয় সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

আহমদ, মমতাজ উদদীন.। (২০০০)। ‘তথাপি নাটক’। মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পা.), *আমার নাট্য ভাবনা* (২৮৫-২৮৮)। বিশ্বসাহিত্য ভবন: ঢাকা।

আহমদ, মমতাজ উদদীন.। (১৯৮৫)। *বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল* । বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

ইসলাম, মো. রি.। (২০১৩)। ‘সখীনার অতৃপ্ত হৃদয়ের হাহাকার: প্রসঙ্গ বিবাহ নাটক’। *রবীন্দ্র জার্নাল*, ১৭, ৫১-৫৭।

উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল প্রকাশনী: ঢাকা।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৬৩)। *ভারত-সংস্কৃতি*। কলকাতা।

ছালাম, আ.। (২০১৯)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। দি রয়েল পাবলিশার্স: ঢাকা।

ভূঁইয়া, ড. মো. আ. ও.। (২০০৫)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*। আজিজিয়া বুক ডিপো: ঢাকা।

রশীদ, মা.। (২০০০)। ‘একটু থামুন না’। মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পা.), *আমার নাট্য ভাবনা* (৬৮৯-৬৯১)। বিশ্বসাহিত্য ভবন: ঢাকা।

সেন, সুকুমার। (১৯৭৪)। *বঙ্গভূমিকা*। কলকাতা।

হক, আ.। (১৯৭৬)। *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*। মুক্তধারা: ঢাকা।

হান্নান, মো.। (২০১২)। *বাঙালির ইতিহাস*। আগামী প্রকাশনী: ঢাকা।

হাসান, জি.। (২০০০)। 'আমার অনুসরণ'। মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পা.), *আমার নাট্য ভাবনা* (৬৭৩-৬৭৬)। বিশ্বসাহিত্য ভবন: ঢাকা।

# গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের ব্যাকরণচর্চা

তিথি বালা*

**Abstract:** Gurunath Sengupta (1847-1914) made a great contribution to Bengali grammar in the 19th century. The publications of three grammar books named '*Vyakaran Sopan'* (1895), '*Sukhbodham Vyakaran'* (1897) and '*Laghu Sukhbodham Vyakaran'* (1902) was very important works. Although over 130 years have passed since the publication of his grammar books, there has been no discussion or criticism of them anywhere except his biography. All three books were approved by the Education Board as textbooks at that time. This article discusses the identity and contribution of these three books and the grammarian Gurunath Sengupta. He was the headmaster of Kolkata Ahiritola Banga Vidyalaya, when great Ishwarchandra Vidyasagar (1820-1891) was the president of this school, although Vidyasagar had an idea about the grammar books written by Gurunath, he remained neglected as a grammarian. The article lightendend the identity and contribution of Gurunath Sengupta as a Gramarrian.

**মূলশব্দ (Keyword):** ভাষা (Language), ব্যাকরণ (Grammar), বৈয়াকরণ (Grammarian), ব্যাকরণ সোপান (Ladder of Grammar), সুখবোধং ব্যাকরণ (Happiness of Grammar), লঘু সুখবোধং ব্যাকরণ (Light Happiness of Grammar)

## ভূমিকা

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পাণিনির (আনু. খ্রি.পূ. পঞ্চম শতক) অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রের সংক্ষিপ্ত রূপান্তরই বেশি জনপ্রিয় ছিল ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে অষ্টাধ্যায়ীর রূপান্তরগুলোর মধ্যে কাতন্ত্র (=ক্ষুদ্র তন্ত্র বা গ্রন্থ), বোপদেবের মুগ্ধবোধব্যাকরণ (মুগ্ধবোধ= মুগ্ধ অর্থাৎ

* তিথি বালা, পিএইচডি গবেষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ইমেইল: tithibala2014@gmail.com

মূঢ় বা অল্পজ্ঞদের বোধের নিমিত্ত রচিত ব্যাকরণ) এবং ক্রমদীশ্বরের (১৩শ শতক) সংক্ষিপ্তসার ও মহারাজ জুমরনন্দীকৃত (১৪শ শতক) এর বৃত্তি রসবতী বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালির ব্যাকরণচর্চা বলতে মোটামুটি এ ধরনের টীকাভাষ্য রচনাই বোঝায়। (বাংলাপিডিয়া) এসব রচনার কাজ সপ্তম শতকের দিকে শুরু হয়ে আধুনিক কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *'ব্যাকরণকৌমুদী'* (১৮৫৩), গুরুনাথ সেনগুপ্তের *'ব্যাকরণ সোপান'* (১৮৯৫), চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের *'কাতন্ত্রছন্দঃপ্রক্রিয়া'* (১৮৯৬) প্রভৃতি ব্যাকরণ-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এই চর্চা অগ্রসর হয়েছে।

এরকম প্রয়োজনের তাগিদেই পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) পর্তুগিজ ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০)। যা 'হ্যালহেডের ব্যাকরণ' নামেই পরিচিত। এদের পরে ব্যাকরণ রচনায় এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রামমোহন রায় এই দুই ধারার ব্যাকরণ রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি বিদেশি বা টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মতো বাংলা-সংস্কৃতের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথমেই রচিত হয় উইলিয়াম কেরির বাংলা ব্যাকরণ *A Grammar of the Bengali Language* (১৮০১)। হ্যালহেডের ব্যাকরণের অনুকরণে রচিত হলেও বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ বা পার্টিকেল ব্যবহারের ক্ষেত্র নিয়ে কেরি বিশেষ আলোচনা করেছেন।

বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় রাধাকান্ত দেবের বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮২১)। এটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নয়, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে বাংলা বর্ণমালা, বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও সংখ্যা, শব্দ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এতে বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলোই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে বাঙলা শিক্ষাগ্রন্থে লেখক উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহনের। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করেন, যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর বাংলায় রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থের মধ্যে গোপালচন্দ্র চূড়ামণির *ব্যাকরণ সংগ্রহ* (১৮৩৬), তারকনাথ রায়ের *ব্যাকরণ সার* (প্রকাশকাল অনুল্লিখিত) এবং পূর্ণচন্দ্র দে'র *ব্যাকরণ* (১৮৩৯) উল্লেখযোগ্য। [বাংলাপিডিয়া] গুরুনাথ সেনগুপ্তের আগে আরও যাঁরা বাংলা ভাষায় ব্যবরণ রচনা করেন, তাঁরা হলেন ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ (*সাধু ভাষার ব্যাকরণসার সংগ্রহ*, ১৮৪০), ব্রজকিশোর গুপ্ত (*বঙ্গভাষা ব্যাকরণ*, ১৮৪০), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (শিশুসেবধি, ১৮৪০), ক্ষেত্রমোহন দত্ত *(গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, ১৮৪১) এবং জন রবিনসন (বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও ধাতু সংগ্রহ, ১৮৪৬) প্রমুখ

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্যাকরণের ইতিহাসে গুরুনাথ সেনগুপ্ত উনিশ শতকের মধ্যে তিনখানা ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচনা করেও তাঁর নাম বৈয়াকরণ হিসেবে বিদগ্ধজনের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। তাই গুরুনাথ ও তাঁর ব্যবকরণচর্চা নিয়ে আলোচনার করা যেতে পারে।

**গুরুনাথ-পরিচয়**

বাংলা ব্যাকরণচর্চায় পথপ্রদর্শকদের মধ্যে গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন (১৮৪৭-১৯১৪) এক উপেক্ষিত নাম। ব্যাকরণচর্চার ইতিহাসে তাঁর অবদানকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর গ্রন্থাবলি অপ্রকাশিত থাকা এবং স্বল্পপ্রচারের সীমাবদ্ধতার কারণে এই বিপর্যয় ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে তাঁর অবদানকে তুলে আনার প্রবল প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলাধীন বেন্দা গ্রামে গুরুনাথ সেনগুপ্তের জন্ম। গুরুনাথ-জীবনীকার ভুবনমোহন গাঙ্গুলীর তথ্যমতে তাঁর জন্মতারিখ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার। বাবা রামনাথ সেনগুপ্ত, মা গৌরীদেবী।

পাঁচ বছর বয়সে (১৮৫২ সালে) গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুনাথের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। শিক্ষক কালাচাঁদ সরকারের কাছে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার হাতেখড়ি। ছোটোবেলা থেকেই গুরুনাথ পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র লেখার রীতি অর্থাৎ কেতাবতি শিখতে শুরু করেন। পাঠশালা ও কেতাবতির পাঠ শেষ করে গুরুনাথ ভর্তি হন বেন্দা সার্কেল স্কুলে। এই স্কুলে মাস কয়েক পড়ার পর তিনি গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত টোলে কলাপ ব্যাকরণ পড়তে শুরু করেন। বেন্দার এই টোলটি এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। গুরুনাথ তখন মামাবাড়িতে বরিশালের অন্তঃপাতী কীর্তিপাশা রজনী পদরত্ন মহাশয়ের টোলে ভর্তি হন। পরে কিছুদিন খলিশাকোটায় জগচ্চন্দ্র কবিভূষণ মহাশয়ের টোলেও পড়াশুনা করেন। এ-সময়ে তাঁর মামা কাশীশচন্দ্র সেন একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। গুরুনাথ সেনগুপ্তের পড়ালেখা এতে প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকে।

গুরুনাথ ষোলো বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং বেন্দা সার্কেল স্কুলে আবার ভর্তি হন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ-স্কুলের পড়া শেষে তিনি কলকাতার নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করায় তিনি মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ছয় টাকা হারে বৃত্তি পান। বৃত্তির টাকা দিয়েই তিনি পড়ালেখার খরচ চালাতেন। স্কুলে পড়াকালীন তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন।

১৮৬৭ সালে তিনি নর্মাল স্কুলে ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য গুরুনাথ সেনগুপ্তকে তাঁর দুই শিক্ষক রাজকুমার ন্যায়রত্ন ও মধুসূদন বাচস্পতি ‘কবিরত্ন’ উপাধি প্রদান করেন। সেই সময়ে নর্মাল স্কুল পাস করাই ছিল এক বিরাট কৃতিত্ব। তার পাশাপাশি ‘কবিরত্ন’ উপাধি নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়।

রাজকুমার ন্যায়রত্ন যে উপাধি-স্মারক দিয়েছিলেন সেটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল। যার বাংলা ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়–

> আমার ছাত্র শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত। ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখে আনন্দিত হয়ে আমি শ্রীরাজকুমার ন্যায়রত্ন সকলের অবগতির জন্য তোমাকে কবিরত্ন উপাধি দিচ্ছি। তুমি এই উপাধির যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রের উন্নতির জন্য তুমি যত্নবান হও– এই প্রার্থনা করি (বালা, ২০২৪: ১৯)।

মধুসূদন বাচস্পতির প্রশংসাপত্রও সংস্কৃতে লেখা। যার ভাবানুবাদ এরকম–

> আমার শিষ্য শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত। তুমি কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি ব্যাকরণ, কালিদাস-ভবভূতি-মাঘ-ভারবি-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষ ও কাব্য এবং ছন্দ-অলঙ্কার-গণিত-কোষ-পুরাণ-ইতিহাস-উপনিষৎ-তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ। সেকারণে আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিচ্ছি। নর্মাল স্কুল পাস করার পর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এক প্রকার শেষ হয়ে যায় (বালা, ২০২৪: ১৯)।

১৮৬৮ সালে ২১ বছর বয়সে গুরুনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে আদরমণি দেবীর বিয়ে হয়। ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এটি ছিল দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। এখনকার বিবেচনায় এটি সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ। স্কুলটি কলকাতা হাইকোর্টেও তৎকালীন অ্যাটর্নি, পরে বিচারপতি রমানাথ লাহা প্রমুখের উদ্যোগে ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণিত শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেও গুরুনাথ বাংলা ও ইতিহাসও পড়াতেন। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বরে তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় ৩৩ বছর একই স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯০০ সালে তিনি অবসর নেন। এই স্কুলেই কেটে যায় তাঁর গোটা কর্মজীবন। একজন সফল শিক্ষক হিসেবে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। ১৮৯১ সালে এই স্কুলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। ১৮৯৭-৯৮ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন কলকাতা মেডিকেল কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী রায়বাহাদুর কানাইলাল দে (১৮৩১-১৮৯৯)।

ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি গুরুনাথের আকর্ষণ ছিল। তিনি সাধনা-উপাসনার দ্বারা নিজের আত্মিক উন্নতি করেন এবং সত্যধর্ম নামে একটি নতুন ধর্মমতের আবিষ্কার করেন। সত্যধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার গোয়ালগ্রাম। এইগ্রামে মহাত্মা বিনোদবিহারী বালার বাসভবনে তিনি পরলোকগমন করেন ১৯১৪ সালের ১৬ই মে।

**গবেষণা প্রশ্ন**

আলোচ্য প্রবন্ধে গবেষণা প্রশ্ন হলো--

১. ব্যাকরণচর্চায় গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবদান কী?

২. গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচর্চার গুরুত্ব কী?

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

এই গবেষণায় মূল উদ্দেশ্য দুটি–

১. উনিশ শতকের একজন উপেক্ষিত বৈয়াকরণ গুরুনাথ সেনগুপ্তের পরিচয় উদঘাটন;

২. গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণর-গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ।

**সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা**

গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণ রচনার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র তিনটি গ্রন্থ। ভুবনমোহন গাঙ্গুলী রচিত *‘সত্যধর্ম প্রচারক দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ’* (সত্যধর্ম মহামণ্ডল, গোপালগঞ্জ, ১৯৪৯) গ্রন্থে গুরুনাথ-রচিত ৩টি ব্যাকরণ-গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত প্রকাশনাতথ্য প্রদানই এই গ্রন্থের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থটি ২০২১ সালে সত্য ও শান্তিকেন্দ্র, গোপালগঞ্জ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। ওই তিনটি গ্রন্থের বিশদ পরিচয়ও তিনি লিপিবদ্ধ করেননি। জীবনীকার জানিয়েছেন, ‘একসময় ইহা প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। এবং এই গ্রন্থখানি রচনা করিতে যাইয়া মহাত্মা গুরুনাথ তদীয় পাণ্ডিত্য ও শ্রমশীলতার যে পরিচয় তৎকালীন বুধমণ্ডলীর কাছে দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। (ভুবনমোহন, ২০২১: ১৪৩) কিন্তু এরপরে গুরুনাথের ব্যাকরণ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায় না। গুরুনাথের দ্বিতীয় জীবনীকার দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাসের *‘মহাত্মা গুরুনাথ’* (মহাত্মা আদরমণি সমিতি, কলকাতা, ২০০১) গ্রন্থেও একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তৃতীয় জীবনীকার তিথি বালা বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন’ (বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০২৪) ব্যাকরণ-গ্রন্থত্রয়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন মাত্র। বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস-জাতীয় গ্রন্থেও বৈয়াকরণ গুরুনাথের পরিচয় অনুপস্থিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ড. তন্ময় সরকারের পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ‘আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্তের ধর্মচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ’ (২০২০) শীর্ষক অভিসন্দর্ভে তাঁর বৈয়াকরণ পরিচয়টি গুরত্বের সঙ্গে উল্লেখিত হয়নি। কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল বহুমুখী গুরুনাথের দার্শনিকতা নিরূপণে। সঙ্গত কারণেই ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনায় তিনি মনোযোগী হননি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিভাগে ড. জুয়েলী বিশ্বাসের ‘গুরুনাথ সেনগুপ্ত: জীবন ও ধর্মদর্শন’ (২০১২) শীর্ষক

পিএইচডি অভিসন্দর্ভে ব্যাকরণ-গ্রন্থ সম্পর্কে বিশেষ কোনো মন্তব্য নেই। গুরুনাথের জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ব্যাকরণচর্চার পরিচয় ও মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল। এইসব গ্রন্থ পাঠ করে আমাদেও মনে হয়েছে গুরুনাথের ব্যাকণচর্চা নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

**গবেষণার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা**

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণচর্চার ইতিহাসে গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবদান তুলনামূলকভাবে স্বল্প আলোচিত। বিদ্যমান গবেষণায় তাঁর সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিষয়ক ভূমিকার কিছু উল্লেখ থাকলেও, ব্যাকরণচর্চায় তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রয়োগ এখনো সম্যকভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। এই গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় প্রয়াস।

প্রথমত, এই গবেষণা বাংলা ব্যাকরণচর্চার ইতিহাসে গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে। তাঁর ব্যাকরণ-ভাবনাকে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাদর্শ ও ভাষা-ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণচর্চার বিকাশধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অবহেলিত অধ্যায় উন্মোচিত হবে। ফলে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণচর্চার ইতিহাস অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক স্তরের ভাষাশিক্ষায় ব্যাকরণের ভূমিকা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে এই গবেষণা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। গুরুনাথ সেনগুপ্ত ব্যাকরণকে যেভাবে শিশুবান্ধব, ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে উপস্থাপন করেছেন, তা সমকালীন ভাষা-শিক্ষা তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গবেষণার ফলাফল আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতিগত সংস্কারে তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

তৃতীয়ত, এই গবেষণা বাংলা ব্যাকরণচর্চার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাজন দূর করার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচিন্তায় শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা ও বাস্তব ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এই সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষাকে কেবল নিয়মনির্ভর অনুশীলন থেকে বের করে এনে ভাষাবোধ-নির্ভর শিক্ষায় রূপান্তরের পথ নির্দেশ করে।

চতুর্থত, গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচর্চা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় শিশুশিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও ব্যাকরণ শিক্ষার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে। এর ফলে বাংলা শিক্ষাবিদ্যা (Pedagogy) ও ভাষাতত্ত্বের মধ্যকার সংযোগ আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণা কেবল গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবদানকে

পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রচেষ্টা নয়; বরং বাংলা ব্যাকরণচর্চা ও প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাংলা ভাষা ও শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে এই গবেষণা একটি প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী ও মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

## গবেষণা-পদ্ধতি

এই গবেষণাটি গুণাত্মক এবং বিবরণধর্মী। এতে মূলত দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

১. সাহিত্য পর্যালোচনা পদ্ধতি: গুরুনাথ সেনগুপ্তের জীবনী-পর্যালোচানা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি: ইতোপূর্বে রচিত ব্যাকরণ-গ্রন্থের রচনাকাল ও পরিধি বিবেচনায় নিয়ে গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

## পর্যালোচনা ও গবেষণার ফল

উনিশ শতকের মধ্যভাগে জন্ম নিয়ে গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংগীত, সাময়িকপত্র সম্পাদনা, দর্শন ও ধর্ম চর্চায় এক নতুন দিগন্তের দিশারী হয়ে ওঠেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি গুরুনাথ সেনগুপ্তের সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত হয় ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে। শিক্ষা-সহায়ক পুস্তিকা হিসেবে সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত (ধারাপাত), ভূগোল, ইতিহাস, শরীরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ই তাঁর লেখনীর আওতায় এসেছে। এ-ধরনের ৩২টি পুস্তিকার নামগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে– (১) সাহিত্য প্রশ্নোত্তর, (২) রামচরিতের সুচারু ব্যাখ্যা, (৩) সাহিত্যশিক্ষার অর্থ পুস্তক, (৪) সাহিত্য কুসুমের সুচারু ব্যাখ্যা (৫) প্রবন্ধমালার সুচারু ব্যাখ্যা, (৬) নৃসিংহবাবুর প্রাকৃত ভূগোলের প্রশ্নোত্তর, (৭) সরল পদার্থবিজ্ঞান ১ম ভাগ, (৮) ধারাপাত, (৯) পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর, (১০) ব্যাকরণ, (১১) পদ্যপাঠ ৩য় ভাগের সার্থক অন্বয় সংস্করণ ও রচনা, (১২) চারুবোধ সুচারু ব্যাখ্যা, (১৩) চারুপ্রবন্ধের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৪) চারুপাঠ ৩য় ভাগের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৫) রামের রাজ্যপ্রাপ্তি পুস্তকের সুচারু ব্যাখ্যা, (১৬) কবিতা কুসুমাঞ্জলীর সুচারু ব্যাখ্যা, (১৭) ভূবিদ্যার প্রশ্নোত্তর, (১৮) আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগের ব্যাখ্যা, (১৯) আখ্যান-মঞ্জরী ৩য় ভাগের সুচারু ব্যাখ্যা, (২০) নীতিপাঠের সুচারুব্যাখ্যা, (২১) সরল পদার্থবিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর, (২২) ১৮৯১ সালের সংস্কৃত এন্ট্রান্স কোর্সের ব্যাখ্যা, (২৩) স্বাস্থ্যরক্ষার প্রশ্নোত্তর, (২৪) শরীর পালনের প্রশ্নোত্তর, (২৫) স্বাস্থ্যবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, (২৬) স্বাস্থ্যোপায়, (২৭) সীতার বনবাসের ব্যাখ্যা, (২৮) বিজ্ঞান রহস্যের প্রশ্নোত্তর, (২৯) প্রবন্ধ কুসুমের সুচারুব্যাখ্যা, (৩০) বিজ্ঞান-সূত্রের প্রশ্নোত্তর, (৩১) বৃহৎ ব্যাকরণ, (৩২) প্রকৃতি জিজ্ঞাসার প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভুবনমোহন গাঙ্গুলী, ২০২১: ৯১)

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় গুরুনাথ সেনগুপ্ত বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, টিকাগ্রন্থ, ভাষ্যগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ, বিদ্যালয়-পাঠ্যবই, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি রচনা করেছেন। গুরুনাথ সেনগুপ্তের সকল রচনা খুঁজে পাওয়া গেলে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য নিঃসন্দেহে বহুগুণে সমৃদ্ধ হতো।

তিনি বাংলা ভাষায় ৩টি ব্যাকরণ রচনার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেছেন। এগুলো হলো- (১) কৌমার ব্যাকরণ, (২) গণরত্নম্, (৩) পানিনিসারঃ, (৪) চতুষ্টয়াবৃত্তিঃ, (৫) আখ্যাতবৃত্তিঃ, (৬) কৌমার সঞ্জীবনী (সর্ববর্ম্মার গুরুবৃত্তির বিংশ সুত্র পর্যন্ত ভাষ্য), (৭) বৈদিক ব্যাকরণম্, (৮) ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, (৯) গুরুবৃত্তিঃ (কলাপ ব্যাকরণের বৃত্তি) (১০) শ্লোকবদ্ধ ব্যাকরণ কারিকা (১১) ভ্রমভ্রমণম্ (১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত ) প্রভৃতি। গবেষক দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস জানিয়েছেন যে গুরুনাথ সেনগুপ্ত বৈয়ারকণ ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'র ব্যাখ্যা (বিশ্বাস, ২০০১: ২৪৬) করেছেন। এটি সংস্কৃত ব্যাকরণ বই। 'ব্যাকরণ সোপান' বাংলা ভাষায় রচিত গুরুনাথ সেনগুপ্তের প্রথম গ্রন্থ। গুরুনাথের ভাষায় এটি 'প্রথম শিক্ষোপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। সেসময়ে প্রথম পাঠ বলতে এখনকার প্রাথমিক স্তর বোঝানো হতো। এটি তিনি 'অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের' জন্য প্রণয়ণ করেছিলেন। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন–

> অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের ব্যাকরণ-শিক্ষার্থ যে প্রণালী অবলম্বন, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সুদীর্ঘকাল বোধ করিয়া আসিয়াছি এবং যে প্রণালীর সারবত্তা, আমার শতাব্দী-পাদাধিক কাল-ব্যাপী শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান ও পরীক্ষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্রাকার ব্যাকরণে তাহাই অবলম্বিত হয়েছে (সেনগুপ্ত, ২০২২: বিজ্ঞাপন)।

সংজ্ঞা লেখার দুটি পদ্ধতি রয়েছে– গুণানুযায়ী, দৃষ্টান্তানুযায়ী। মহামহোপাধ্যায় সর্ববর্মা প্রণীত 'কাতন্ত্র' বা কলাপ ব্যাকরণে এবং মহামতি বোপদেব লিখিত ব্যাকরণসমূহে দৃষ্টান্তানুযায়ী বা উদাহরণের সাহায্যে সংজ্ঞার পদ্ধতি রয়েছে। গুরুনাথও এই বইয়ে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। কোমলমতি শিশুরা উদাহরণের সাহায্যে যে কোনো বিষয় সহজেই বুঝতে পারে। সহজবোধ্য এবং শিখন-স্থায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করে গুরুনাথ শিশুপাঠ্য এই বইটিতে উদাহরণের সাহায্যে সংজ্ঞার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তবে তিনি গুণানুযায়ী পদ্ধতিকে একেবারে বাদ দেননি।

বইটিতে যেসব বিষয় রয়েছে–বর্ণ, পদ, লিঙ্গ, পুরুষ, বিভক্তি, বচন, শব্দরূপ, উদ্দেশ্য ও বিধেয়, কাল, ণিজন্ত, কারক, সমাস, প্রত্যয়, সন্ধি, ণত্ব-ষত্ব বিধান, বাচ্য, সমাস, কারক। বর্ণের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুনাথ স্বরবর্ণগুলিকে একত্র করে অ-ঔ পর্যন্ত বর্ণগুলিকে স্বরবর্ণ বলেছেন। ক-ঁ পর্যন্ত বর্ণসমূহকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলেছেন। পদের সংজ্ঞা দেবার ক্ষেত্রেও তিনি লিখেছেন–

> রাম ভাল আছেন। এই একটী বাক্য। এই বাক্যে (১) রাম, (২) ভাল, (৩) আছেন, এই তিনটী পদ। এইরূপ– ঈশ্বর পরম দয়ালু। এই বাক্যেও তিনটি পদ আছে। যথা– (১) ঈশ্বর, (২) পরম, (৩) দয়ালু। অতএব ঐরূপ এক একটি কথার নাম পদ (সেনগুপ্ত: ২০২২: ০৫)।

বিশেষণের সংজ্ঞায় গুরুনাথ লিখেছেন–

> যদ্দ্বারা বিশেষ করা হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে। উত্তম বালক। এখানে উত্তম, মধ্যম ও অধম নানারূপ বালকের মধ্যে যেটি ভাল তাহাকে উত্তম পদদ্বরা বিশেষ করা হইল, এজন্য উত্তম বিশেষণ পদ। আর বালকের বিশেষ করা হইল এজন্য বালক বিশেষ্য (সেনগুপ্ত: ২০২২: ১০)।

উপর্যুক্ত বিষয় দুটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে ব্যাকরণের মতো কঠিন বিষয়কেও শিশুদের কাছে গুরুনাথ সেনগুপ্ত কত সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'ব্যাকরণ সোপান' অর্থাৎ ব্যাকরণের সিঁড়ি অর্থাৎ ব্যাকরণ শেখার সিঁড়ি। গুরুনাথ সেনগুপ্ত বইটির বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একবারেই প্রাথমিক ধাপ অবলম্বন করেছেন যা আঠারো শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপাদেয় ও সহজবোধ্য।

'লঘু-সুখবোধ ব্যাকরণ' গ্রন্থখানি গুরুনাথ সেনগুপ্ত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে নিজেই প্রথম প্রকাশ করেন এবং ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই বইটি সেসময়ে সেন্ট্রাল টেকস্টবুক কমিটির অনুমদিত ও ডিরেক্টর কর্তৃক পাঠ্যতালিকাভুক্ত। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন--

> ইহাতে এন্ট্র্যান্স স্কুলের ৫ম ও ৪র্থ শ্রেণীর বালকগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সুখবোধ ব্যাকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এন্ট্র্যান্স স্কুলের তৃ তীয় শ্রেণীর বালকগণ এইখানি ও সুখবোধের দ্বিতীয়ভাগের ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা জানিতে পারিবেন (সেনগুপ্ত: ২০২২: বিজ্ঞাপন)।

এই গ্রন্থে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বাক্য সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার পদ্ধতি সন্নিবেশিত হয়েছে। পরীক্ষায় আসার উপযোগী বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে এই বইয়ে। এছাড়া বইয়ের শেষে দেবনাগরী বর্ণমালা এবং বাংলাভাষার সূত্রগুলো হুবহু সংস্কৃতসূত্রে লেখা হয়েছে। অনুবাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে লেখক এই বইয়ে সকল শব্দ ও ধাতুর বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থ সংযোজন করেছেন।

গ্রন্থটির সূচিপত্রে দেখা যায়, এটাতে অল্প কিছু বিষয় বাংলা ভাষার এবং বেশিরভাগ বিষয় সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রয়েছে। এতে রয়েছে– বর্ণ প্রকরণ, স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধি, সংজ্ঞা, ণত্বপ্রকরণ, ষত্বপ্রকরণ, স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সাধন, স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সাধন, স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সাধন, ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সাধন, ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সাধন,

ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ সাধন, সর্বনাম শব্দ সাধন, সংখ্যাবাচক শব্দ সাধন, অব্যয় শব্দ সাধন, শব্দ বিভক্তি, স্বরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপ, প্রশ্নাবলি, স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপ, স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপ, মন্তব্য ও প্রশ্নাবলি, ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দরূপ, সর্বনাম শব্দরূপ, সংখ্যাবাচক শব্দরূপ, পূরণবাচক শব্দ, অব্যয় শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিভক্তি নির্ণয়, কারক প্রকরণ, সমাস প্রকরণ, তদ্ধিত প্রকরণ, ধাতু প্রকরণ, ধাতু বিভক্তির আকার, কতিপয় সাধারণ নিয়ম, সকর্মক সেব্ ধাতু, চুরাদি, দিবাদি, তুদাদি, নানাগণীয় কতিপয় ধাতু, তনাদি, ক্র্যাদি, স্বাদি, রুধাদি, অদাদি, হ্বাদি, ভবিষ্যৎ কাল, অতীত কালের অন্যান্য কথা, লিট, ণিজন্ত বা ণ্যন্ত ধাতু, সনন্ত, যঙন্ত, যঙলুগন্ত, নাম ধাতু, কৃৎ, পদ পরিবর্তন, বাচ্য পরিবর্তন, লিঙ্গ ভেদ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, লিঙ্গবচন, স্ত্রীলিঙ্গে রূপ পরিবর্তন, অনুবাদ, বাঙলা বিভক্তি, সংস্কৃত মূল শব্দ, পদের অনুবাদ, বিশেষ্য বিশেষণ, অব্যয়ের প্রয়োগ প্রভৃতি, বাক্যের অনুবাদ, ইংরেজির সংস্কৃত অনুবাদ, অনুবাদ বিষয়ক উদাহরণ (১ম-৮ম), বিবিধ প্রশ্নোত্তর, দেবনাগরী বর্ণপরিচয়, দেবনাগরী অক্ষরে কতিপয় পদ, কতিপয় বাক্য।

লেখক বর্ণ প্রকরণ থেকে কারক পর্যন্ত ২১৫ সংখ্যক ক্রমিক বিষয়ের শিরোনাম-সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা, উদাহরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর দশ রকম শ্রেণি বিভাজন– ভ্বাদি, চুরাদি, দিবাদি, তুদাদি, তনাদি, ক্র্যাদি, স্বাদি, রুধাদি, অদাদি, হ্বাদি তিনি বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটিতে ল-কারের পরিবর্তন পরস্মৈ এবং আত্মোনেপদ উভয় প্রকার বিভক্তিতে প্রথম, মধ্যম এবং উত্তম পুরুষে পরিবর্তন সন্নিবেশিত হয়েছে। লিঙ্গের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং পরিবর্তনের নিয়মসমূহ এখানে সূচারুরূপে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা থেকে সংস্কৃত ভাষায় পদের অনুবাদ রয়েছে, ইংরেজি শব্দ থেকে সংস্কৃত শব্দে অনুবাদ আছে। বাংলা থেকে সংস্কৃত ভাষায় বাক্যান্তর রয়েছে। কিছু অনুশীলনী রয়েছে। বইটির শেষের দিকে লেখক দেবনাগরী বর্ণমালা সংযুক্ত করেছেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বইটির প্রথম প্রকাশ হয়। সেসময়ের বিবেচনায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটি খুবই উপযোগী ছিল।

'সুখবোধং ব্যাকরণম্' গ্রন্থখানি গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক লিখিত বাংলা বর্ণমালায় আপাদমস্তক একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে (সেনগুপ্ত, ২০২২: মুদ্রাকর পৃষ্ঠা)। এই বইটি সেসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনীত হয়েছিল। এ বইটি সে-সময়কার বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে অনেক প্রশংসা পেয়েছে। তার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরছি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যপক পণ্ডিত ব্যক্তি গোবিন্দ শাস্ত্রী ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় এই ব্যাকরণ গ্রন্থখানির একটি প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন যার বাংলা অনুবাদ করলে এমন দাঁড়ায়–

> আমি এই গ্রন্থপাঠে বিশেষতঃ এর সরলতা ও দোষবিরলতার জন্য সবিশেষ মনঃপ্রীতি অনুভব করেছি। যারা কেবল দোষদর্শী, তারা ক্রমাগত গমনকারীর

পদস্খলনবৎ কোনও কোনও স্থানে দোষ দেখতে পেলেও আমি সম্যগরূপে বিবেচনা করি যে, এই সুখবোধ সর্বপ্রকারে উপাদেয় হয়েছে (বালা, ২০০৪: ১২০)।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক, রিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, এন্ট্রান্স হতে ষ্টুডেন্টসিপ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের পরীক্ষক, বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখেছেন–

> Pandit Gurunath's Sanskrit Grammar called Sukhabodha contains a great deal of information on the subject. It is evident that the author has taken very great pains in compiling this book and I am of opinion that the study of it would be of immense good to students who take up sanskrit for their second language in the University examinations. (Sd) Krishnakamal Bhattacharyya (Principal, Ripon College, 15-8-98, উদ্ধৃত গাঙ্গুলী, ২০২১: ১৪৪)

> CALCUTA GAZETTE 5th October, 1898.

> Sukhabodham Vyakaranam by Gurunath Sen Gupta- Elements of Sanskrit Grammar containing rules in sanskrit and explanations in Sanskrit and Bengali. It seems to be one of the best books of its kind. The author possesses a thorough knowledge of the subject he treats of.

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বলেছেন–

> Pandit Gurunath Sen Gupta Kabiratna has been known to me. He is well grounded in Sanskrit Grammar and Litera- ture, the proof of which he has given by a Sanskrit Grammar of his own composition. This Grammar is a comprehensive Sanskrit Grammar embodying sanskrit Sutras based on the Katantra, Sripati Datta's Parisista and astadhyai (Panini). I can say with confidence that this Sanskrit Grammar is an excellent production deserving encouragement from the Sanskrit Knowing public.

(Sd.) Kali Prasanna Bhattacharyya. Professor of Sanskrit, Presidency College. (পণ্ডিত গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন বহুকাল অবধি আমার পরিচিত। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সবিশেষ বুৎপন্ন। তাঁর লেখা একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। এটা একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত ব্যাকরণ... আমি বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, এই সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট হতে এটা উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য।) (গাঙ্গুলী, ২০২১: ১৪৫)

সংস্কৃত কলেজের সে-সময়ের অধ্যাপক দার্শনিকপ্রবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেছেন–

> শ্রীতারা শরণম্, আপনার 'সুখবোধং' ব্যাকরণ স্থানে স্থানে দর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। সংস্কৃত সূত্রগুলি সন্নিবেশিত থাকায়, ইহা ছাত্রদিগের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে কয়েকখানি ব্যাকরণ নির্ব্বাচিত আছে আপনার 'সুখবোধং' তাহাদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব ইত্যলম্ (গাঙ্গুলী, ২০২১: ১৪৬)।

সূচিপত্রটিকে লেখক দুইভাগে ভাগ করেছেন– পূর্ব্বার্দ্ধম্ ও উত্তরার্দ্ধম। পূর্ব্বার্দ্ধম সংজ্ঞা প্রকরণম, স্বর-সন্ধি, ব্যঞ্জন-সন্ধিঃ, বিসর্জ্জনীয় সন্ধি, বক্তব্যানি, স্বরান্ত পুংলিঙ্গ প্রকরণম্, স্বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দঃ, স্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দঃ, বিশেষ বিধয়ঃ, ব্যাঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ, ব্যাঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দঃ, ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দঃ, সর্ব্বনাম, অথ সংখ্যাবাচকাঃ শব্দাঃ, শব্দ রূপাদর্শ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, পদ-ভেদ প্রকরণম্, স্ত্রীপ্রত্যয়াঃ, বিভক্তি প্রকরণম্, কারক প্রকরণম্, ধাত্বর্থ বোধঃ, কারিকা, সমাস প্রকরণম্, অব্যয়ীভাব সমাসঃ, অলুক সমাসঃ, নিত্য সমাসঃ, সমাস ভেদঃ, তদ্ধিতঃ, ধাতু প্রকরণম্, লড়াদি চতুষ্টয় প্রকরণম। ভ্বাদিঃ, ধাতুরূপাদর্শ, অভ্যস লিড়াদি পঞ্চকম্, আকারা দেশাদি প্রকরণম্, সম্প্রসারণম্, লিড়াদি-পঞ্চকম্, তুদাদি, (ঞিং) চুর ধাতু, অদাদিঃ, ধাণার্থক ধা– উভয়প্দী, অথ প্রত্যয় মালা, সনন্ত, যঙ্ লুগন্ত, নাম ধাতুঃ, কণ্ড্বাদিঃ, পরস্মৈপদ প্রক্রিয়া, আত্মনেপদ প্রক্রিয়া, ভাব-কর্ম প্রক্রিয়া, ধাতুবিভক্তি নির্ণয় প্রকরণ্, কারিকা, কৃৎ-প্রকরণম্, কৃত্য প্রকরণম্, তৃণাদিঃ, ক্তাদিঃ, অন্যানি জ্ঞাতব্যানি, ইষ্ণবাদিঃ, হুষ্ণবাদিঃ, অথ নত্ব-প্রকরণম্, ণত্ব প্রকরণম্, লত্বম্। অথ লত্বম্, অথ ব-ত্বম, অথ ষত্বপ্রকরণম্, পরিশিষ্ট।

সূচিপত্র এবং বিজ্ঞজনের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় 'সুখবোধং ব্যাকরণম্' গ্রন্থখানি রচনার ক্ষেত্রে গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কতটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা আর যত্নশীলতা সেসময়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত সুফল বয়ে এনেছিল।

'সংস্কৃত ভাষার ব্যকরণের ইতিহাস' গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন লিখিত একটি অতি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। তথ্যবহুল এই প্রবন্ধ-পাঠে জানা যায় যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন ইন্দ্র। কেউ কেউ মাহেশ ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ মনে করলেও পাণিনি'র ব্যাকরণ বা তার পূর্ববর্তী ব্যাকরণসমূহে মাহেশ ব্যাকরণের উল্লেখ নেই। মাহেশ নামে স্বতন্ত্র কোনো ব্যাকরণ নেই।

শিক্ষাগ্রন্থে উল্লেখ আছে মাহেশ্বর সূত্র বা শিবসূত্র নামে খ্যাত চৌদ্দটি শিব-প্রণীত সূত্র আছে যা পাণিণি মহেশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। যা 'ত্রিমুণি ব্যাকরণম্' নামে পরিচিত হয় অথবা কৌমার ব্যাকরণই মহেশ নামে খ্যাত ছিল যা 'কাতন্ত্র' নামধারণ করে।

এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন মিৎ সাহেব যা খুব ছোটো আকৃতির ছিল। ইন্দ্র প্রণীত ব্যাকরণ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রমশ

উন্নতি হচ্ছিল এবং পাণিণির সময়ে তার চরম উন্নতি হয়। পাণিণির ব্যাকরণে যাকিছু ঘাটতি ছিল কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সেটুকু পূরণ করে দেন। এভাবে ত্রিমুণি ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ব্যাকরণ। এর পরের ব্যাকরণগুলি ক্রমশ ছোটো হতে থাকে এবং বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা' অনেক ছোটো একটি ব্যাকরণ ছিল। কিন্তু এর পর থেকে পাণিণির পরবর্তী ক্রমোদীশ্বর (*সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণের* রচয়িতা), পদ্মনাভ (*সুপদ্ম ব্যাকরণের* রচয়িতা), বোপদেব ( *মুগ্ধবোধ*-প্রণেতা) প্রভৃতির ব্যাকরণ সংক্ষিপ্ততা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আবার ঐন্দ্র ব্যাকরণ এত ছোটো ও অসম্পূর্ণ ছিল যে পাণিণি-কাত্যায়ণ-পতঞ্জলি ও তার পরবর্তী ভট্টোজি দীক্ষিত (*সিদ্ধান্ত কৌমুদি*, *বাল মনোরমা*, *পৌঢ় মনোরমা* প্রভৃতি প্রণেতা), শ্রীপতি দত্ত (পরিশিষ্টঃ– প্রণেতা) প্রভৃতি কেউই ঐন্দ্র ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করেননি। সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ব্যাকরণ চান্দ্র, এই ব্যাকরণের প্রণেতা মহর্ষি চন্দ্রের নামানুসারে উক্ত ব্যাকরণের নামকরণ করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় তৃতীয় ব্যাকরণ হল কাশকৃস্ন ব্যাকরণ। তবে এর পাণ্ডুলিপি কোথাও পাওয়া যায়নি। তৃতীয় ব্যাকরণ হলো কৌমার বা কাতন্ত্র ব্যাকরণ। লেখকের মতানুসারে কৌমার, কাতন্ত্র ও কলাপ এই তিনটি এবই ব্যাকরণের নাম। এর ব্যখ্যাও তিনি বিশদভাবে এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার পঞ্চম ব্যাকরণ হচ্ছে শাকটায়ন ব্যাকরণ। শাকটায়ন বৌদ্ধ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার ষষ্ঠ ব্যাকরণ হল সারস্বত। তবে প্রণেতার নাম গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই। সম্ভবত সরস্বতী উপাধি বিশিষ্ট কেউ এর রচয়িতা হবেন।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত মূলত উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষাশিক্ষাকে সহজ, ব্যাবহারিক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়াসে ব্যাকরণ চর্চা করেছেন। তাঁর ব্যাকরণভাবনা ছিল কেবল নিয়মনির্ভর নয়, বরং ভাষা-ব্যবহারনির্ভর (usage-based)। তাঁর ভাবনায় ছির প্রাথমিক শিক্ষা। তাঁর ব্যাকরণচর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী। তাই তিনি জটিল সংজ্ঞা ও সংস্কৃতঘেঁষা পরিভাষা পরিহার করেছেন। শিশুর দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারকে ব্যাকরণের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মুখস্থ নয়, বোঝার মাধ্যমে শেখানো শিক্ষাদর্শে তাঁর আস্থা ছিল। এ দিক থেকে তাঁকে আধুনিক ভাষা-শিক্ষাবিদদের পূর্বসূরি বলা যায়। গুরুনাথ সেনগুপ্ত ব্যাকরণকে দেখেছেন ভাষার কার্যকর ব্যবহারের সহায়ক হিসেবে। পদ, বাক্য, ক্রিয়া ইত্যাদির আলোচনা এসেছে ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে। বাক্য গঠনের স্বাভাবিক প্রবাহকে গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বত্র। শুদ্ধতার পাশাপাশি প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কাছে। গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচর্চা বিচ্ছিন্ন কোনো তাত্ত্বিক অনুশীলন নয়; তা তাঁর পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ব্যাকরণ কোনো কঠিন বা ভয়ের বিষয় নয়, বরং পাঠ, গান ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেখানো যায় তাকে। এতে শিশুদের ভাষাশিক্ষা হয় আনন্দময় ও স্বতঃস্ফূর্ত

হয়ে ওঠে। তৎকালীন বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব ছিল প্রবল। তিনি তা থেকে সরে আসার চেষ্টা করেছেন। বাংলা বাক্যরীতিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলার বিরোধী ছিলেন তিনি। কথ্য ও চলিত রীতিকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট।

## উপসংহার

গুরুনাথ সেনগুপ্ত বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পর্কে অসধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। উনিশ শতকে ব্যাকরণচর্চায় গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবদান অনস্বীকার্য। সে-সময়ের পাঠ্যপুস্তকের লেখক হিসেবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। খ্যাতিবিমুখ এই লেখক সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে গিয়েছেন। ব্যাকরণচর্চার বাইরেও তাঁর অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বৈয়াকরণ হিসেবে অনেকটা উপেক্ষিত গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণ-গ্রন্থ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানি পর্যায়ে আরো আলোচনা-বিশ্লেষণ করা হলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে।

গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচর্চা বাংলা ভাষাশিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র অধ্যায়। তিনি ব্যাকরণকে কেবল ভাষার নিয়মাবলির সমষ্টি হিসেবে না দেখে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভাষাবোধ ও মানসগঠনের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে ব্যাকরণ ছিল ভাষা শেখার সহায়ক কাঠামো শিশুর স্বাভাবিক ভাষা-প্রবণতাকে দমন না করে বরং সুশৃঙ্খলভাবে বিকশিত হতে সহায়তা করে।

গুরুনাথ সেনগুপ্তের অবদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাকরণচর্চাকে পাঠ্যপুস্তক, ছড়া, গান ও অনুশীলনের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এর ফলে ব্যাকরণ শিক্ষার্থীর কাছে বিচ্ছিন্ন ও ভয়ংকর কোনো বিষয় হয়ে ওঠেনি; বরং তা ভাষার স্বাভাবিক ব্যবহার থেকে উদ্ভূত একটি বোধ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিক শিক্ষায় মুখস্থনির্ভর ব্যাকরণ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে।

আরও লক্ষণীয় যে, তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের অতিরিক্ত প্রভাব থেকে বাংলা ব্যাকরণকে মুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার নিজস্ব বাক্যরীতি ও চলিত ব্যবহারের প্রতি তাঁর সচেতন দৃষ্টি ব্যাকরণচর্চাকে বাস্তব ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসে। ফলে তাঁর ব্যাকরণভাবনা ভাষাকে কৃত্রিম শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবন্ত ও ব্যবহারোপযোগী করে তোলে।

গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচিন্তায় শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক স্তর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য জটিল সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিহার করে তিনি সহজ, পর্যায়ক্রমিক ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শেখার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক

শিশুশিক্ষা ও ভাষা-অধিগম তত্ত্বের সঙ্গে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে, যা তাঁর চিন্তার প্রগতিশীলতা নির্দেশ করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, গুরুনাথ সেনগুপ্তের ব্যাকরণচর্চা বাংলা প্রাথমিক ভাষাশিক্ষায় একটি ব্যাবহারিক, মানবিক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ধারার সূচনা করেছে। তাঁর অবদান কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না; বরং সমকালীন প্রাথমিক পাঠ্যক্রম, ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যাকরণ শিক্ষার পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রেও তা মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বাংলা ব্যাকরণচর্চার ধারাবাহিক বিকাশে গুরুনাথ সেনগুপ্ত তাই এক অনিবার্য ও পুনর্মূল্যায়নযোগ্য নাম।

## তথ্য-নির্দেশ


ইসলাম, সিরাজুল। (২০০৩, অনলাইন ভার্সন)। (সম্পা.) *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি: ঢাকা।

গাঙ্গুলী, ভুবনমোহন। (২০২১)। *দেবমানব মহাত্মা গুরুনাথ* (পুনর্মুদ্রণ)। সত্য ও শান্তিকেন্দ্র: গোপালগঞ্জ।

বালা, তিথি। (২০২৪)। *গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন* (জীবনী)। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রলাল। (২০০১)। *মহাত্মা গুরুনাথ*। আদরমণি সমিতি: কলকাতা।

বিশ্বাস, জুয়েলী। (২০১২)। *গুরুনাথ সেনগুপ্ত: জীবন ও ধর্মদর্শন* (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

সরকার, তন্ময়। (২০২০)। *আচার্য গুরুনাথ সেনগুপ্তের ধর্মচিন্তার দার্শনিক বিশ্লেষণ'* (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা,

সেনগুপ্ত, গুরুনাথ। (২০২২ক)। *সুখবোধং ব্যাকরণম* (তৃতীয় মুদ্রণ), সত্য ও শান্তিকেন্দ্র: গোপালগঞ্জ।

সেনগুপ্ত, গুরুনাথ। (২০২২খ)। *ব্যাকরণ সোপান* (চতুর্থ মুদ্রণ), সত্য ও শান্তিকেন্দ্র: গোপালগঞ্জ।

সেনগুপ্ত, গুরুনাথ। (২০২২গ)। *লঘু সুখবোধ ব্যাকরণ* (পঞ্চম মুদ্রণ), সত্য ও শান্তিকেন্দ্র: গোপালগঞ্জ।

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা পত্রিকায় (বাংলা) প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়ম

**প্রেরিতব্য প্রবন্ধের বিষয়**

- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের মাতৃভাষা পরিস্থিতি;
- টেকসই উন্নয়ন ও মাতৃভাষা;
- ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার;
- মাতৃভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান;
- মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান;
- সমাজ ভাষাবিজ্ঞান;
- বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষাব্যবস্থাপনা;
- সাহিত্য ও ভাষা;
- গণমাধ্যম ও মাতৃভাষার ব্যবহার;
- শিক্ষা-পরিকল্পনায় মাতৃভাষার গুরুত্ব;
- ভাষা ও সংস্কৃতি;
- বহুভাষিক রাষ্ট্রে ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রমে ভাষাপরিকল্পনা;
- ভাষার নথিবদ্ধকরণ (Documentation), ভাষা-সংরক্ষণ (Preservation) ও প্রমিতায়ন (Standardization), মাতৃভাষায় অভিধান প্রণয়ন, শিশুপাঠ্য বই (Primer) রচনা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে মাতৃভাষার ব্যবহার;
- লিখনব্যবস্থা নেই এমন মাতৃভাষার লিখনব্যবস্থা প্রবর্তন, মাতৃভাষার ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (Morphology), বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ও বাগর্থতত্ত্ব (Semantics)।

**প্রবন্ধ কাঠামো**

শিরোনাম (Title)

সারসংক্ষেপ (Abstract)

মূলশব্দ (Keywords)

ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা সমস্যার সনাক্তকরণ/সমস্যার বিবৃতি (Identification of Research Problem/Statement of the problem/Statement of the Topic)

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the research)

পূর্বগবেষণা সমীক্ষণ (Literature review)

গবেষণার যৌক্তিকতা (Research Rational)
গবেষণা-প্রশ্ন (Research Questions)
গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো (Research theoretical framework)
গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology)
গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা (Discussion)
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (Results and Findings of the research)
সুপারিশমালা (Recommendation)
উপসংহার (Conclusion)
তথ্য-নির্দেশ (References)

বি. দ্র. Reference System APA 7th edition অনুসরণ করুন।
রেফারেন্স সিস্টেমের লিংক: https://imli.portal.gov.bd/site/page/94efd24a-fa62-44c2-a16e-4a972b57c4b6/-

**লেখার নিয়ম**

১ প্রবন্ধ অবশ্যই বাংলা ভাষায় লিখিত, অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

২ প্রবন্ধের সঙ্গে ইংরেজিতে Abstract বা সারসংক্ষেপ (ন্যূনাধিক ১৫০-২০০ শব্দে) বাম ও ডান দিকে ১/২ (.৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে ও মূলশব্দ (Key words) বাংলায় ১৪ পয়েন্টে থাকতে হবে।

৩ প্রবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'ইউনিকোড' (যে কোনো ফন্ট) ফন্টে ১.৫ লাইন-ব্যবধান অনুসরণ করে কম্পোজ করতে হবে। হার্ডকপি জমা দেওয়ার সময় একপাশে প্রিন্ট করে দুই(২) সেট জমা দিতে হবে।

৪ মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্র থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন: ১,২,৩...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) জরুরি।

৫ প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাম ও ডান দিকে ১/৪ (.২৫) ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুন্ন থাকবে।

৬ বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত আধুনিক বাংলা অভিধান-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮ মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল

পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ১, ২, ৩ ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

৯ অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম:

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদ-এর বাক্যতত্ত্ব বইয়ের ২০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে:

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন (আজাদ, ১৯৮৪: ৮)।

১০ গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্য-নির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১১ প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১২ প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি এবং তাঁর লেখার ৫ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।

১৩ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর থাকতে হবে।

১৪ নির্বাচিত কোনো প্রবন্ধ স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলে তা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

১৫ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আমাই কর্তৃক নির্ধারিত রেফারেন্স অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় লেখা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না। আমাইয়ের রেফারেন্স পদ্ধতি www.imli.gov.bd ঠিকানায় প্রকাশনা অংশে দেওয়া আছে।

১৬ প্রবন্ধে মূল পাঠের শেষে একটি তথ্য-নির্দেশ (reference) থাকবে। এই তথ্য-নির্দেশে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তথ্য-নির্দেশ রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। এছাড়া পত্রিকার উল্লেখ থাকলে তা বইয়ের নামের পরে যাবে। তথ্য-নির্দেশের ক্ষেত্রে (hanging) ১/২ (.৫) ইঞ্চি হবে । রচনার নিয়ম নিম্নরূপ:

**গ্রন্থ**

রাজীব, হুমায়ুন। (২০০১)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

Hai, Muhammad Abdul. (1960). *A Phonetic and Phonological Studz of Nasals and Naslization in Bengali.* The University of Dhaka.

**১. একক লেখকের ক্ষেত্রে**

সরকার, পবিত্র। (১৪০৫)। *ভাষা, দেশ, কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা।

**২. দুইজন লেখকের ক্ষেত্রে**

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব। (২০০৪)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। পুস্তক বিপণিঃ কলকাতা।

**৩. দুইয়ের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে**

খান, শামসুজ্জামান, ইসলাম, আজহার ও হোসেন, সেলিনা (সম্পা.)। (১৯৮৫)। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

**৪. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ**

রফিক, আহমদ। (২০২১)। ভাষা ও শব্দের ইতিহাস-প্রতিমা। সাজ্জাদ আরেফিন (সম্পা.), *একুশের কবিতা পরিচয়*। প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

**৫. গবেষণা জার্নাল থেকে প্রবন্ধ**

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৩২৪)। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর। *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ২৪শ ভাগ (১৩২৪), ২১৩-২৫২। [১৯১৭]

**৬. লেখকহীন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান**

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেন [কারাস]। (২০২১)। *জীবনযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**৭. একই বছরে একই লেখকের প্রকাশিত একাধিক প্রকাশনা**

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১ক)। *খেলারাম খেলে যা*। মাওলা ব্রাদার্সঃ ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১খ)। *মেঘ ও মেশিন*। মাওলা ব্রাদার্সঃ ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (১৯৯১গ)। *ইহা মানুষ*। শিখা প্রকাশনীঃ ঢাকা।

**৮. অনলাইন/ইন্টারনেট উৎস থেকে**

রায়, কৃষ্ণা। (জানুয়ারি ৯, ২০২২)। সৃজনশিল্পীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং ওকাকুরা কাকুজো। *দৈনিক আনন্দবাজার*। প্রবেশ ৭ই জুলাই ২০২৪,

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/special-write-up-about-priyam vada-devi-and-his-love-towards-rabindranath-tagores-poem/cid/1322644

**৯. লেখকহীন এবং তারিখহীন উল্লেখ**

Pet therapy. (n.d.). Retrieved from http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.html

**১০. গবেষণা পত্রিকা**

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০৮)। "বাংলা কর্মবাচ্যঃ গঠন বিশ্লেষণ"। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*, প্রথম বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**১১. ব্লগ পোস্ট থেকে**

আহমেদ, বখতিয়ার। (২০১৩)। ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রশ্নে আমাদের জাতিরাষ্ট্র। [ব্লগ পোস্ট]। নেয়া হয়েছে ৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, https://rashtrochinta.org/blog-post/**ভাষা-সংস্কৃতি-ও-জাতিসত্ত/**

**১২. অভিধান থেকে**

**ক. সরাসরি অভিধান**

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সঙ্ক.)। (১৯৯৮)। *সংসদ বাংলা অভিধান* (দ্বাবিংশতিতম মুদ্র.)। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

**খ. অনলাইন**

Cambridge dictionaries online. (2011). Retrieved from http://dictionary.cambridge.org/

**১৩. ভিডিও/ডিভিডি/ইউ টিউব থেকে**

Gardiner, A., Curtis, C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission.

**১৪. ম্যাগাজিন/সাময়িকী থেকে**

করিম, মীর রেজাউল। (২০২৪)। এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী হবে? পড়েই বা কী লাভ হচ্ছে? *দৃষ্টি*, ১।

**১৫. দৈনিক পত্রিকা থেকে**

রহমান, মিজানুর। (মার্চ, ২০২২)। ১৩৫ মনের মুক্তিযোদ্ধা সনদের তথ্যে গরমিল। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৩।

ইউক্রেন যুদ্ধে বিদেশি যোদ্ধা পাঠাচ্ছে পুতিন। (২০২২, মার্চ ১৩)। *দৈনিক প্রথম আলো*, পৃ. ৭।

**১৬. অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ**

নেছা, করিমন। (২০১৪)। বাংলা কোড সংহিতাঃ একটি সমাজভাষাজ্ঞোনিক গবেষণা (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**১৭. পুস্তিকা/ব্রোশিউর/বুকলেট**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (২০১০)। International Mother Language Institute (IMLI) [ব্রোশিউর]। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটঃ ঢাকা।